সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী

শহীদে মেহরাব

হযরত

ওমর ইবনুল খাত্তাব

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

অনুবাদ

মওলানা কামাল উদ্দীন শামীম

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব

সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশনা

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার

১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেল গেইট (চাঁন জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ : ২০০২

পঞ্চম সংস্করণ

রজব ১৪৩০, জুলাই ২০০৯, আষাঢ় ১৪১৬

কম্পোজ

আল কোরআন কম্পিউটার

অনুবাদ স্বত্বঃ প্রকাশক

বিনিময় ঃ দুইশত টাকা মাত্র

SHAHEED-E-MEHRAB OMAR IBNUL KHATTAB

Author

Sayed Omar Telmesani

Editor for Bengali Translation

Hafiz Munir Uddin Ahmed

Published by

Khadija Akhter Rezayee

Director, Al Quran Academy London

Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507/1 Wireless Railgate, (Chan Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Ground Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1ST PUBLISHED

2002

5th EDITION

Rajab 1430, July 2009

PRICE : Tk. 200.00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk www.alquranacademylondon.co.uk

ISBN-984-8490-014-0

হে ওমর! আমীরুল মোমেনীন!!

রুক্ষ মরুর রুক্ষ মানুষ
সূক্ষ্ম চিন্তা উঠে জেগে!
সোনার পরশ পেয়ে সোনা হয়ে যায়
বিশ্বের বিস্ময়, অমরত্ব পায় সীমাহীন ত্যাগে!!
কে সেই মানুষ,
রাতের অতন্দ্র প্রহরী!
নগরীর সকল প্রাণী নিবিড়ে ঘুমায়।
কার সে বিনিদ্র আঁখি
মদীনার অলি গলি ঘুরে
বৃদ্ধার জীর্ণ কুটিরে
খাদ্যের বোঝা নিজ কাঁধে নিয়ে
অভাবীর সম্মুখে নামায়!!
কোন্ সে হৃদয়!
যে উদার হৃদয়ে ছিলো
সীমাহীন ভয়, ছিলো একরাশ আশা।
আল্লাহর ভয়ে ভীত সে হৃদয়
তাঁরই সন্তুষ্টির আশায় ছিলো উম্মুখ
কলজের টুকরো হয়ে কলজেয় ছিলো
নবীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা॥
ছিলো না হিংসা, দ্বেষ, ছিলো না অহংকার
লোভ লালসা, স্বজনপ্রীতির দুর্বলতা,
ছিলো না আরাম আয়েশ,
মোজাহেদ তিনি নির্ভীক, দ্বীনের সাধনায় পূর্ণ হৃদয় ও
এ কোন্ বাদশাহ ঘুমায়!
সেখানে বৃক্ষতলে ছিলো না বিছানা
শিয়রে শক্ত শেকড়, এ বুঝি বালিস তার?
জোড়া তালি দেয়া পিরহানে ঢাকা,
ঘর্মাক্ত অবয়ব!
এই কি তিনি- আধেক পৃথিবীর রাজত্ব যার!!
ওরা হতবাক, চোখে বিস্ময়, জিজ্ঞাসা!
কোন্ সে সোনার পরশে, তৈরী হয়েছে
এই খাদহীন সোনা!
যার হৃদয় জুড়ে রয়েছে শুধুই
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা॥
নিরলস জীবন তার, ছিলো না বিশ্রাম!
নির্বিলাস, সংযমী, স্বল্পাহারী
কখনো করেনি পূর্ণ ক্ষুধা নিবারণ
তাকে তো সবাই জানি- জানি তার নাম॥
আমার নবীর হাতে যিনি রেখেছেন হাত-
সুখে দুঃখে ছিলেন আমার নবীর সাথী
দ্বীনের সেবায় নিরলস কাজ করেছেন দিন রাত॥
দ্বিতীয় খলিফা তুমি,
হে ওমর! আমীরুল মোমেনীন!!
নবীর সীরাত তোমায় করেছে ধন্য
মালিকের মেহমান তুমি,
এখানে তোমার নাম অম্লান, অমলিন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী
লন্ডন
রমযানুল মোবারক ১৪২৩

এই বইতে অধ্যায় রয়েছে সর্বমোট ৮টি, প্রতিটি অধ্যায়ে আবার রয়েছে ছোট বড়ো অনেক গুলো বিষয়। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিরোনামে তার সূচীপত্র আমরা আলাদা করে পেশ করেছি। অধ্যায়গুলো যেভাবে শুরু হয়েছে—

শহীদে মেহরাব

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব

☐ 'প্লামস্টেড মাসজিদ ও উলউইচ ইসলামিক সেন্টার' লন্ডন শহরের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় অবস্থিত একটি প্রাণবন্ত মুসলিম কমিউনিটি এরিয়া। লন্ডনে আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনের এক পর্যায়ে কিছুদিন আমি এই এলাকার 'প্লামস্টেড হাই স্কুলে' একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কিছু ক্লাস নিয়েছিলাম। এ কাজটা ছিলো আমার হোম অফিসের মূল চাকুরীর বাইরে শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব। আমার সে বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচীরই এক সাথী ছিলেন মোহাম্মদ আইয়ূব। মোহাম্মদ আইয়ূব উলউইচ মাসজিদের নানা কর্মকান্ডের সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

☐ বছর দু'য়েক আগের কথা, রমযানের 'লাইলাতুল কদরে' কোরআনের ওপর একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমান হয়ে আমি তাদের মাসজিদে গিয়েছিলাম। আলোচনার শেষে জনাব আইয়ুব চায়ের আসরে আমাকে বার বার একটি বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, জানতে চাইলেন বইটি আমি কখনো দেখেছি কিনা, কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও আমি এমন কোনো নাম মনে করতে পারছিলাম না। তিনি এমনভাবে বইটির প্রশংসা করলেন যে, আমি বইটি পড়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কিন্তু সে সময় আমার বাংলাদেশে আসার কারণে বইটি হাতে পেতে বেশ কিছু দিন এমনিই দেরী হয়ে গেলো। তিন মাস পর বইটি আমি হাতে পেলাম। এর নামটিই আমাকে প্রথমে এর প্রতি আকৃষ্ট করে ফেললো। কি চমৎকার নাম! 'শহীদুল মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব'। অবশ্য নামের কথা বাদ দিলেও এর প্রতি আকৃষ্ট হবার আরেকটি কারণ ছিলো, আর তা হচ্ছে এই গ্রন্থের মহান রচয়িতা 'আল ইখওয়ানুল মোসলেমুন'-এর এক সময়ের 'মোর্শেদে আম' সাইয়েদ ওমর তেলমেসানীর প্রতি আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

☐ বিগত শতাব্দীর মাঝপথে এসে আফ্রিকান আরবরা যখন নবী মুসা (আ.)-এর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফেরাউন ও সামেরীদের কুফুরী ও পৌত্তলিক জীবনধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো তখন তাদের সে ভ্রান্ত গতিপথকে আবার সঠিক ধারায় নিয়ে আসার জন্যে অমর শহীদ হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল ইখওয়ানুল মোসলেমুন'। ইখওয়ান ছিলো মিথ্যার সয়লাবের সামনে সত্যের একটি বলিষ্ঠ বাঁধ। এই বাঁধ নির্মাতাদের দলে শহীদ হাসানুল বান্নার সাথে তখন আরো যারা শামিল ছিলেন তারা হলেন হাসানুল হোদায়বী, ওমর তেলমেসানী ও শহীদ সাইয়েদ কুতুব প্রমুখ চিন্তানায়করা। হাসানুল বান্নার নির্মম শাহাদাতের পর হাসানুল হোদায়বী দলের 'মোর্শেদে আম' নির্বাচিত হলেন, তারপর মোর্শেদে আম নির্বাচিত হলেন সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী।

☐ সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী ছিলেন আরব আজমে পরিচিত কোরআন হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের একজন শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত ব্যক্তি। তার মতো একজন যুগ শ্রেষ্ঠ মোজাহেদের কলম নিঃসৃত পুস্তকের প্রতি আমার আগ্রহ ও ভালোবাসা থাকবে এটাই

স্বাভাবিক। 'শহীদুল মেহবার ওমর ইবনুল খাত্তাব' এই মূল বইটি আরবী ভাষায় লেখা, তাও আবার লেখা পান্ডিত্যপূর্ণ আরবী ভাষায়। আমাদের দেশের অনুবাদ সাহিত্যে উন্নত মানের আরবী থেকে বাংলায় রূপান্তরের বিষয়টি এখনো তেমন সহজবোধ্য হয়ে উঠেনি। অপর দিকে ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলো রয়েছে বলতে গেলে প্রায় সবই আরবী ভাষায়, তাই আরবী ভাষায় প্রচুর ব্যুৎপত্তি না থাকলে অনুবাদ শিল্পের কার্যকারিতা তাতে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' বাংলাদেশ সেন্টার তার যাবতীয় অনুবাদকর্মে অনুবাদের এই বিশেষ দিকটির প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়েছে। বিভিন্ন অনুদিত অংশের সম্পাদনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে আমার এতো বেশী সময় ব্যয় হয়েছে যে, একেক বার মনে হয়েছে এর চাইতে কম সময় ব্যয় করে সম্ভবত আমি নিজেই তার অনুবাদ করে ফেলতে পারতাম। এক্ষেত্রে অনেকেই আবার মনে করেন যে, উর্দুভাষী ভাইয়েরা আমাদের কাজকে কিছুটা সহজ করে দিয়েছেন। জটিল আরবী গ্রন্থের অনুবাদের সময় তারা কখনো কখনো একই গ্রন্থের উর্দু অনুবাদের সাহায্য নেন। কিন্তু তাও যে আবার সবসময় সমস্যামুক্ত হয় এমন নয়। উর্দু বইর সাহায্য নিয়ে যে সব অনুবাদ করা হয় তাকে যখন মূল আরবীর সাথে মিলিয়ে সম্পাদনা করতে হয় তখন প্রায়ই দেখা যায় গ্রন্থটির সরাসরি অনুবাদ না হওয়ার কারণে মূল রচনার সাথে যথাযথ ইনসাফ করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে আরবী গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে সম্পাদনা করা আসলেই একটা দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে, এটা যেমনি কষ্টসাধ্য, তেমনি সময় সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে। এতে পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট ছকের ভেতর বই প্রকাশনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। 'শহীদে মেহবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব'-এর প্রকাশনা অহেতুক বিলম্বের এটা প্রধান কারণ না হলেও অন্যতম একটা কারণ যে ছিলো– তাতে সন্দেহ নাই।

□ হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন আল্লাহর রসূলের সুযোগ্য উত্তরসূরী ও মুসলিম জাতির প্রথম খলিফা। মুসলিম জাতির সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার পেছনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং আল্লাহর নবী নিজে নামায আদায় করেছিলেন। আবু বকর (রা.)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহর নামায আদায় যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না এটা রসূল (স.)-এর জাঁ-নেসার সাহাবীরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। এ কারণেই রসূলুল্লাহর তিরোধানের পর শোকাহত জনসাধারণ ঐকমত্যের ভিত্তিতেই হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করে নেন।

□ আল্লাহর নবীর পর এই ভূমন্ডলের সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে খেলাফতের জন্যে হযরত ওমর (রা.)-এর মনোনয়ন প্রসংগে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা! তুমি সাক্ষী থেকো, আমি তোমার সৃষ্টিকুলের সব চাইতে ভালো মানুষটিকে আমীরের জন্যে বাছাই করেছি'। হযরত ওমর (রা.) আসলেই ছিলেন সৃষ্টিকুলের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। আল্লাহর নবী স্বয়ং বলেছেন, 'নবীর পর উম্মতের সব চাইতে ভালো মানুষ আবু বকর, আর আবু বকরের পর ওমর।' রাইসুল মোফাসসেরীন হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রা.) বলেছেন, কেয়ামতে মহা বিচারের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রথম যে মানুষটির ডান হাতে তার আমলনামা দেবেন তিনি হচ্ছেন হযরত ওমর (রা.)। তার চেহারা তখন এমনি করে জ্বলতে থাকবে যে, দেখে মনে হবে তা সূর্যের কতিপয় আলোকচ্ছটা। এতোটুকু বলার পর আবদুল্লাহ বিন আববাসকে

জিজ্ঞেস করা হলো, যে সময় হযরত ওমরের হাতে এই আমলনামা দেয়া হবে, তখন রসূলের চাচাতো ভাই আবু বকর কোথায় থাকবেন? আবদুল্লাহ বিন আববাস (রা.) জবাব দিলেন, তার ব্যাপারে আর কি জিজ্ঞেস করবে? তিনি তো হচ্ছেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাকে ততোক্ষণে ফেরেশতারা বিনা হিসেবেই বেহেশতে পৌঁছে দেবেন।

☐ এমনি বিরল সম্মানের অধিকারী হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যাপারে জানার আগ্রহ আমাদের ইতিহাসের কোনো কালেই কম ছিলো না। সম্ভবত তার মতো অন্য কোনো মানুষের এতো জীবনী গ্রন্থও তাই প্রকাশ লাভ করেনি। প্রকাশিত গ্রন্থের সব কয়জন গ্রন্থকারেরই মত হচ্ছে যে, হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ইতিহাসের একজন সার্থক ও ব্যতিক্রমধর্মী নির্মাতা।

☐ দেশে বিদেশে রচিত এই শত শত জীবনী গ্রন্থের মতো সাইয়েদ ওমর তেলমেসানীর 'শহীদুল মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব' কোনো সাধারণ জীবনী গ্রন্থ নয়। এটি সত্যি সত্যিই একটি ভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি হযরত ওমর (রা.)-কে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে তাকে জীবন্ত ওমরের চরিত্র দান করেছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত জীবনী গ্রন্থগুলোর পাশে সাইয়েদ ওমর তেলমেসানীর এই বইটিকে নিঃসন্দেহে পাঠকদের কাছে ভিন্নধর্মী একটি উপস্থাপনা মনে হবে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব জীবনী গ্রন্থের সাথে পরিচিত, তাতে ব্যক্তির জীবনের চাইতে তার জীবনের ঘটনা ও তার দিন তারিখ ইত্যাদিই বেশী প্রাধান্য পায়। সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী কিন্তু এই পুস্তকে তা করেননি, ফারূকে আযমের জীবনের বিচিত্র ঘটনাকে অক্ষরের পোশাক পরাতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যে জিয়নকাঠির পরশে হযরত ওমর (রা.) অর্ধেক পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়ে এ যমীনের মানুষদের একটি নতুন শাসন ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়েছেন এতে তিনি তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পেশ করেছেন। কোন্ সে পরশমনি যা উদ্যত তলোয়ার হাতের এক খুন পিয়াসী সাহসী যুবককে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন খলিফায় পরিণত করলো তাও তিনি দেখিয়েছেন। কোন্ সে যাদু যা অর্ধ পৃথিবীর শাসককে বাধ্য করলো নিজের চাকরকে উটের ওপর বসিয়ে নিজে উটের রশি টেনে উত্তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দিতে। কিসের লোভে ভিনদেশী রাজার পাঠানো দূত তাকে রাজ তখতের বদলে খেজুর ছায়ায় শুয়ে থাকতে দেখতে পেলো। সর্বশেষে কোন্ সে বিষয়টি যা হযরত ওমরের মতো একজন সাধারণ আরব বেদুইনকে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই শীর্ষ আসনে বসিয়ে দিলো তাও তিনি এখানে নিখুঁত শিল্পীর তুলি দিয়ে অংকন করেছেন।

☐ নবী প্রদর্শিত জীবনধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হযরত ওমর রাষ্ট্রযন্ত্রের সামনে যে বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী উপস্থাপন করেছেন তাই পরবর্তীকালে রাষ্ট্র চালনার মূলনীতি হিসেবে পূর্ব পশ্চিমের সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দীপ্ত ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা ও তার আদলে প্রণীত পরবর্তীকালের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সহ যতোগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর এখানে সেখানে চালু করা হয়েছে তার সব কয়টির সাথেই কোনো না কোনো পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়ক ওমরের রাষ্ট্র চিন্তা ও অর্থনৈতিক দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে। এ কথাটি শুধু যে আমরাই বলি তাই নয় পশ্চিমী দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাদের লেখনীতে এ কথাটি অকপটে স্বীকার

করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে মনে হবে ইতিহাস বুঝি শুধু একজন ওমরই জন্ম দিয়েছে।

☐ সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী তার এ অনন্য সাধারণ পুস্তকটির মাধ্যমে আমাদের সামনে যে ওমরের চরিত্র অংকন করলেন তিনি শুধু একজন আত্মত্যাগী রাষ্ট্র নায়কই নন, তিনি হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ (স.) প্রদর্শিত ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা। একজন মুসলমান রাষ্ট্র নায়ক কোরআনের ঝান্ডা হাতে নিয়ে শুধু দেশের সীমানাই বিস্তার করেন না, তিনি সে বিস্তৃত ভূ-খন্ডের মানুষদের জীবনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্বও আঞ্জাম দেন। ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী ইসলামী আন্দোলনের এ মহান নেতাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীদের সামনে এমনি এক অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন।

বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ যারা এ যমীনটাকে কোরআনের ভূখন্ড বানানোর জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের হাতে এমনি একটি দুর্লভ সম্পদ তুলে দেয়ার প্রকল্পটি আমরা হাতে নিয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে, কিন্তু আমাদের তৎকালীন কম্পিউটার অপারেটরের গাফলতির কারণে এক পর্যায়ে আমরা পুরো অনুদিত অংশটিই হারিয়ে ফেলি, পরে এদিক সেদিক থেকে যা কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাতে আবার অনুবাদজনিত সমস্যার সমাধান করতে অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, অবশেষে সব বাধা বিপত্তি ডিংগিয়ে 'শহীদুল মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব' বইটি প্রকাশিত হলো। অনুবাদ কর্মে সহযোগিতা দিয়েছেন মাওলানা এ বি এম কামাল উদ্দীন শামীম। শেষের দিকে কিছু সহযোগিতা দিয়েছেন মাওলানা লুৎফুর রহমান, আরো যারা নানাভাবে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

যার অভিপ্রায়ে সাড়া দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা একাধিকবার ওহী নাযিল করেছেন, ফেরেশতাদের আসরে আল্লাহ তায়ালা যে মানুষটির বার বার প্রশংসা করেছেন সেই অকুতোভয় সৈনিক হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি আমার সবটুকু ভালোবাসা নিবেদন করি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যিনি ন্যায়দন্ডের মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে মাসজিদের মেহরাবে শাহাদাত বরণ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতের সব কয়টি দরজা খুলে দিন।

'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' বাংলাদেশ সেন্টারের কোরআনের ভুবনে আমি আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই!

বিনীত
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
ডাইরেকটর জেনারেল
রমযানুল মোবারক ১৪২৩

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে লিখবো, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁর ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তিনি হবেন হযরত ওমর (রা.)। তার চেহারা সূর্যালোকের মতো চমকাতে থাকবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, হে রসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই। এই সময়ে আবু বকর (রা.) কোথায় থাকবেন? ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আবু বকরকে তার আগেই ফেরেশতারা বিনা হিসেবে বেহেশতে নিয়ে যাবেন।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

১

প্রথম অধ্যায়

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। অন্তরের মন্দভাব এবং মন্দ কাজ থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যাকে বিভ্রান্ত করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন রসূল (স.) বলেছেন, প্রতিটি কাজের পরিণাম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ সে রকমই পরিণাম পাবে যে রকম সে নিয়ত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করেছে তার হিজরত আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের পথে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো কিছু অর্জনের জন্যে অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্যে হিজরত করেছে তার এ সফর সেই কাজের জন্যেই বিবেচিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই হাদীস হচ্ছে ইসলামের এক তৃতীয়াংশ। অন্যরা বলেছেন, এই হাদীস হচ্ছে ইসলামের এক চতুর্থাংশ। হে আল্লাহ তায়ালা! তুমি সবকিছু জানো। আসমান যমীনের কোনো কিছুই তোমার কাছে গোপন নেই। আমাদের যাহের বাতেন সবকিছুই তোমার কাছে স্পষ্ট। হে পরম করুণাময়! তুমি পছন্দ করো এ রকম গুণাবলী দিয়ে আমাদের চরিত্রকে সাজিয়ে দাও। তুমি যেসব কাজ পছন্দ করো না সেসব কাজের চিন্তা থেকেও আমাদের অন্তরকে দূরে রাখো। আমাদের জিহ্বা তোমার যেকেরে সব সময় সিক্ত রাখার তওফীক দাও। তোমার প্রশংসা এবং তোমার রসূল (স.)-এর প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করার শক্তি সামর্থ তুমি আমাদের দাও।

তোমার নেয়ামত অবিরাম অবতীর্ণ হচ্ছে। তোমার কুদরতের নিদর্শন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বত্রই রয়েছে। তুমিই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। তুমিই এবাদাত বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য। তোমার যেকের সর্বত্র নিনাদিত হচ্ছে. তুমি এরই যোগ্য। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তুমি মুক্ত। তুমি ন্যায়বিচারক বাদশাহ

হে আল্লাহ তায়ালা! আমি যে কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এই কাজ তুমি নিজের পবিত্র সত্তার জন্যে কবুল করো। তোমার সন্তুষ্টি বাদে অন্য কোনো চিন্তা আমার মনে আগেও ছিলো না, এখনো নেই। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তুমিই প্রকাশ্য, আর তুমিই গোপনীয়। তোমার আগে কিছু ছিলো না, তোমার পরেও কিছু নেই। তুমি সব কাজ করতে পারো। তুমি সব জানো সব কিছুর জ্ঞান তোমার রয়েছে, তুমি সব কিছু দেখো, সব কিছু শোনো।

ইসলাম সম্পর্কে কিছু লেখার জন্যে কয়েকবারই আমি উদ্যোগী হয়েছিলাম। উদ্যোগী হবো না কেন। ইসলাম কি আমার জীবন ব্যবস্থা নয়? ইসলাম আমার দ্বীন, এই দ্বীনের জন্যে আমি বেঁচে

আছি। এই দ্বীন অনুযায়ী আমি আমল করি। এই দ্বীনের পথে সাধ্যানুযায়ী আমি জেহাদ করি। এই দ্বীনের অনুসরণের কারণেই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা চাহে তো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবো। সেদিন এই দ্বীনের ছায়ায় আমি আশ্রয় নেবো এবং মিল্লাতে মোহাম্মদীর পরিচয়ে পরিচিত হবো।

এই দ্বীন আলোর উৎস। এই দ্বীন বিশ্বজগতকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণ, বরকত এবং নেয়ামতে পূর্ণ করেছে। এই দ্বীন মানুষকে তার উন্নত উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্ময়কর বহু উদাহরণের মাধ্যমে এই দ্বীন আলোর মিনার নির্মাণ করেছে। জ্বীন-ইনসান, পশুপাখি ইত্যাদি সব মাখলুকের জন্যে এই দ্বীন রহমতস্বরূপ। অন্যায় ও অকল্যাণের মূলোৎপাটন করে সত্য ন্যায়ের ও সুন্দরের বিকাশ এই দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য। পবিত্রতা, ভালোবাসা, পরিচ্ছন্নতা এই দ্বীনের ফসল। কাজেই সকল মুসলমানের উচিত নিজ দ্বীনের মূল্য জেনে নেয়া। এই দ্বীন নিয়ে গর্ব করা এবং এই দ্বীনের শত্রুদের মোকাবেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই সত্য দ্বীন মানব জীবনের আত্মিক ও শারীরিক উভয় দিকের ওপরই গুরত্বারোপ করে। এই দ্বীন মানুষকে পূর্ণাংগ আলো এবং সুস্থতা দান করে। এই দ্বীন দুনিয়ার সৌন্দর্যকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না, বরং সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। এর ফলে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার নিশ্চিত হতে পারে। এই দ্বীন তার অনুসারীদের বঞ্চনা এবং পথভ্রষ্টতার প্রান্তরে ঠেলে দেয় না। বরং এই দ্বীন সম্মানজনক এবং চমৎকারভাবে পরম প্রিয় প্রতিপালকের সাথে মিলিয়ে দেয়। এতো বড় নেয়ামতের কথা কি প্রকাশ না করে পারা যায়? এই দ্বীনের প্রশংসা না করে কি থাকা যায়? রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ন্যায় বিচারের প্রশংসা করেনি এবং যুলুম অত্যাচারের নিন্দা করেনি সে যেন আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে সদা তৎপর থাকা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। রসূল (স.) আরো বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও। এই হাদীসের বাণী সব সময় আমাদের সামনে রাখা দরকার।

রবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) যেভাবে দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগ করেছেন সেভাবে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ করা প্রত্যেক উম্মতের কর্তব্য। এছাড়া তোমরা মানুষকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সেভাবে ভয় দেখাও যেভাবে রসূল (স.) ভয় দেখাতেন।

এ সকল বাস্তবতা আমার সামনে ছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং লেখার কাজের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব চিন্তা করার পর নিজের অসহায়ত্ব টের পেয়ে কলম রেখে দিতাম। মনে ছিলো প্রচুর আগ্রহ, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাওয়ার আশাও ছিলো। অবশেষে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে লিখতে শুরু করলাম। সেই প্রচেষ্টার ফসল এই গ্রন্থ।

নিজের চেষ্টা-সাধনায় যদি আমি সফল হয়ে থাকি, তবে সেটা শুধু আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যিনি আমার আকাংখা পূর্ণ করেছেন। যদি কোনো ভুলত্রুটি থেকে থাকে তবে সেটা আমার মানবিক দুর্বলতার কারণেই হয়েছে। সে জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি জানেন এই কাজে আমার নিয়ত ছিলো এখলাছে পরিপূর্ণ।

বিবেক নাকি প্রেম!

শুরুতেই একটা কথা বলে রাখি যে, বিবেক বুদ্ধির মোকাবেলায় আমি অন্তর এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমার বিবেচনায় বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার চেয়ে প্রেরণা এবং আবেগ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তি ত্যাগ স্বীকারের আগে কারণ জানতে চায়। কিন্তু প্রেম-ভালোবাসা তা জানতে চায় না। নমরুদের আগুনে ইবরাহীম ঝাঁপ দিয়েছেন প্রেমের কারণে, বিবেক বুদ্ধির নিরিখে একাজ এখনো অমীমাংসিত।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে লিখবো। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁর ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তিনি হবেন হযরত ওমর (রা.)। তাঁর চেহারা সূর্যালোকের মতো চমকাতে থাকবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো হে রসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই, এই সময়ে আবু বকর (রা.) কোথায় থাকবেন? ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আবু বকরকে তার আগেই ফেরেশতারা বিনা হিসেবে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। তিনি হবেন এমনই সৌভাগ্যবান।

এস্তেখারা

কার ওপর লিখবো এ সম্পর্কে এস্তেখারা করেছিলাম। হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে লেখার দিকেই মন টানলো। এরপর আমি লিখতে শুরু করলাম, তবে একজন ঐতিহাসিকের মতো নয় বরং একজন অনুসন্ধানীর মতো লিখতে লাগলাম। ওমর (রা.) ছিলেন আল্লাহ্র ওলী। তাঁর ভেতর ও বাহির ছিলো একরকম। আল্লাহ্র ভয়ে তিনি ছিলেন কম্পমান। আল্লাহর ওলীদের আমি ভালোবাসি। এই লেখার মাধ্যমে আমি নিজের প্রশিক্ষণ এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে চাই। আল্লাহ তায়ালার সামনে হয়তো এই সামান্য খেদমত পেশ করে আমি সফলকাম হতে পারবো। নেকী এবং তাকওয়া থেকে আমি নিজে অনেক দূরে, কিন্তু নেককার লোকদের ভালোবাসি। মনে মনে এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তায়ালা নেককার লোকদের ভালোবাসার কারণে হয়তো আমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করে নেবেন। সহীহ মোসলেম এবং তিরমিযি শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূল (স.) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে ব্যক্তি নেককারদেরকে ভালোবাসে কিন্তু নেকীর ক্ষেত্রে তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না। রসূল (স.) বললেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথেই থাকবে।

হযরত ওমর (রা.)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে। তাঁর আত্মত্যাগ, তাকওয়া, ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা, বীরত্ব-বাহাদুরি, সত্যানুসন্ধিৎসা এমন গুণ বৈশিষ্ট্য যা থেকে দৃষ্টি ফেরানো যায় না। দুনিয়ার পেছনে ঘুরে কি হবে? এর মূল্য কতটুকু? আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াকে তুচ্ছ বলে জেনেছেন। তিনি এখানে মোমেনকে পুরস্কার দেননি, কাফেরকে শাস্তি দেননি। অবিনশ্বর এবং স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে আখেরাত। হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একথার প্রমাণ দেয়। এর কারণেই তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আকাশে উত্তোলন করেছেন।

পরিচ্ছন্নতা ও প্রশিক্ষণ

দুনিয়া এবং আখেরাত সম্পর্কে যদি আমাদের চিন্তা-চেতনা পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তাহলে আমরা বর্তমান আবমাননা এবং অধঃপতন থেকে প্ররিত্রাণ পেতে পারি। এই আবমাননা এবং অধঃপতন তো আমাদের ভাগ্য লিখনে পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি এখনো সময় আছে। কেউ যদি বলে যে, গাড়ী তো চলে গেছে, তাহলে বসে বসে আফসোস করার চেয়ে নতুন গাড়ী ধরার জন্যে সচেষ্ট হওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। সুযোগ একবার না হয় গেলোই, পরবর্তী সুযোগ তো কাজে লাগাতে হবে। পার্থিব দেহ কবরে চলে যায়, কিন্তু রূহতো শেষ হয় না। রূহানী শক্তি হচ্ছে মযবুত দুর্গ, এই দুর্গ হতাশাগ্রস্ত সৈন্যদের পরাজিত করে।

যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি মেনে নেয় তাকে দাওয়াত দাও, সে যেন এখনই অবচেতনের ঘুম থেকে জেগে নব বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এটাতো ঠিক যে বর্তমানে মুসলমানরা নিকৃষ্ট অবস্থার সম্মুখীন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো মন্দ থেকেও

ভালো বের করতে পারেন, কাজেই হতাশার কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হতে পারে যে একটি জিনিস তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং সেটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। হতে পারে একটি জিনিস তোমাদের কাছে পছন্দনীয় কিন্তু সেটাই তোমাদের জন্যে অকল্যাণের। আল্লাহ তায়ালা যা জানেন তোমরা তা জানো না।

আমার একান্ত আশা যে, আমরা হযরত ওমরের সীরাত থেকে পরিচ্ছন্নতা এবং প্রশিক্ষণ অর্জন করবো। এটা আমাদের নাজাত এবং সাফল্যের মাধ্যম হতে পারে। আমাদেরকে অধঃপতন থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। হযরত ওমর (রা.) সাইয়েদ আব্বাস (রা.)-এর হাত ধরে আকাশের দিকে তুলে বললেন, হে পরম করুণাময় দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টি আমাদের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। তোমার প্রিয়নবী (স.)-এর প্রিয় চাচার ওছিলা দিয়ে আবেদন করছি তুমি আমাদেরকে রহমতের বৃষ্টি দাও।

এই দোয়ার পর বৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে মানুষ হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাত চুম্বন করতে লাগলো। তিনি 'সাকীউল হারামাইন' নামে পরিচিতি লাভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আব্বাসতো বৃষ্টি বর্ষণ করেননি। বৃষ্টিতো আল্লাহ্র রহমতের কারণে হয়েছিলো তবে হযরত আব্বাস (রা.) দোয়া করেছিলেন। একারণে সাহাবারা তাঁকে উক্ত খেতাব দিয়েছিলেন। এতে কোনো সাহাবী সমালোচনা করেননি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-কলহও হয়নি। পুণ্যবানদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর সময়েও ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তিনি এস্তেস্কার নামাযের আয়োজন করেছিলেন। হযরত ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদ আলজারমাশি দোয়া করেছিলেন।

কারামত আল্লাহ্র দান

আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কাছে থেকে কারামত প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই কারামত নেক বান্দাদের শক্তিতে নয় বরং আল্লাহর বিশেষ রহমতে প্রকাশ পায়। ইমাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে আল্লাহ্র ওলীদের হাতে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক ঘটনাবলী ঘটে। এ বিষয়ে ইবনে কাসির তার তাফসীরে অনেক কিছু লিখেছেন।

আমার বন্ধু, শত্রু সবাই জেনে রাখুক যে, আমি কোনো লেখক নই। গ্রন্থ রচনা করার মতো যোগ্যতাও আমার নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে, আমার স্বভাবে সৌন্দর্যানুভূতি বেশ তীব্র। বিশ্বজগতে আমি সৌন্দর্য খুঁজে ফিরি। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকুল, জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তা-চেতনা, গাছ-পালা, পশু-পাখি, দ্বীন এবাদাত ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে আমি সৌন্দর্য খুঁজে ফিরি। আমি সৌন্দর্য প্রেমিক এবং সৌন্দর্যের জন্যে দেওয়ানা।

আল্লাহ তায়ালা নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। আমি লেখার ইচ্ছে করেছি, ফলে এই ইচ্ছা আমার রূহের খোরাক এবং আমার বক্ষের প্রশস্ততার কারণ হবে। আমার মন প্রশান্তি পাবে, আমার বিবেক পূর্ণতা লাভ করবে। আমি কলমের জোর এবং জ্ঞানের প্রকাশ দেখাতে চাই না। আমি সকল মুসলমান এবং নিজের প্রশিক্ষণের জন্যে চিন্তিত, আর এতে রয়েছে আমার অনেক মঙ্গল, অনেক কল্যাণ।

সীরাতে ওমর (রা.)-এর পুষ্পস্তবক

হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনচরিত কে না জানে? তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছুই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগেই সবকিছু লেখা হয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতা থেকে সেসব ঘটনাই আমি বেছে নেবো যেসব ঘটনা শত শত বছর আগে ঐতিহাসিকরা লিখে গেছেন। সেসব ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে আমার একটু ভিন্নরকমের চিন্তা ধারা আছে। সেই চিন্তার আলোকে নতুন আঙ্গিকে ঘটনাগুলো সাজাবো। তা থেকে শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণের জন্যে চেষ্টা করবো। নানা রংগের

ফুলতো বহু আগেই ফুটেছে আমি নিজের আকাংখা পূরণের জন্যে শুধু একটি পুষ্পস্তবক তৈরী করবো। আমি এই পুষ্পস্তবক খুব সুন্দর করে সাজাতে চাই। যদি এতে আমি সফল হই তবে সেটা হবে আল্লাহ্‌র রহমত, আর যদি ব্যর্থ হই তবে সেটা হবে আমারই ত্রুটি, আমারই ব্যর্থতা।

অনেকে মনে করেন যে, পাঠকের জন্যে নতুন তথ্য সম্বলিত বই বেশী উপকারী। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি মনে করি, সেই গ্রন্থই পাঠকের জন্যে উপকারী হতে পারে যে গ্রন্থ থেকে পাঠক শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়, হোক সেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য পাঠকের আগে থেকে জানা অথবা সম্পূর্ণ নতুন। যে গ্রন্থ পাঠককে দাওয়াতের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে না, কল্যাণকর কাজের প্রেরণা দেয় না সেই গ্রন্থ পাঠের ফল কি? এ তো সময় কাটানোর জন্যে অর্থহীন পাতা উল্টানো ছাড়া কিছু নয়। মোমেনের জীবন দর্শন অমুসলিমদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা জানি যে, আমাদের কাছ থেকে জীবনের সকল কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নেয়া হবে। যদি এ বিশ্বাস পোষণ করি তবে কিভাবে অর্থহীন গ্রন্থ পাঠে, গ্রন্থ রচনায় সময় নষ্ট করতে পারি? দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানার্জন করতে হয়। এ জন্যেই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে আমি কিছু ঘটনা বাছাই করেছি। এসব ঘটনায় আমি নিজেই প্রভাবিত হয়েছি। এটাই আমার পুষ্পস্তবক। এটি আমি জাতির সামনে পেশ করতে চাই। আল্লাহ করুন এই পুষ্পস্তবক থেকে মানুষ যেন নিজ জীবনের সৌভাগ্য এবং কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়।

চিন্তা চেতনার দাওয়াত

এ গ্রন্থ রচনার সময় আমি গভীর চিন্তা চেতনাকে সামনে রেখেছি। বর্তমান যুগ হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা, উন্নতি এবং আবিষ্কারের যুগ। কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন যে, তারা নিজেদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা পার্থিব জগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে। এ রকম চিন্তাকে আমি কিছুতেই সঠিক চিন্তা বলি না। আমি মনে করি যে, চিরস্থায়ী যে জীবন সেই জীবন সম্পর্কেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে। যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে তার বস্তুগত এবং পার্থিব দিকের কথা না ভেবে তার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এর ফলে শিক্ষা এবং আদর্শের মুক্তা আঁচলে সঞ্চিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা আসমান-যমীন এবং উভয়ের মাঝখানে সৃষ্ট মাখলুকাত ও কায়েনাত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার জন্যে পবিত্র কোরআনে বারবার দাওয়াত ও তাকিদ দিয়েছেন। এই দাওয়াত এবং তাকিদ আসমান-যমীন এবং সৃষ্ট মাখলুকসমূহের বস্তুগত দিক সম্পর্কে দার্শনিক গবেষণার জন্যে নয়, বরং এগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিক পর্যন্ত পৌছা এবং তাকে চেনার জন্যেই দেয়া হয়েছে। সূরা আ'রাফ এর ১৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নয়, সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে তো রয়েছে নিদর্শন। মনে হয় যেন প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তাশীলদের জন্যে চিন্তা ভাবনার জন্যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

একটু লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে তো এতে রয়েছে নিদর্শন।' (সূরা জাসিয়া, আয়াত ১৩)

এমনিভাবে পবিত্র কোরআন আমাদেরকে অন্ধ এবং বধির হয়ে থাকতে বলেনি, বরং ভেবে-চিন্তে চারদিকের অবস্থা দেখার পর্যলোচনা করার এবং গভীর মনোযোগের নির্দেশ দিয়েছে।

এই চিন্তা-ভাবনা গবেষণা প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌছার পথনির্দেশ দেয়। আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে। রসূলে আকরাম (স.) সব বিষয়ের প্রতি শিক্ষা গ্রহণমূলক দৃষ্টি দিতেন এবং তাঁর সাহাবাদেরও শিক্ষা গ্রহণের তালকীন দিতেন। রসূল (স.) এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে সচেতনতা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে প্রতিটি জিনিসের প্রতি আমাদের এমনভাবে নযর দেয়া উচিত যাতে আমরা কল্যাণকর শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হই।

রসূল (স.) বলেছেন, চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা সমতুল্য কোনো এবাদাত নেই। তিনি আরো বলেছেন, এক ঘন্টার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা, না বুঝে এক বছর এবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

বশর ইবনে হারেস (রা.) বলেন, মানুষ যদি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যথাযথ প্রজ্ঞা লাভে সক্ষম হয় তাহলে সে কখনোই আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করতে সাহস করবে না।

আল্লামা ইবনে আবুদ দুনিয়া তাঁর রচিত 'আততাফাককুর ওয়াল এ'তেবার' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনাটি ইসরাইলী বর্ণনা থেকে সংগৃহীত, কিন্তু আল্লামা ইবনে কাসির তাঁর তাফসীরে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি ত্রিশ বছর যাবত এবাদাত করেছিলো। ত্রিশ বছর যাবত এখলাছের সাথে এবাদাত করলে বনি ইসরাইলীদের কোনো না কোনো নিদর্শন দান করা হতো। যেমন প্রখর রোদের মধ্যে মেঘ এসে সেই ব্যক্তিকে ছায়া দান করতো। লোকটি নিজের মায়ের কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলো। মা বললেন, বাবা ভেবে দেখো, উক্ত সময়ের মধ্যে হয়তো তুমি কোনো পাপ করেছো। লোকটি বললো, আমার তো কোনো পাপ করার কথা মনে পড়ছে না। মা বললেন, ভেবে দেখো সম্ভবত তুমি কোনো পাপের ইচ্ছা করেছিলে, অথবা এমনও হতে পারে যে, তুমি কোনো কিছু না ভেবে আকাশের প্রতি তাকিয়েছিলে। লোকটি বললো, হাঁ ওরকম তো বহুবার হয়েছে। মা বললেন, হাঁ তাহলে এটাই ঘটেছে।

ইমাম ইবনে কাসির পবিত্র কোরআনের সূরা আনয়া'মের ষষ্ঠ আয়াতের যে তাফসীর লিখেছেন সেটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি। তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, এ রকম তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। তাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। এরপর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। ইবনে কাসির লিখেছেন, দেখুন, পবিত্র কোরআন এই উম্মতকে কিভাবে পথনির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে চিন্তা করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে এবং মানবেতিহাসের অন্যান্য জাতির ঘটনাবলী পাঠ করার আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের শক্তিসামর্থ্য এবং দুর্বলতার রহস্য জানার আহ্বান জানাচ্ছে। এই দাওয়াত এই আহ্বান শিক্ষা গ্রহণের জন্যেই দেয়া হচ্ছে। পবিত্র কোরআন এ ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মূলনীতি এবং পথ ও পাথেয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। মোটকথা চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণাকেই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দাঈর উচ্চ মর্যাদা

আল্লাহ্‌র পথে দাঈর কঠিন কাজে যে ব্যক্তি পথনির্দেশ পেতে চায় তাকে হযরত ওমর (রা.)-এর জীবন থেকে দিক নির্দেশনা লাভ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের পথে দাওয়াতের জন্যে যাদেরকে বাছাই করেছেন তাদের উচিত আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা। এটাতো আল্লাহর দেয়া গর্বের চাদর। এই চাদর খুলে ফেলার কথা মোমেন বান্দা কখনো যেন চিন্তাও না করে। এ কাজের বিনিময় এ দুনিয়ায় পাওয়া সম্ভব নয়। দাঈকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে সে একটি চুক্তি করেছে। এই চুক্তির শর্তাবলী পালন করা হলে বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দেবেন। যদি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা অংগীকার ভঙ্গের অন্য কোনো অপরাধ ঘটে তবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম।

হযরত ওমর (রা.) সম্বন্ধে আমি যতো পড়ালেখা করি, মন ততোই আন্দোলিত হতে থাকে। এই অধ্যয়নের ফলে আমার মনের প্রেরণায় সম্মোহন ঘটে এবং সাহস বেড়ে যায়। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। মনের উদারতা, স্বভাবের রুক্ষতার কঠোরতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন নম্রতা কোমলতার এক বিস্ময়কর সমাহার। কি চমৎকার এই সংমিশ্রণ। রুক্ষতার মধ্যে মাধুর্য ছিলো, নিষ্ঠুরতা ছিলো না। নম্রতা কোমলতার মধ্যে সৌজন্য এবং ভালোবাসার আর্দ্রতা ছিলো, দুর্বলতা বা ভীরুতার চিহ্নমাত্র ছিলো না। তাঁর কৌশল বা হেকমত ছিলো এমন বিশেষত্বপূর্ণ যে, সেটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। দূরদৃষ্টি এবং মেধার প্রখরতা এমন ছিলো যে, অবস্থা দেখে সঠিক পরিণাম বুঝতে পারতেন। প্রশংসা শুনে যেমন বিগলিত হতেন না, তেমনি সমালোচনা শুনে ক্ষেপে যেতেন না। সব সময় তিনি সত্যের সাথী হতেন এবং সত্যের সামনে মাথা নত করে দিতেন। মানুষের মর্যাদা ও মূল্য কিভাবে বেশী হতে পারে, আবার কিভাবে একেবারে কমে যেতে পারে এ প্রশ্নের জবাব হযরত ওমর (রা.) খুব ভালোভাবে জানতেন। তিনি মানবতার মূল্য উঁচু করার জন্যে কত কাজ করেছেন এবং মানুষের সকল অবমাননার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

মুসলিম মিল্লাতের বর্তমান বংশধররা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের সমাজ পরিবেশ দেখে তাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। নিজের আদর্শ এবং নিজেদের অতীত সম্পর্কে অসচেতন এসব যুবক অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে তারা মনে করছে অনুসরণযোগ্য এবং উন্নত, পক্ষান্তরে মুসলিম বিশ্বকে মনে করছে মূর্খ, অনগ্রসর এবং পশ্চাৎপদ। মুসলিম বিশ্বের এ অবস্থা বলার মতো নয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ জন্যে কে দায়ী?

ইসলামের কারণেই কি এ অবস্থা হয়েছে? অবশ্যই নয়। এ অবস্থা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই হয়েছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে এ অবস্থার জন্যে ইসলামকে দায়ী করে ফেলেছে। ইসলাম আজ দরিদ্র। আজ হযরত ওমর (রা.)-এর মত মানুষের বড় প্রয়োজন। ইসলামের বিজয়ের জন্যে উন্নত কর্মবীরের দৃষ্টান্ত সামনে থাকা প্রয়োজন। মুসলমানরা আজ প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে, তারা খোদাকে ভুলে গেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে মনকে আল্লাহর স্মরণে আযাদ করা, আল্লাহ্‌র যেকের থেকে শক্তি অর্জন করা।

আল্লাহর যেকের কি?

মুসলমান তো মুখে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, কিন্তু আমি মনে করি যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ বা আল্লাহ্‌র যেকের এর একটি তাৎপর্য রয়েছে। এটি হচ্ছে মোমেন বান্দা মনে প্রাণে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লির দ্বারা লাভবান হবে। আল্লাহ্‌র নূরের সামান্য তাজাল্লিও মোমেন বান্দার অন্তরকে অপার্থিব আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবে, বরফের চাঁইয়ের মতো মোমেনের মন শীতল হয়ে যাবে না। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান হচ্ছে একটি শক্তি। কিন্তু গাফেলতির কারণে, নিদ্রাচ্ছন্নতার কারণে তারা নিষ্প্রাণ এবং প্রভাবহীন মাখলুকে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর নূরের তাজাল্লি দেখে তারা উদ্দীপনা এবং জযবায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। মুসলমান কি

অনুভূতিহীন হতে পারে? মুসলমান এবং অনুভূতিহীনতা দুটি বিপরীতার্থক শব্দ। মুসলমানের জন্যে তার ঈমানের তাকিদ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাত সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করা এবং নিজেদের কর্তব্য পালনের জন্যে তাৎক্ষণিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আমি বারবার একথা বলতে চাই না যে, এই সীরাত গ্রন্থ রচনাকে আমি শুধু লেখালেখির আলোকে দেখছি না বরং এটাকে আমি মনে করছি এবাদাত। আশা করি এই কথা শুনে আপনারা অবাক হবেন না। কারণ আল্লাহ্‌র এবাদতের সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ নয় বরং বেশ ব্যাপক। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রতিটি যা কি না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বলা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে এবাদাত। চমৎকার সংজ্ঞা। একথা শুনে এবাদাতের মূল কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই ব্যাপকভিত্তিক সংজ্ঞা সামনে রেখে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করুন। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'জ্বীন ও মানুষকে শুধু এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার এবাদাত করবে।' (সূরা আয্ যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

শরীয়তের পরিভাষায় এবাদাত অর্থ হচ্ছে উচ্চস্তরের ভালোবাসা, পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং অসামান্য ভয়ভীতি। মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বহু বিস্ময়ের একটি বিস্ময় হলো মানুষ যা জানে না তার মোকাবেলায় যা জানে তাকেই প্রাধান্য দেয়। তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দেবেন এবং যে ব্যক্তি 'ঈমান বিল গায়েব' এর মর্মকথা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং অদৃষ্টের লিখন সম্পর্কে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে তার কথা আলাদা। শয়তান সব সময় মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপেক্ষায় থাকে। কোনো বিপদ এলে মনের মধ্যে নানারকম কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়।

হুযুর আকরাম (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ লাভে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস মনে পোষণ না করে যে, তার ওপর আপতিত বিপদ কোনো অবস্থায়ই না আসা সম্ভব ছিলো না।

আল এছাবা গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে একদিন হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে দেখা করে বললো, আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন যে, আপনি তাই পাবেন যা আপনার কপালে লেখা আছে? হযরত ঈসা (আ.) বললেন হ্যাঁ। শয়তান বললো, বেশ তাহলে সামনের ওই উঁচু পাহাড়ে উঠে নীচে লাফ দিন। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করার ক্ষমতা বান্দার নেই। (আল এছাবা তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩)

ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস

এই বিশ্বাসের রয়েছে দু'টি দিক। একটি হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে যাওয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তালাঝালা না করে ধৈর্য ধারণ করো। মনকে এই বলে প্রবোধ দাও যে, এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবেনা। অন্যটি হচ্ছে নিজের সাধ্য অনুযায়ী নেকী করার চেষ্টা চালানো এবং পাপ থেকে দূরে থাকা। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনো কূপে ঝাঁপিয়ে না পড়া।

রাবী ইবনে সালেহ বলেন, হাজ্জাজের নির্দেশে হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে গ্রেফতারের পর আমি কাঁদতে লাগলাম। হযরত সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন তুমি কাঁদো কেন? আমি বললাম, আপনার গ্রেফতার হওয়ার বিপদের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। হযরত সাঈদ বললেন, না কেঁদো না কিছুতেই না, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'পৃথিবীতে (সামগ্রিকভাবে) অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই সেটা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুবই সহজ।' (সূরা হাদীদ, আয়াত ২২)

বিপদের মূল্যায়ন এবং ওযন যদি আমরা নিজেদের অপূর্ণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে করতে থাকি তবে সেটা হবে বড় রকমের ভুল। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপক জ্ঞান এবং সীমাহীন হেকমত আমরা কিভাবে ওযন করতে পারি? ভাগ্যের

ওপর যেভাবে ঈমান আনতে বলা হয়েছে আমরা যদি সেভাবে ঈমান আনি এবং নিজেদের যুক্তি, দর্শন, জ্ঞান প্রয়োগ থেকে বিরত থাকি তবে বহু সমস্যা, বহু জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। আমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

আমরা রেযেকের সন্ধানে গলদঘর্ম হই। দিনে স্বস্তি নেই রাতে শান্তি নেই। আমরা যুক্তি দেখাই যে, রেযেকের সন্ধানে অলসতা এবং শিথিল চেষ্টা অপরাধ। নেকীর প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি আল্লাহ তায়ালা পরম করুণাময়। রেযেকও আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন এবং ততটুকু দিয়ে থাকেন যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। শাস্তি এবং পুরস্কারও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমরা সে ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে বসে থাকি। আতাউল্লাহ সিকান্দারী ছিলেন সুফী সাধক বুযুর্গ। তিনি বলেন, রেযেকের যিম্মাদারী আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন অথচ রেযেকের জন্যে দিন রাত তোমরা ছুটোছুটি করতে থাকো, কিন্তু যে কাজ ফরয বা অবশ্য কর্তব্য আখ্যায়িত করে তোমাদের চেষ্টা করতে বলা হয়েছে সে কাজে তোমরা অলসতা করছো। এটা কি তোমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় এবং দূরদৃষ্টির অভাব নয়।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসুক অথবা তিনি আমাদেরকে তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে রাখুন উভয় অবস্থায় আমাদেরকে আল্লাহ্‌র এবাদাত করতে হবে। হযরত আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর (রা.) ওহুদের যুদ্ধের দিনে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হুযুর (স.) এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর মোনাফেকরা বলাবলি করতে লাগলো, তিনি যদি আল্লাহ্‌র নবী হতেন তাহলে নিহত হতেন না। কেউ কেউ বললো আহা কেউ যদি আবু সুফিয়ানের কাছে থেকে আমাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতো; হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) এসব কথা শুনে বললেন, মোহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন, তিনি যদি শহীদ হয়েও থাকেন তবে তোমাদের কিসের ভালোবাসা? এসো আমরা লড়াই করি শাহাদাত বরণ করি। এরপর আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা! ওরা যা বলেছে আমি তা থেকে মুক্ত। আমার মনোভাব ওদের মতো নয়। এরপর হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) পাগলের মতো প্রবল বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন।

সত্যের পতঙ্গেরা এভাবে সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেন। সকল অবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অটল অবিচল থাকতেন। সাফল্য অসাফল্য কোনো অবস্থায়ই তারা আল্লাহ্‌র কাছে কোনো অভিযোগ করতেন না। অথচ যারা প্রবৃত্তির দাস তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা বক্র এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন বলেন, 'তিনিই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকে? কাজেই তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো?' (সূরা ইউনূস, আয়াত ৩২)

ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে যে, বান্দা অর্থাৎ মোমেন বান্দা আল্লাহর আনুগত্যে মাথা নত করবে। আল্লাহ্‌র আদেশের কারণ বুঝে আসুক অথবা না আসুক। যদি এটা জানা যায় যে, সেই আদেশ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের, এরপর কি অবাধ্যতার কোনো কারণ বাকি থাকে? এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামের কোনো আদেশ তাৎপর্যহীন হতে পারে। না তা কিছুতেই হতে পারে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেই তাৎপর্য, সেই হেকমত পর্যন্ত পৌঁছুতে ব্যর্থ হতে পারে। গায়েবী পর্দার পেছনে আমরা উঁকি দিতে পারি না। সূরা কাহাফে মূসা (আ.) এবং খেযিরের ঘটনা আল্লাহ তায়ালা আমাদের বর্ণনা করেছেন। সেখানে আপাত দৃষ্টিতে অযৌক্তিক কাজের ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। এ দুনিয়ায় আনন্দ যেমন স্থায়ী হয় না। দুঃখ-কষ্টও স্থায়ী হয় না। আল্লাহ তায়ালার সাথে নিকটতম সম্পর্ক এমন এক সম্পদ যা কেউ কেড়েও নিতে পারে না, যা কখনো ধ্বংসও হয় না। এই সম্পদ পাওয়ার পর মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ

তায়ালা যদি দান করেন তবে শোকরিয়া আদায় করতে হবে, আর যদি তিনি না দেন তবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

সত্যের সন্ধান

আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি আল্লাহ্র এবাদতের মূল ভিত্তি। আল্লাহ্র আদেশের ওপর যদি আমরা সন্তুষ্ট না থাকি, তবে আমাদের এবাদাত লোক দেখানো এবাদাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। রসূলে আকরাম (স.) একটি হাদীসে কুদসীতে বলেন, হে বনি আদম তুমি আমার এবাদতে একাগ্রতার পরিচয় দাও। আমি তোমার মনকে সব মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবো। তোমাকে আমি দরিদ্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করবো না। যদি তুমি আমার এবাদাতে একাগ্রতার পরিচয় না দাও তবে জেনে রাখো, আমি তোমার মনকে পেরেশানির আবাসস্থলে পরিণত করবো এবং তোমাকে দারিদ্র্য এবং অভাব অনটনের মধ্যে ফেলে রাখবো। অপর এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে বনি আদম, আমি তোমাদের আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি, কাজেই আমোদ-প্রমোদ খেলা-ধুলায় জীবন কাটিয়ে দিও না। আমি তোমার রেযেকের যিম্মাদারি নিয়েছি কাজেই রেযেকের জন্যে চিন্তা করে করে নিজেকে ধ্বংস করো না। আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো, তুমি আমাকে পেয়ে যাবে। আমাকে পাওয়ার পর তুমি সব কিছু পেয়েছো মনে করবে। যদি তুমি আমাকে হারাও তবে সব কিছু হারিয়েছো মনে করবে। তুমি যদি আমাকে পেয়ে যাও তখন আমিই হবো তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

প্রথম হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে এবাদতে একাগ্রতা দাবী করেছেন। অর্থাৎ আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হতে হবে আল্লাহ্র সত্তা। জীবনের অন্য সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ্র সত্তা আমাদের মন প্রাণের নিকটবর্তী মনে হবে। এতে আমাদের মন হবে আরো বেশী সমৃদ্ধ। অন্তরের সমৃদ্ধি আর্থিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির চেয়ে ভিন্ন ধরনের। যার অন্তর সমৃদ্ধ সে দৈন্যদশার মধ্যে থেকেও সৌভাগ্যবান। যার মন দরিদ্র সে ধন-সম্পদ প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও বদনসীব, হতভাগ্য। তাকে যদি সোনার দু'টি পাহাড় দেয়া হয় সে তৃতীয় একটি পাহাড়ের জন্যে লালায়িত হবে।

দ্বিতীয় হাদীসে কুদসীর বক্তব্যও প্রথমটির মতো। তবে এই হাদীসে মোমেন বান্দাকে প্রশান্তি দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বান্দার অস্তিত্বের রহস্যই হচ্ছে আল্লাহ্র এবাদাত। সে যখন দেখে আল্লাহ্র এবাদাতের দৃষ্টিতে দেখে, সে যখন শোনে আল্লাহ্র এবাদাতের কানে শোনে। মোটকথা তার প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র এবাদাতের জন্যে হয়ে থাকে। আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুকে জীবন বিনষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে দ্বীন ইসলামে অর্থহীন কোনো কাজের কথা চিন্তা করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আল কোরআন মীমাংসাকারী বাণী এবং এটি নিরর্থক নয়।' (সূরা তারেক, আয়াত ১৩, ১৪)

পার্থিব জীবনে মানুষ দু'টি বিষয়ে বেশী চিন্তিত থাকে। একটি হচ্ছে রেযেক, অন্যটি হচ্ছে জীবন। অথচ আল্লাহ তায়ালা রেযেকের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। রেযেক যতোটুকু ভাগ্যে আছে ততটুকু অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই আসবে। এক মুহূর্ত আগেও হবে না, পরেও হবে না। এই দুনিয়ার বহু বিত্তশালী মানুষ রয়েছে যারা ভয়ানক মানসিক অশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। পক্ষান্তরে বহু দরিদ্র মানুষ রয়েছে যারা চমৎকার মানসিক প্রশান্তিতে জীবন যাপন করছে।

মানুষ এ দুনিয়ায় বহু কিছু আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে মানসিক এবং শারীরিক যোগ্যতা ও সামর্থ্য দান করেছেন। যিনি এতো কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি একটি কথা দিয়েই সবকিছু ধ্বংস করে দিতে

পারেন। বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আল্লাহ্কে ভুলে থাকা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। তাঁরই জন্যে একান্তভাবে আত্মসমর্পিত হয়ে একাগ্রতার পরিচয় দেয়াই সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

দীর্ঘকাল যাবত মানুষ গাফেলতির ঘুমে বিভোর। বর্তমানে জাগরণের কিছু নিদর্শন দেখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভীত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র কাছে আমরা দোয়া করি এই জাগরণ যেন ইসলামের পুনর্জাগরণে পরিণত হয়। আল্লাহ্র জন্যে এই কাজ মোটেই কঠিন নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। আমাদের মনে যদি ইসলামের সত্যিকার আদর্শ রেখাপাত করে তবে আমরা নিজেদের চরিত্র ও কাজের স্বাতন্ত্রের কারণে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভে সক্ষম হবো। ইসলাম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র এবাদাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এবাদাতে লেগে থাকে সে নিজেই শুধু সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না বরং তার অস্তিত্বের কারণে সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৌভাগ্য সূচিত হয়। ইসলামের ছায়াতলে যে আশ্রয় গ্রহণ করে সম্মান ও মর্যাদা তার ভাগ্য লিখনে পরিণত হয়।

আল্লাহ্র বান্দাদের গুণাবলী

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছে চান যে, তারা তাঁরই এবাদাত করবে। সভ্যতা-সংস্কৃতি, স্বাচ্ছন্দ্য-উন্নতি, আবিষ্কার, শক্তি, সম্মান ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ্র বন্দেগীর মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা ইসলামের অনুকরণ অনুসরণের কারণেই দুনিয়ায় বিজয়ী হয়েছেন, সম্মান লাভ করেছেন। অথচ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমরা আজ অবমাননা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন। পবিত্র কোরআন আমাদের কাছে দাবী জানায় যে, আমরা যেন আল্লাহ্র এবাদতের এমন নমুনা পেশ করি যার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি বা অপূর্ণতা না থাকে। যারা আল্লাহ্র এবাদাত করে তারা নিজেদেরকে সত্যের নমুনা হিসেবে তৈরি করে নেয়। কখনো সেই সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না। এ ধরনের সত্যের নমুনা যারা স্থাপন করতে পারে না তাদের এবাদাত বন্দেগীর মূল্য কতটুকু? আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কোরআন অধ্যয়ন করো। তবে কি তোমরা বুঝো না?' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৪৪)

আল্লাহ্র বান্দা এবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৫৩)

যারা এবাদাত বন্দেগী করে তারা চিন্তা ফেকেরকে নিজেদের সাথী করে নেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৪)

আল্লাহ্র বান্দা বন্দেগীর দাবী পূরণ করতে গিয়ে সতর্কতা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎ কাজ করো, আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (সূরা আল বাকারা আয়াত ১৯৫)

আল্লাহ তায়ালার এবাদাত যারা যথাযথভাবে করে তারা মোনাফেকী এবং ধোঁকা-প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন

সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২০৪)

আল্লাহ্‌র এবাদাতের মাধ্যমে নিজের জীবনকে যে ব্যক্তি সুন্দর এবং সুসজ্জিত করেন তিনি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন না, আবার কারো কাছে বিনিময় বা প্রশংসাও প্রত্যাশা করেন না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুটি লাভের জন্যে আত্মবিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি অতি দয়ার্দ্র। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২০৭)

যারা আল্লাহর এবাদাত করে তাদের গুণাবলী উন্নত পর্যায়ের হয়ে থাকে। তারা কখনো হীনমন্যতার শিকার হয় না। মৃত্যু পর্যন্ত তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমরা আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই আয়াতের নমুনা বানিয়ে দেবেন। এই দ্বীনে আল্লাহ তায়ালা সব সময় এমন মানুষ তৈরী করতে থাকবেন যাদের দ্বারা তাঁর আনুগত্য এবং ওফাদারীর কাজ নেবেন।

ইসলাম পূজা অর্চনার কোনো ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এই দ্বীন সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এবং শিক্ষা দিয়েছে। ছোট বড় কোনো কিছুই এই দ্বীনের আওতা থেকে বাদ যায়নি। কোনো বিষয়েই মানুষকে অন্ধকারে রাখা হয়নি, বরং স্পষ্ট পথনির্দশ দেয়া হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রের সমাধান দিয়ে এই দ্বীন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে। এই বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে যতো জনের জীবনী আমি পাঠ করেছি এতে আমি স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইসলামের চেয়ে উন্নত ও উৎকৃষ্ট অন্য কোনো আদর্শ জীবন ব্যবস্থা এ বিশ্বে পাওয়া যায় না। আমাদের যে সকল যুবক পাশ্চাত্যের অনুকরণ-অনুসরণের জন্যে ব্যগ্র ব্যাকুল, তাদের উচিত নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর পড়ালেখা করা। বর্তমানে তারা পাশ্চাত্যের অনুকরণ অনুসরণের পক্ষপাতী, তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচারক কিন্তু নিজেদের দ্বীন সম্পর্কেও তাদের অধ্যয়ন করা উচিত। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয় এসব যুবক তরুণ যদি নিজেদের দ্বীনের অধ্যয়ন চালিয়ে যায় তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, পাশ্চাত্যের আদর্শের প্রচারক না হয়ে তারা দ্বীনের মোবাল্লেগ হয়ে যাবে। ইসলামের যুক্তিসমূহ এতো শক্তিশালী এবং বিজয়ী যে, আমি কখনোই এমন আশংকা বোধ করি না যে, কেউ আমাদের পরাজিত করতে পারবে। ইসলাম পরিপূর্ণভাবেই হেদায়াতের নূর। দুনিয়ায় যতো বেশী অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে তখনো এই হেদায়াতের নূর অবশিষ্ট থাকবে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটি দিয়াশলাই জ্বালানোর পরই সেই আলোকবর্তিকা নিজের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে। যদি এ রকমই হয়ে থাকে তবে মুসলিম মিল্লাতের কি হয়েছে? কেন আজ তারা নূরে কামেল বা পরিপূর্ণ আলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রভাব বলে আচ্ছন্ন?

ব্যক্তি ও সমাজ

ব্যক্তি ও সমাজের গুরুত্ব ও অবস্থান এবং উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আধুনিক কালের জ্ঞানী গবেষকরা বহু কিছু লিখেছেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়ানো লক্ষ্য করা যায়। কেউ একদিকে ঝুঁকে গেছেন, কেউ আবার অন্যদিকে চূড়ান্ত পার্যায়ে উপনীত হয়েছেন। রসূল (স.) ব্যক্তি ও সমাজের মূল্য ও মর্যদা এমন চমৎকারভাবে নিরূপণ করেছেন যে, ব্যক্তির অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়নি, আবার সমাজ ব্যক্তির হাতে যুলুম অত্যাচারের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনি। ব্যক্তিকে সমাজের সেবায় আত্মনিয়োজিত থাকতে হবে। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। এই সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন সেবক এবং কল্যাণকর সদস্যে পরিণত হবে তখন তার পরিণামে সকলেই নিজের শ্রমের সুফল লাভে সক্ষম হবে। রসূল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে দান বা সদকা করা ফরয। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যার কাছে দেয়ার মতো কিছু নেই সে কিভাবে

দান করবে? রসূল (স.) বললেন, এ রকম মানুষ নিজের হাতে কাজ করবে তারপর অর্জিত অর্থ নিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে তা থেকে কিছু দানও করবে। সাহাবারা জানতে চাইলেন যদি সেই ব্যক্তি কাজ করতে সক্ষম না হয়? রসূল (স.) বললেন, এ রকম ব্যক্তি অন্য অসহায় বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করবে। এটাই তার জন্যে দান বা সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে। সাহাবারা বললেন যদি এতেও সে সক্ষম না হয় তখন কি হবে? রসূল (স.) বললেন, তাহলে সে নেকীর কাজ করতে থাকবে এবং পাপ থেকে দূরে থাকবে। এটাই হবে তার জন্যে সদকা।

আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে যে সম্মান ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় ও শিক্ষা রসূল (স.) দিয়েছেন সেটা তুলনাবিহীন। বিশ্বের বড় বড় শক্তি চুক্তি করার ক্ষেত্রে কখনো সৎ উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটায় না, কারণ তাদের দৃষ্টিতে দেশের স্বার্থে সবকিছুই বৈধ। রসূল (স.) বলেছেন, কারো সাথে চুক্তি করার পর চুক্তির শর্ত লংঘন করে যদি সেই ব্যক্তিকে অপর পক্ষ হত্যা করে তবে তারা বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ বেহেশতের সুবাস ৪০ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। রসূল (স.) আরো বলেছেন, কেউ যদি অমুসলিম যিম্মির প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে দিয়ে শক্তি সামর্থ্যের বেশী কাজ করিয়ে নেয় অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কোনো জিনিস কেড়ে নেয়, তাহলে সেই যিম্মির পক্ষে উকিল হয়ে কেয়ামতের ময়দানে আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।

আমাদের দ্বীনে অংগীকার পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আইনের ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোনো সভ্য জাতিও ইসলামের মোকাবেলায় উন্নত কোনো ব্যবস্থা দিতে পারেনি। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামের শত্রুরা আজ ইসলামের চিত্র বিকৃত করছে অথচ ইসলামের অনুসারীরা অস্ত্র সমর্পণ করে বসে আছে।

বিশ্ব সংস্থায় বা জাতিসংঘে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফের মাপকাঠি নির্ণীত হয় জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু ইসলামে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ সকলের জন্যেই সমান। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, নিশ্চয় খেয়ানতকারীদের আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। মোফাসসেররা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, কোনো অমুসলিম কাফেরের সাথেও খেয়ানত করা যাবে না, কারণ এটা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। রসূল (স.) অভাবগ্রস্ত গরীবদের মধ্যে দান খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যে কোনো ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারীই হোকনা কেন। তিনি বলেছেন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়ার পর কেউ যদি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে হত্যা করে তবে আমি এই হত্যাকারীর দায়িত্ব থেকে মুক্ত। যদি সেই হত্যাকারী মুসলমান এবং নিহত ব্যক্তি কাফেরও হয়ে থাকে।

মুসলমানরা সোনালী যুগে চুক্তির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। একবার রোমক সাম্রাজ্যের সাথে আমীর মোয়াবিয়ার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আমীর মোয়াবিয়া সৈন্যদল নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিলো যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে হামলা করবেন। হঠাৎ একজন ঘোড় সওয়ার এসে আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর উচ্চারণের পর বললো, অংগীকার পালনের জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওযর এবং ওয়াদাখেলাফি আমাদের জন্যে মানানসই নয়। একথা যিনি বলেছিলেন তার নাম আমর ইবনে আনবাজাজ। আমীর মাবিয়া (রা.) তাকে ডেকে পাঠালেন। আমর বললেন, রসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি, কোনো জাতির সাথে তোমাদের চুক্তি হওয়ার পর চুক্তির মেয়াদকালে তোমরা এমন কোনো কাজ করবে না যে কাজ চুক্তির প্রাণশক্তির বিপরীত। সেই চুক্তিতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু আরোপ করো না বা বাদ দিও না। যদি চুক্তি মেনে চলা তোমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তবে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দাও যে, এ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করা হোক। এ রকম না বলে চুক্তির মেয়াদকালে চুক্তির বিরোধিতা হওয়ার মতো কোনো কাজ করো না। আমীর মোয়াবিয়া (রা.) এই হাদীস শোনার পর সৈন্যদল নিয়ে ফিরে যান।

দেশপ্রেমের মূলকথা

আজকাল দেশপ্রেমের নামে মানুষেরা সবকিছু বৈধ করে নিয়েছে। ইসলাম দেশপ্রেমের তাকিদ দিয়েছে, কিন্তু দেশপ্রেমের কারণে যুলুম অত্যাচার করার অনুমতি দেয়নি। আবু ফোসায়লিয়া ওয়ায়েলা ইবনে আসকাজায (রা.) বর্ণনা করেছেন রসূল (স.)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল, স্বজাতিকে ভালোবাসা কি পাপ? তিনি বললেন না, পাপ নয় তবে নিজ কওমের কোনো ব্যক্তির যুলুম অত্যাচারে সহায়তা করা পাপ। শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ইসলাম নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। রসূল (স.) বলেছেন, মোশরেক এবং কাফেরদের ওপর তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ হামলা করবে না। প্রথমে চেষ্টা করবে যাতে তাদেরকে তোমাদের মতের অনুসারী এবং দ্বীনের আলোকে উদ্ভাসিত করা যায়। এরপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। (যুদ্ধ তখনই করবে যখন সেটা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে)। মনে রেখো, এই বিশ্বজগতের যে কোনো ঘর এবং তার থেকেই ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ আমার কাছে এসে হাযির হলে সে আমার প্রিয় হবে। আমি এটা পছন্দ করি না যে, তোমরা নারী এবং শিশুদের বন্দী করবে এবং পুরুষদের হত্যা করবে। বরং আমি চাই যে, তোমরা তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাবে।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে সৈন্যদলের অধিনায়ক মনোনীত করার পর রসূল (স.) বিদায় দেয়ার আগে তাদের কিছু উপদেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সফরের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করবে এবং সঠিক তথ্য জানার জন্যে গুপ্তচর দলকে প্রথমে রওয়ানা করিয়ে দেবে। (সফরের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করতে বলার কারণ হচ্ছে যাওয়ার পথে যেসব গ্রাম এবং গোত্র পড়বে তাদের ওপর যেন সেনাদল বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। গুপ্তচরদের প্রথমে রওয়ানা করতে বলার কারণ হচ্ছে, না জেনে বুঝে কারো ওপর যেন হামলা না করা হয় বরং প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ভেবে চিন্তে নেয়া হয়।) আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদেরকে বিজয় দান করেন তবে বিজিত এলাকায় বেশী সময় অবস্থান করবে না। গুপ্তচরদের সব সময়ই সৈন্য সমাবেশের আগেই পাঠিয়ে দেবে। এই হাদীসে রসূল (স.) মুসলিম সৈন্যদের আত্মরক্ষার কৌশলও শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিবেক জাগ্রত রাখতে বলেছেন। এতে তিনি প্রতিপক্ষের অধিকারও বর্ণনা করেছেন।

আরাফা ইবনে হারেছ আলকিন্দি খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকা বিজয়ের পর তাদের সাথে চুক্তি করলেন এবং সেই চুক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। এরপর জানিয়ে দিলেন কোনো মুসলমান যেন এই চুক্তি লংঘন না করে। তিনি বলেন, আমরা ওদের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছি যে, তাদের গীর্জায় প্রবেশ করবো না। নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী এবাদাত করার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। আমরা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করবো। তাদের ওপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপাবো না। যদি বাইরের শত্রু হামলা করে তবে আমরা চুক্তির অপর পক্ষের নিরাপত্তার লক্ষ্যে বাইরের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবো। ওদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে তাদের ধর্ম অনুযায়ী আইন-কানুন প্রবর্তন করবো। তবে যদি তারা স্বেচ্ছায় ইসলামী আইনে ফয়সালা করাতে চায় তবে এতে আমরা আপত্তি করবো না। তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে এ ব্যাপারে আমরা কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করবো না।

যিম্মিদের জান মালের নিরাপত্তা এবং উপাসনার অধিকারই শুধু ছিলো না বরং তাদের মানবিক মর্যাদা এবং আভিজাত্যের বিষয়টিও মনে রাখা হতো। একবার কাযী ইসমাইল ইবনে ইসহাকের কাছে একজন যিম্মি উপস্থিত হলো। তিনি তাকে যথাযথ সম্মান দেখালেন। উপস্থিত লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে কাযী ইসমাইল পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পাঠ করেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে

স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তায়ালা তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সূরা মোমতাহেনা, আয়াত ৮)

একজন মোনাফেকের তওবা

ইসলাম মানুষের পৃষ্ঠপোষকতার নির্দেশ দিয়েছে। বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হলেও তার মানবিক মর্যাদা বজায় রাখা হতো। হারমেলা ইবনে যায়েদ আনসারী প্রথমে মোনাফেক ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে তওবা এবং এখলাছের তওফিক দিয়েছিলেন। এখলাছের সাথে তওবা করে তিনি সাহাবাদের জামায়া'তে শামিল হওয়ার পর রসূল (স.) তাঁর জন্যে দোয়া করেন। এরপর হারমেলা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি মোনাফেকদের নেতা ছিলাম, আমি ভালোভাবে জানি কারা কারা মোনাফেক। আমি কি আপনার কাছে তাদের নাম বলে দেবো? রসূল (স.) বললেন, না কারো গোপনীয়তা প্রকাশ করার দরকার নেই। ওদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সত্যিকার তওবা করে ঈমান আনবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো এবং তাকে ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করবো। যারা মোনাফেকের ভেতর ডুবে থাকতে চায় তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে বোঝাপড়া করবেন। কারো গোপনীয়তা আমার সামনে ফাঁস করার দরকার নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, যে কেউ তোমাকে সালাম করলে সেই সালামের জবাব দেবে। যদি সে ব্যক্তি অগ্নিপূজক হয় তবুও জবাব দেবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন কেউ যদি তোমাকে সালাম জানায় তবে তুমিও তাকে সেইভাবে জবাব দাও, তার শান্তি সালামতি কামনা করো। সূরা নেসায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা ওরকমই করবে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।' (সূরা আন নেসা, আয়াত ৮৬)

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, মুসলমানদের উত্তম দোয়া দেয়ার জন্যে তো নির্দেশ রয়েছে, অমুসলিমরা দোয়া করলে তাদেরকেও অনুরূপ জবাব দিতে হবে। (ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খন্ড)

আছদ ইবনে ওদায়া ঘর থেকে বের হবার পর ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সবাইকে সালাম করতেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, মানুষের সাথে সদালাপ করবে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৮৩)

একজন ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ

কাফেররা অনেক সময় রসূল (স.) এর সাথে রুক্ষ ভাষায় কথা বলেছিলো, কিন্তু রসূল (স.) তাদের সাথে নম্র ভদ্র আচরণ করেন। খায়ের নাজদা নামে একজন ইহুদী লোকের কাছ থেকে রসূল (স.) কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। লোকটি ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিলো। রসূল (স.) কয়েকদিন সময় চাইলেন। এতে উক্ত ইহুদী রূঢ় ভাষা ব্যবহার করলো। সাহাবারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। ইহুদী বললো, আমি ঋণ আদায় না করে ফিরে যাবো না। আমি তোমাকে ছাড়বো না। রসূল (স.) বললেন আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন চুক্তি করা হয়েছে, এমন লোকের প্রতি যুলুম করবে না। এই লোকটি যিম্মি, আমি তার ওপর হাত তুলবো না। দিনের শেষে রসূল (স.)-এর উত্তম ব্যবহারে ইহুদী এমন অভিভূত হলো যে, সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নিজের ধন সম্পদ থেকে ইসলামের প্রসারে বহু অর্থ ব্যয় করলো।

ওমর ইবনে আবদুল আযিযের কাছে তাঁর এক গবর্নর এলে গবর্নরকে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। গবর্নর জানালেন কিবতিদের পশুপাল জব্দ করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। ওমর ইবনে আবদুল আযিয একথা শুনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, আমার রাজত্বের

মধ্যে এ রকম যুলুম? এরপর নির্দেশ দিলেন যে, কিবতিদের পশুপাল তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক, আর গবর্নরকে ৪০ বার বেত্রাঘাত করা হোক।

অমুসলিমরা ইসলাম এবং ইসলামের পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালালেও আমরা তাদের দ্বীন এবং তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলি না। এই অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তি দেয়া যেতে পারে, কিন্তু গালির জবাব গালি দিয়ে দেয়ার কোনো অনুমতি নেই। আহলে কেতাবদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো নাজুক। তাদের নবী আমাদেরও নবী এবং রসূল আকরাম (স.)-কে আমরা যেভাবে শ্রদ্ধা করি আহলে কেতাবদের নবীদেরও একই রকম শ্রদ্ধা করা আমাদের জন্যে অত্যাবশ্যক।

শান্তি ও নিরাপত্তার দ্বীন

রক্তপাতকে ইসলাম ভীষণ অপছন্দনীয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যদিও রক্তপাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, যদি রক্তপাত না করেই সমস্যার সমাধান করা যায় তবে তাই করতে হবে। মুসলিম ইবনে হারেছ বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স.) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা শত্রুর এলাকায় পৌছার পর লক্ষ্য করলাম যে, শত্রুরা দুর্গের ভেতর নিজেদেরকে আবদ্ধ করে নিয়েছে। দুর্গের ভেতর বহু মানুষের চিৎকার শুনে আমি ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের দেয়ালের কাছে গেলাম। দুর্গের ভেতরের লোকদের আমি বললাম, তোমরা কালেমা শাহাদাত পাঠ করো। আমার এই দাওয়াত তারা সহজেই গ্রহণ করলো। আমার সঙ্গীরা বললেন, তুমি অকারণে আমাদেরকে গনিমতের মাল থেকে বঞ্চিত করেছো। আমরা হুযুর (স.)-এর কাছে মদীনায় পৌছার পর তিনি সব কথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং আমার কাজের প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকের কালেমা পাঠের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নেকী এবং উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এরপর রসূল (স.) ওসীয়তনামা লেখার জন্যে আদেশ দিলেন। সেই ওসীয়তনামায় রসূল (স.)আমার কাজের প্রশংসা করলেন এবং পরবর্তীকালের খলীফাদেরকে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন।

সূরা হজ্জে ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে বিষয়বস্তু হয়ে যেতো খৃষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।

এই আয়াতের তাফসীরে মোফাসসেররা লিখেছেন আল্লাহ তায়ালা উপাসনালয় ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। সেই উপাসনালয় খৃষ্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের এবাদাতখানা, বৌদ্ধদের প্যাগোডা, অগ্নিপূজকদের মন্দির যাই হোক না কেন। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন কুরতুবী পৃষ্ঠা ৪৪৬।

মিসরে ফাতেমী বংশের শাসকবৃন্দ কিবতিদের শুধু এবাদাত এবং ধর্মীয় রুসম-রেওয়ায, আচার-আচরণের স্বাধীনতাই শুধু দেননি বরং যোগ্য লোকদেরকে রাজদরবারেও উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। কয়েকজন কিবতিতো উজির পদেও নিয়োগ লাভ করেছিলো। ফেকাহবিদরা এ বিষয়েও বিতর্ক করেছেন যে, কোনো ইহুদী বা খৃষ্টানের পক্ষে ওসীয়ত করা যায় কি না। অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম এটা জায়েয বলেছেন এবং যুক্তি হিসেবে সূরা আহযাবের ৬নং আয়াত উল্লেখ করেছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবনের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নীরা তাদের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মোমেন ও মোহাজের অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তা করতে পারো। এটা কেতাবে লিপিবদ্ধ।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৬)

ধোঁকা, প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ইসলাম কোনো অবস্থায়ই বৈধ মনে করে না। মক্কায় মুসলমানদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার করা হয়েছে। কয়েকজন মুসলমান যুবক চিন্তা করেছিলো

যে, তাদের নিয়ন্ত্রণে আসা কাফেরদের হত্যা করবে। কিন্তু রসূল (স.) নিষেধ করলেন, অস্ত্র তোলার অনুমতি দিলেন না। সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি ছিলো না। দ্বীনের দাওয়াতের প্রাক্কালে মক্কায় গোপনভাবে কোনো কাফেরকে হত্যার অনুমতি ছিলো না। এটা ছিলো দ্বীনের উন্নত মর্যাদার কারণে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় যাওয়ার পর অত্যাচারিত মুসলমানদের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহ্র আদেশের আগে মক্কার মুসলমানরা মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেননি।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া এবং খাওয়ানো অর্থাৎ যেয়াফতে শরীক করার জন্যে মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। এটা তাদের জন্যে অবৈধ ছিলো না। অমুসলিমরা মুসলমানদের জন্যে কোনো যেয়াফতের ব্যবস্থা করলে সেই যেয়াফতে অংশ গ্রহণও বৈধ ছিলো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, রসূল (স.) ইহুদীদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং তাদের ঘরে আহার করা দোষনীয় মনে করতেন না। ইসলাম অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে এ ধরনের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করেছে। তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। অথচ অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে তো সবাই জানেন। বিশ্বের বহু দেশে এখনো মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে অমুসলিম সরকার যে ব্যবহার করে তা এক কথায় হৃদয়বিদারক।

অত্যাচারের অবসান এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা

অত্যাচার, যুলুম কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। অত্যাচারী হোক ব্যক্তি, দল, জনগণ বা সরকার, কোনো অবস্থায়ই তাকে সহায়তা করা যায় না। অত্যাচারীকে সাহায্যকারীও আল্লাহ তায়ালার ও রসূল (স.)-এর কাছে অত্যাচারীর মতোই ঘৃণিত। রসূল (স.) বলেছেন যে ব্যক্তি সত্যকে দাবিয়ে রাখার জন্যে মিথ্যাকে সহায়তা করেছে অর্থাৎ হক এর বিপক্ষে গিয়ে বাতিলের পক্ষ নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে তার প্রতি অসন্তুষ্টির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে যত তাড়াতাড়ি পাকড়াও করা হয় অন্য কোনো পাপের কারণে এতো তাড়াতাড়ি পাকড়াও করা হয় না। হযরত ওমর ইবনে সা'দ (রা.) ইসলামের মনোজ্ঞ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য দেয়াল এবং মযবুত দরোজা। ইসলামের দেয়াল হচ্ছে তার ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার। দরোজা হচ্ছে হক ও সত্যবাদিতা। যদি এই দেয়াল পতিত হয়ে দরোজা ভেঙ্গে যায় তবে ইসলাম পরাজিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুলতান মযবুত থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী থাকবে। সুলতানের ময়বুত থাকা তলোয়ার এবং চাবুকের মাধ্যমে সম্ভব নয়, বরং তার মযবুত ও অবিচল থাকার রহস্য সত্য, সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার মধ্যে নিহিত।

ইসলাম মানুষের জীবনকে সকল ক্ষেত্রে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করেছে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন পূরণ, চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতির চেষ্টা ইসলাম করেছে। বর্তমানে বিশ্বের সভ্য জাতিসমূহ নানা নামে বহু সংগঠন করে মানব কল্যাণের ঢোল পেটাচ্ছে, কিন্তু ওসব সংস্থার কার্যক্রমে কেউ সন্তুষ্ট নয়। ইসলাম সমাজের গঠন প্রশিক্ষণের এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যার মধ্যে প্রতিটি মানুষ পুণ্যের নিশানবর্দার এবং পাপের দুশমনে পরিণত হয়েছে। রসূল (স.) প্রতিটি মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তারা অন্যায় দেখে চোখ বন্ধ করার পরিবর্তে তা প্রতিরোধের চিন্তা করবে। তিনি বলেছেন, যে জাতির মধ্যে পাপ অন্যায় বিস্তার লাভ করবে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও সমাজের লোকেরা অন্যায় প্রতিরোধে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করবে না, আল্লাহ তায়ালা

পরকালে শাস্তি দেয়া ছাড়াও এ ধরনের লোকদের দুনিয়ার জীবনেও মৃত্যুর আগে শাস্তি দেবেন। একই ধরনের অন্য এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, যে জাতির দুর্বল লোকদের অধিকার নষ্ট করা হয়েছে অথচ শক্তিমান লোকদের বাধা দেয়ার জন্যে কেউ এগিয়ে আসেনি এ ধরনের জাতির ওপর অবশ্যই আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়েছে। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, কোনো জাতির মধ্যে যুলুম অত্যাচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করলে তারা সকল ক্ষেত্রেই পতনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। পক্ষান্তরে যে জাতির মধ্যে ন্যায় ও সুবিচারের কথা উচ্চারিত হয় তারা সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে। এসকল মূলনীতি শুধুমাত্র আদর্শিক দিক থেকেই বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং মুসলমানরা এসবের ওপর আমলও করেছেন। প্রতিটি মূলনীতির বাস্তবায়ন ব্যক্তির কাজের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন এসব মূলনীতির পূর্ণাঙ্গ আদর্শ এবং অনুসরণযোগ্য নমুনা। তাঁর সীরাত আলোচনা করার উদ্দেশ্য শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপস্থাপনই নয় বরং মানুষের জীবন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে দৃষ্টান্ত পেশ করাও বটে।

যুদ্ধে জয় পরাজয় দু'টোই হয়ে থাকে। ইসলাম বিজয়ী সৈনিকদেরকে পরাজিতদের সাথে যেরূপ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে বিশ্বের অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না। পরাজিত এবং দুর্বলদের সাথে নরম কোমল ব্যবহার প্রত্যাশিত। তাদের সাথে রূঢ় আচরণ, যুলুম, অত্যাচার করা হলে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। রসূল (স.) বলেছেন, একটি জাতি দুর্বল এবং অসহায় ছিলো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শক্তিশালী এবং অত্যাচারী শত্রুদের মোকাবেলায় বিজয় দান করেছেন। এসব বিজয়ীরা শত্রুদের সাথে রূঢ় নির্মম আচরণ করেছে, বহু আবেদন সত্ত্বেও তাদের সাথে নম্র কোমল আচরণ করা হয়নি। ফলে আল্লাহ তায়ালা সেই বিজয়ী জাতির ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন যখন তার দরবারে তারা হাযির হবে তখনো তিনি তাদের ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।

ইসলামের সমাজনীতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, ব্যক্তি আপনা আপনিই সমাজের সেবায় লেগে যায়। এই সেবাকর্ম করতে গিয়ে কতো রকম বিপদ মুসিবত নেমে আসে সে সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করে না, বরং নীরবে ধৈর্য সহিষ্ণুতার সাথে সেসব সহ্য করে যায়। এর কারণ হচ্ছে এর মধ্যে তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। রসূল (স.) বলেছেন, যে মোমেন মানুষের সাথে খোলামেলা ব্যবহার করে এবং সকল প্রকার দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করে সেই মোমেন সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ধৈর্যহীন মোমেনের চেয়ে উত্তম।

মোহাম্মদী সাম্য

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে এই দ্বীন মানুষের মধ্যে এমন সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে যে, এর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে স্বয়ং রসূল (স.)-কেও আইনের দৃষ্টিতে অন্যদের চেয়ে আলাদা করা হয়নি। রসূল (স.) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করছি। আমিও একজন মানুষ। তোমাদের অধিকারের ক্ষেত্রে যদি আমি কোনোরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলি তবে বিনা দ্বিধায় আমার কাছে দাবী করে নেবে। যদি আমি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি তবে সে যেন আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আমার যিম্মায় যদি কারো ধন-সম্পদ থাকে সে যেন উসুল করে নেয়। মনে রেখো আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে কিনা আমার কাছ থেকে তার পাওনা ও অধিকার আদায় করে নেয়। কারণ আমি চাই যখন আমি আমার প্রতিপালকের সামনে হাযির হবো, আমার ওপর কারো কোনো হক অপরিশোধিত থাকবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ রকম মনে না করে যে, আমার কাছে পাওনা হক পেতে চাইলে আমি কি মনে করবো। আমি কিছু মনেও করবো না এবং রূঢ় ব্যবহারও করবো না। কারণ এ দু'টি কাজ আমার স্বভাবের পরিপন্থী।

ইসলাম এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে যে সমাজে ধনী- গরীব, শক্তিমান- দুর্বল পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার পরিবর্তে সহায়তা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করতো। কোনো বিত্তবান ব্যক্তি দরিদ্রকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো না। কোনো গরীব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করতো না। একারণে সংঘাতের কোনো প্রশ্নও ছিলো না, সম্ভাবনাও ছিলো না। অর্থ সম্পদের মাপকাঠিতে নয় বরং চারিত্রিক উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারেই ব্যক্তির মূল্যায়ন করা হতো। প্রত্যেকেই অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতো, সেই ব্যথা সেই কষ্ট দূর করার জন্যে সচেষ্ট হতো। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মোমেন বান্দার বিপদ মুসিবত দূর করেছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার মুসিবত দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে সময় সুযোগ দিয়েছে, তার সাথে সদয় আচরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সুযোগ দেবেন এবং তার জন্যে সবকিছু সহজ করে দেবেন। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইকে সাহায্যে সক্রিয় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতের পথ খুলে দেন। আল্লাহ্র ঘরে সমবেত হয়ে কিছু লোক যখন আল্লাহ্র কেতাব তেলাওয়াত এবং দ্বীনী শিক্ষা প্রশিক্ষণে মশগুল থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং নিজের রহমতের দ্বারা তাদের ঢেকে নেন। ফেরেশতারা নিজেদের পালক দ্বারা তাদের ওপর ছায়া দান করেন। আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত ফেরেশতাদের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। কেউ যদি নেক আমলের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে তবে তার বংশ, গৌরব, শানশওকত তার কোনোই উপকারে আসবে না।

রসূল (স.) উত্তম চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং সদয় ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দার কাছে প্রিয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তি অপছন্দনীয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মাখলুকের কাছে অপছন্দনীয়।

রসূল (রা.) একবার ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, জান্নাতী এবং জাহান্নামীদের তোমরা চিনে নিতে পারো। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন সেটা কিভাবে হে রসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, ভালো আলোচনা এবং খারাপ আলোচনার মাধ্যমে। তোমরা পরস্পর পরস্পরের ওপর সাক্ষী।

ইসলামের বরপুত্র ওমর (রা.)

ইসলাম এক সত্য দ্বীন। এই দ্বীন তার অনুসারীদের জীবন যাপন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবর্ণ নীতির ব্যবস্থা করেছে। এই ইসলামই ওমর (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে। ইসলাম বিরোধী আদর্শ যারা প্রচার করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের উন্নত আদর্শ সম্পর্কে কিছুই জানে না। একদিকে তারা দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের কথা বলে অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা না করেই মতামত দিয়ে বাগাড়ম্বরই করে। যায়েদ এবং বকর (রা.)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে বলা হলে আপনি কিভাবে করবেন যদি যায়েদের নামই শুধু জানা থাকে, পরিচয় কিছুই না জানেন। ইসলামের শত্রুরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলে বড় বড় বুলি কপচায়, ঢোল পেটায়, অথচ তারা ইসলামকে এমন দাড়িপাল্লা দিয়ে ওযন করে যার একদিকের পাল্লাই নেই।

ইসলাম বিশ্ব সভ্যতাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ করে দিয়েছে। শাসন ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সভ্যতা- সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে মুসলমানরা ছিলো অগ্রবর্তী ও যুগের সেরা। স্পেন এবং বাগদাদ ছিলো জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল।

শিল্পবিপ্লব এবং অগ্রগতির চূড়ান্ত পর্যায়ে আরোহণ সত্যেও ইউরোপীয়রা প্রকৃত সত্য স্বীকারের ক্ষেত্রে কার্পণ্যের পরিচয় দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস,

বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রের কোন্‌টিতে মুসলমানদের ভূমিকা অস্বীকরা করা যায়? ইউরোপীয় পন্ডিতদের মধ্যে কেউ কি নিম্নোক্ত নামগুলো না জানার কথা বলতে পারে? বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আলরাজি, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, গজ্জালী, জাবের ইবনে হাইয়ান, ইবনে হাজম, জমশেদ ইবনে মাসউদ, আলকিন্দি, আল ফারাবি, আল খাওয়ারেজমি, ইবনুল হায়ছাম, ইবনুল হাছান, আলী ইবনে রেযোয়ান, আহমদ ইবনে ইউসূফ প্রমুখ মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময় মুসলমানরা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে আসনে সমাসীন ছিলো বর্তমানে সেই আসন থেকে নীচে নেমে গেছে। এই জন্যে তো ইসলাম দায়ী নয়, বরং দায়ী হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ পন্ডিতদের অলসতা। ইসলাম এখনো সেই প্রথম দিনের মতোই শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা গাফেলতি এবং ধর্মহীনতার শিকার হয়েছে। কেউ কেউ ইসলাম এবং মুসলমানকে একার্থবোধক মনে করে থাকেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান।

হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর আমি লেখার ইচ্ছা করেছি। এটা এ কারণে নয় যে, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাই। সেটাতো আগেই প্রমাণিত হয়েছে। আমি শুধু ওমরের সীরাতের মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। তবে এটাও ঠিক যে, আমি অন্যদের নয় বরং নিজেকেই মুখাপেক্ষী মনে করি। হযরত ওমর (রা.)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকা এবং তাঁর জীবননদীর স্বচ্ছ সলিলে আবগাহন করার মাধ্যমে মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাত উজ্জ্বল ও সুন্দর হতে পারে। ওমর (রা.)-এর জীবনের সকল দিক সম্পর্কে আলোকপাতের যোগ্যতা আমার নেই। আমি শুধু কিছুসংখ্যক ঘটনা সংগ্রহ এবং একত্রিত করেছি। সেসব ঘটনা থেকে কিছু ফলাফল চয়ন করেছি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যে কোনো কালিমা নেই। তিনি এখনো চৌদ্দশ' বছর আগের মতোই শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। তাঁর জীবন চরিত্রের পুষ্পস্তবক এখনো চৌদ্দশ' বছর আগের মতোই সতেজ ও সুগন্ধিময়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও আলোর সেই মিনার থেকে আলোর বিকিরণ ঘটছে। হেদায়াতের এই ঝর্ণাধারা থেকে এখনো দুনিয়ার পিপাসার্তরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে।

মানুষ নমুনা এবং উদাহরণ দেখতে চায়। আমি এই মহামানবের জীবন থেকে কিছু নমুনা এবং কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছি। এসব উদাহরণ দেখেও যারা তা থেকে উপকার লাভে সক্ষম হবে না, তাদের উচিত নিজের ভাগ্যের ওপর ক্রন্দন করা। প্রাচীন কালের একজন বিশিষ্ট মনীষী বলেছেন, কোরআনের কোনো উদাহরণ বর্ণনার পর আমি তা বোঝার চেষ্ট করি। বুঝতে অপারগ হলে কান্না আসে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্যে দেই কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝে।' (সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৩)

রসূল (স.) বলেছেন, যদি তোমরা দেখো যে, কেউ আবু বকর এবং ওমরের সমালোচনা করছে তবে জেনে নেবে যে, সেই ব্যক্তি ইসলামের শত্রু। প্রকৃতপক্ষে সে ইসলামেরই নিন্দা সমালোচনা করছে। এই হাদীসের বর্ণনাতেই আমি এই অধ্যায় শেষ করে দিচ্ছি। হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা রসূল (স.) উল্লেখ করেছেন। এমন মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে আত্মোৎসর্গে আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। এতে আমরা ইহকালে ও পরকালে সাফল্য অর্জন করতে এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবো।

কোরআনে করীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারাতো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্যে সৎপথ অবলম্বন করবে, আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের ধ্বংসের জন্যে; এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫)

আইয়ামে জাহেলিয়াতেও ওমর (রা.) তাঁর সাহসিকতা, বীরত্ব, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে সমগ্র সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রসূল (স.)-এর এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, খিয়ারুকুম ফিল জাহেলিয়াতে ওয়া খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম।' অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে জাহেলী যুগে যারা উৎকৃষ্ট ছিলো ইসলামী যুগেও তারা উত্তম হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, ইসলামকে বুঝতে হবে। হযরত ওমর (রা.) ইসলামকে ঠিক সে রকমই বুঝতেন যে রকম বোঝা উচিত।

হযরত ওমর (রা.)–ইসলাম গ্রহণের আগে

২

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের আগে

হযরত ওমর (রা.)-এর বংশ পরিচয়, নসবনামা লিখে আমি নিজের সময় নষ্ট করতে চাই না, পাঠকদেরও সেই বিষয়ে পুরনো তথ্য অবগত করাতে চাই না। হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব এমন বিশাল, তার মর্যাদা এতো উঁচু যে, শুধুমাত্র ওমর বলাই তার পরিচয়ের জন্যে যথেষ্ট। তার জন্মের আগে এবং পরে বহু ওমর অতিবাহিত হয়েছেন কিন্তু কেউ যদি বলে যে, ওমর বলেছেন অথবা ওমর করেছেন তাহলে প্রত্যেক শ্রোতাই বুঝে নেবে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। অন্য কারো চিন্তা মনে আসার প্রশ্নই আসে না। সাধারণত মানুষ নিজের বংশমর্যাদা, ছদ্মনাম কুনিয়াত বা উপাধির মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেন, কিন্তু হযরত ওমরের ব্যক্তিত্ব এতো উঁচু ছিলো, মর্যাদা এতো ব্যাপক ছিলো যে, তিনি ছিলেন এসব স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির বাইরে।

আইয়ামে জাহেলিয়াতেও ওমর (রা.) তাঁর সাহসিকতা, বীরত্ব, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে সমগ্র সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রসূল (স.)-এর এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, খিয়ারুকুম ফিল জাহেলিয়াতে ওয়া খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম।' অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে জাহেলী যুগে যারা উৎকৃষ্ট ছিলো, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, ইসলামকে বুঝতে হবে। হযরত ওমর (রা.) ইসলামকে ঠিক সে রকমই বুঝতেন যে রকম বোঝা উচিত। ইসলাম গ্রহণের আগেও হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত তেজী স্বভাবের এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য অটুট ছিলো। তবে ইসলাম তার মধ্যে নমনীয়তা এবং বিনয় সৃষ্টি করেছিলো। এই বিনয়, নম্রতা এবং নির্বিলাস জীবন যাপনের অভ্যাস খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আরো বেড়ে গিয়েছিলো। তার পৌরুষ, বীরত্ব এবং সাহসিকতা এমন ছিলো যে, হিজরতের সফর তিনি গোপনভাবে করেননি বরং মদীনায় রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি প্রকাশ্যে মদীনা যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। মক্কার একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে তিনি কোরায়শ নেতাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, ওহে ইসলামের শত্রুরা, তোমরা শুনে রাখো ওমর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করছে। কেউ যদি তার মাকে কাঁদাতে চায়, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সন্তানদের এতিম করতে চায়, তবে সে যেন সামনের ওই প্রান্তরে এসে আমার সাথে মোকাবেলা করে। মক্কার কোনো বাপের বেটা ওমর (রা.)-এর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস করেনি।

সাইয়্যেদেনা হযরত ওমর (রা.) ছিলেন লম্বা চওড়া মযবুত দেহের একজন সুদর্শন পুরুষ। তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল ঝরে গিয়েছিলো। গয়ের রং ছিলো উজ্জ্বল ফর্সা। মানুষের মধ্যে তিনি পায়ে হেঁটে চলার সময়েও মনে হতো তিনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে আসছেন। তাঁর সম্পর্কে পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমার পিতা ছিলেন লাল সাদা মিশ্রণের মযবুত দেহের একজন মানুষ। তিনি যেসব বিয়ে করেছিলেন তার উদ্দেশ্য জৈবিক কামনা ছিলো না বরং

বিয়ের মাধ্যমে তিনি সন্তান কামনা করতেন। উভয় হাতে তাঁর একই রকম শক্তি ছিলো। সেই শক্তি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতেন। তাকে দেখেই মনে হতো তিনি দশজনের মধ্যে একজন।

কোরায়শদের দূত

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন কোরায়শদের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি ওসব নেতার মতো ছিলেন না যারা অর্থহীন আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুকে, অশ্লীল বিনোদনে সময় নষ্ট করতো। তিনি ওসব নেতার মতো প্রবৃত্তির দাসত্বে অশালীন আনন্দে বিভোর থাকতেন না। যৌবনের উত্তাল সময়ও তিনি অর্থহীন কাজে ব্যয় করেননি। তিনি সে সময় উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর স্বভাব নিকৃষ্ট কাজে সায় দিতো না। তিনি অত্যন্ত বাকপটু এবং আবেগপ্রবণ ছিলেন। শারীরিক শক্তিও ছিলো তাঁর অসামান্য। কোরায়শ বংশের লোকেরা তাদের মধ্যকার একজন আদর্শ যুবকের মধ্যে যেসব গুণ বৈশিষ্ট্য দেখতে আগ্রহী ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে তার সবই বিদ্যমান ছিলো। তার বহুমুখী গুণাবলী এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য তাকে ভাই বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করেছিলো। তার গোত্র তাঁকে এক বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছিলো।

কোরায়শ গোত্রের দূতের দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.) পালন করতেন। কোরায়শের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যদি গৃহযুদ্ধ বেধে যেতো অথবা অন্য কোনো গোত্রের সাথে কোরায়শদের যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির উপক্রম হতো, তাহলে আপোসমীমাংসা এবং দূতিয়ালীর দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.) পালন করতেন। দূতিয়ালী ছিলো একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। হযরত ওমর (রা.) যৌবন কালেই এই দায়িত্ব লাভ করেন। ত্রিশ বছরেরও কম বয়সে হযরত ওমর (রা.) কোরায়শদের দূত নিযুক্ত হন। এ ধরনের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে কমবয়স্ক কোরায়শী নেতা।

কোরায়শরা সম্মানিত এবং অভিজাত গোত্র ছিলো। ভাষা সাহিত্যে বাগ্মিতায় তারা ছিলো অতুলনীয়। কোনো বিষয়ে নিজ গোত্রের গৌরবগাঁথা বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দিলে, প্রতিপক্ষের দোষত্রুটি, নিন্দা, সমালোচনা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করতে হলে কোরায়শরা তাদের মনোনীত দূত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর শরণাপন্ন হতো। যুক্তিতর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় বাগ্মিতায় কোরায়শরা এমনিতে সমগ্র আরবে ছিলো বিখ্যাত। তাদের মধ্যে দূতিয়ালীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব ছিলো প্রকৃতই সম্মানজনক এবং প্রশংসনীয়।

কোরায়শরা ছিলো আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাষাবিদ। তাদের উচ্চারিত এবং ব্যবহৃত ভাষাতেই কোরআন নাযিল হয়েছিলো। কোরায়শদের ভাষার মাধুর্য এবং লালিত্য ছিলো সর্বজনবিদিত। এ রকম অভিজাত গোত্রের যিনি মনোনীত প্রতিনিধি এবং দূত হন তার পান্ডিত্য এবং বাগ্মিতাগুণ নিঃসন্দেহে সর্বজন সমর্থিত। এ ধরনের পদে হযরত ওমর (রা.)-এর মনোনয়ন ছিলো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। কোরায়শদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) ছাড়াও বহু ভাষাবিদ পন্ডিত বাগ্মি ছিলো কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের গৌরব দূতিয়ালীর মর্যাদা হযরত ওমর (রা.) পেয়েছিলেন। আরবের বিভিন্ন গ্রোত্রের মধ্যে নিজ নিজ বংশধারার আভিজাত্য ও গৌরব বর্ণনায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধও হতো। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গোত্রীয় প্রতিনিধিকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই সমাজে এর চেয়ে বড় সম্মান, এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারতো? এই পদে মর্যাদা, সম্মান, শান-শওকত সবই ছিলো। বলাবাহুল্য, এসব কিছু হযরত ওমর (রা.) পরিপূর্ণভাবেই পেয়েছিলেন।

পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় ব্যবসায়ী

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল আবেগপ্রবণ স্বভাবের মানুষ। কর্মজীবনে তিনি যখন প্রবেশ করেছিলেন সেই সময় এসব গুণাবলী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। কোরায়শদের

মধ্যে অধিকাংশ লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলো। হযরত ওমর (রা.) নিজেও ব্যবসায়ী ছিলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন বস্ত্র ব্যবসায়ী। বিশেষত তিনি রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন কা'ব ইবনে আদী আত্তানুখি।

পেশা নির্বাচনে মানুষের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করায় হযরত ওমরের রুচির পরিচ্ছন্নতার পরিচয় মেলে। রেশমী কাপড় ছিলো সবচেয়ে মিহি সুন্দর এবং দামী। জান্নাতীদের পোশাক রেশমী হবে বলে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। কোরআনে তিনি বলেন, জান্নাতে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

যৌবনকালে রেশমী পোশাকের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর পরবর্তী জীবনের পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা। মক্কায় সব ধরনের ব্যবসা বাণিজের প্রচলন ছিলো। হযরত ওমর (রা.) ইচ্ছা করলে যে কোনো ধরনের ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি সূক্ষ্ম, মিহি, সুন্দর এবং দামী কাপড়ের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, কখনো লোকসানের শিকার না হওয়ার মতো ব্যবসা। হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যবসায়ে কোনো প্রকার লোকসানের আশংকা থাকতো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-কে ইসলাম গ্রহণের আগেই লোকসান না হওয়া ব্যবসার জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। ইসলামের পথের পথিক হওয়ার পরও হযরত ওমর (রা.)-এর যাবতীয় কার্যক্রম ছিলো সূক্ষ্ম কৌশল, উদার দৃষ্টি, পরিচ্ছন্নপ্রিয়তার পরিচায়ক। ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের কাজে লোকসানবিহীন ব্যবসায়ে হযরত ওমর (রা.) ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেন। ইসলামকে হযরত ওমর (রা.) উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। ইসলামের ব্যবসায়ে হযরত ওমর (রা.) এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে, অন্য কোনো জিনিসের চিন্তাও তার মনে আসেনি।

হযরত ওমর (রা.) ছাড়াও বহু কোরায়শ নেতা ব্যবসা করতেন। যেমন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.) গোশত বিক্রি এবং লোহার কাজ করতেন। আরবে কোনো কাজেই কেউ লজ্জা সংকোচ করতো না। সব পেশাই ছিলো সম্মানের। অন্য কোনো পেশার প্রতি অবজ্ঞা অশ্রদ্ধার কারণে নয় বরং নিজের স্বভাবজাত পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা সূক্ষ্ম রুচি এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তার কারণেই তিনি রেশমী পোশাকের ব্যবসা বেছে নিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে হযরত ওমর (রা.) তলোয়ার তৈরি এবং শান দেয়ার কাজ করতেন। এটা ছিলো তাঁর রূঢ় কঠোর স্বভাবের প্রতীক। পরবর্তীকালে তিনি কোমলতর জিনিস রেশমী কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর চরিত্রের কঠোরতা-কোমলতা ইসলাম গ্রহণের আগেই তার কর্মে প্রতিফলিত হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন ও কর্ম আল্লাহ তায়ালাই নির্ধারণ করে থাকেন। মানুষ সেসব চিন্তাও করতে পারে না। মানব জীবনের কর্মধারার পূর্বনির্ধারিত প্রতিফলনের রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যা কিছু করেন সে সম্পর্কে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করার অধিকার রাখে না।' কিন্তু মানুষকে নিজের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।'

সত্যের পথে দৃঢ়তা

হযরত ওমর (রা.)-এর অনুভূতিপ্রবণ স্বভাব, অসম সাহসিকতা, পৌরুষ, আইয়ামে জাহেলিয়াতে ছিলো কিংবদন্তীতুল্য। ইসলাম গ্রহণের পরও তার এসব গুণাবলী অটুট ছিলো। ইসলাম তার গুণাবলীকে মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পরই হযরত ওমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, চুপিসারে এবং গোপনে গোপনে ইসলামের কাজ করার দরকার নেই। আমি নিজের ইসলাম প্রচারের কথা জোর গলায় সবাইকে জানিয়ে দেবো। সত্যের

অনুসারীদের কাছে সাহসিকতা আত্মসম্মান ও পৌরুষের নিদর্শন। এসব গুণবৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি কারো তোয়াক্কা না করে হক-এর সাহায্যে বুক টান করে দাঁড়িয়েছিলেন। সত্য যদি কারো কাছে প্রকাশ হয়ে যায় এবং তিনি সেই সত্য মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন তবে কোনো প্রকার কষ্ট, নির্যাতন তাকে টলাতে পারে না। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার যদি হারিয়ে যায়, শারীরিক নির্যাতন শুরু হয় এমনকি জীবন যদি বিপন্ন হয়ে ওঠে তবে জীবন উৎসর্গ করার জন্যেও সত্যের সৈনিক প্রস্তুত থাকেন। সত্যের পথে এই অবিচল দৃঢ়তা পুণ্যের বিচারে অনেক বড়। এ কাজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রসূল (স.)-এর নিম্নোক্ত দুটি হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

রসূল (র) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যের কালেমা উচ্চারণ এবং মিথ্যা প্রতিরোধের জন্যে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং নিজের প্রচেষ্টায় হক-এর সাহায্যের জন্যে কাজ করে সেই ব্যক্তির এই কাজ আমার সঙ্গে হিজরত করার চেয়ে বেশী উত্তম বিবেচিত হবে।

রসূল (স.) আরো বলেন, ইসলামের পথে কারো এক ঘন্টার কষ্ট সহ্য করা এবং দৃঢ়পদ থাকা তার ৪০ বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন বলেন, হে লোক সকল, তোমরা বন্দেগী করো সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যেসব মানুষ অতিবাহিত হয়েছে তাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। এতেই তোমরা পরিত্রাণ পেতে পারো। তিনিই তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা, আসমানকে ছাদরূপে তৈরি করেছেন। আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে সব ধরনের ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্যে রেযেকের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা যখন এসব জানো তখন অন্য কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না।

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে আদেশ দিয়েছেন তারা যেন চারদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। যে ব্যক্তি নিজের এবাদাতকে ভালোভাবে চিনেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে সে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার আপন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি মাখলূকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জীবন যাপন করে, মাখলূকের কাছে থেকে সে কিছু পাওয়ার আশাও করে না, মাখলূককে লাভ-ক্ষতির মালিক বলেও মনে করে না। সে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে এটাও বিশ্বাস করে যে, মাখলূকের ভালোমন্দ করার কোনোই পথ নেই। কাজেই একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি মানুষের ভয়ের কারণে হক এর সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ্র সাথে শরীক করার মতো পাপ করেছে। এ ধরনের কাজ তার দ্বীনী বিশ্বাসের জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেবে।

মোমেনের অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহ্র ওপর ভরসা

বিপদের আশংকা স্বভাবতই মানব মনে ভয়ের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ অজ্ঞাত বিপদের আশংকা এবং পরিণামের চিন্তায় ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু মোমেন বান্দা এ ধরনের ভয় পায় না। তারা নিজেদের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্র ওপর ভরসা রেখে কাঙ্খিত লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার তাদের বন্ধুহীন ফেলে রাখেন না। তিনি তাদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন। সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে সম্পর্কই হচ্ছে মোমেন বান্দার প্রধান অস্ত্র। তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসার কারণে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথনির্দেশ লাভ করা যায়।

সত্য-মিথ্যা বা হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। এ ধরনের দ্বন্দ্ব দেখে আমরা যেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করি। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হাত পা নড়াচড়া করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। ঢেউয়ের সামনে আত্মসমর্পণ করা পৌরুষের প্রমাণ হতে পারে না। আল্লাহ্র পথে রয়েছে চেষ্টা সাধনা এবং সংগ্রাম। এটা বড়ই সৌভাগ্যের কাজ। আমাদের ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারিত রয়েছে তা থেকে মুক্তির উপায় নেই। মৃত্যুতো সময় মতোই আসবে। অবশ্যই আসবে। বীর পুরুষের মতো মৃত্যুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে জান কোরবান করে দেয়া নতজানু

হয়ে জীবন ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। ধৈর্য এবং সত্যবাদিতার সাথে যারা জেহাদ করে তাদেরকে মিথ্যা আস্ফালন কাবু করতে পারে না।

ইতিহাসের সত্য আমাদের কাছে এই সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, আল্লাহ্‌র নামে রসূল (স.)-এর পদাংক অনুসরণ করে পথ চলতে গিয়ে দ্বীনের দাঈরা যেসব সাফল্য অর্জন করেছেন তার পেছনে রয়েছে এমন লোকদের আত্মত্যাগ, যারা ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির কথা চিন্তাই করেনি। তারা যার প্রতি ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসই করেছে। মানুষের কাছে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দাওয়াত দিয়েছে এবং চেষ্টা চালিয়েছে।

প্রাচীন কালের পুণ্যবান সালফে সালেহীনের জীবনের ইতিহাস পাঠ করলে আমাদের ঈমান তাজা হয়ে যায়। তারা দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ স্বীকার করতেন, পরীক্ষার যাঁতাকলে পিষ্ট হতেন, কিন্তু কখনোই কোনো অভিযোগ করতেন না। নম্র নতশিরে তারা সকল বিপদ সহ্য করতেন এবং সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে, দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে তারা সকল প্রকার পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার এবং পরীক্ষা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তারা সত্যকে ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অসীম সাহসিকতা

রসূল মোহাম্মদ (স.) এর পর মক্কার কাফেরদের সামনে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। কোরআনের বাণী শোনার পর কাফেরদের গায়ে যেন আগুন ধরে গিয়েছিলো। তারা একযোগে আব্দুল্লাহর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং এলোপাতাড়ি প্রহারে তাকে রক্তাক্ত করে ফেললো। চেহারা জখমি করে রক্তাক্ত করলো। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। সে অবস্থায় ঘরে ফিরে গেলে সবাই বললো, আমরা আগেই আশংকা করেছিলাম যে, ওরা তোমাকে এমনিতে ছেড়ে দেবে না। আমাদের আশংকাই সত্য হলো। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ওই বিধর্মীরা আমার চোখে আজ অধিক মূল্যহীন। আগামীকাল আবার আমি আল্লাহ্‌র ওই দুশমনদের সামনে কোরআন পাঠ করবো। কিন্তু সাহাবারা নিষেধ করলেন। বললেন তুমি তাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার সেই বাণী পেশ করেছো যা তাদের অত্যন্ত অপছন্দের।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সঠিক কথাই বলেছিলেন। সত্য অস্বীকারকারীদের সামনে কোরআনের শাশ্বত বাণী পাঠ করা তাদের গায়ে জ্বালা ধরায়। সত্যের সৈনিক যখন তার ঈমানী চেতনায় অবিচল থাকেন তখন বিধর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু অত্যাচারীদের সামনে সত্যের সৈনিকের ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা তাদের পরাজয় প্রমাণ করে। এতে তাদের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায়। সত্যের সৈনিকদের দুর্বল অবস্থান সত্ত্বেও তাদের ঈমানের তেজ দেখে শক্তি মদমত্ত কাফেররা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কারণ শত রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও তারা সত্য দ্বীনের আলো নির্বাপণ করতে সক্ষম হয় না।

দ্বীনের দায়ী, সত্য প্রচারকদের মন মযবুত দুর্গের মতো। সেই দুর্গ তারা ঈমানের শক্তি দিয়ে হেফাযত করেন। মিথ্যার এবং বাতিলের অনুসারীদের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের উপকরণ প্রমাণ করে না যে, তারা সফলকাম। বরং দ্বীনের শক্তির মোকাবেলায় তাদের শক্তি-সামর্থ, ধনৈশ্বর্য তুচ্ছ অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ সত্যের সৈনিকদের দ্বীনের দাঈদের বুকের ভেতর থেকে ঈমানের আলো নির্বাপণে সক্ষম হলেই তারা নিজেদেরকে সফল বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু সেটাতো কখনো সম্ভব হয় না। তাদের যন্ত্রণা এবং মানসিক অশান্তির কারণ এটাই যে, সত্যের সৈনিকদের ওপর যতো বেশী যুলুম-নির্যাতন করা হয় ততোই তারা আরো অটল-অবিচল, আস্থায় অধিকতর বলীয়ান এবং সাহসী হয়ে ওঠে। ফলে মিথ্যার অনুসারী নিকৃষ্ট মানুষরা মোমেনদের ও সত্যের দুর্গের কোনো কিছুই করতে পারে না।

ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর উজ্জ্বল ঈমান

ওসমান ইবনে মাজউন (রা.) ইসলাম গ্রহণের পরও ওলীদ ইবনে মুগীরার নিরাপত্তায় ছিলেন। কিন্তু মক্কায় রসূল (স.) এবং সাহাবাদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। মনে মনে বললেন, একজন পৌত্তলিকের অধীনে নিরাপদ শান্তিতে অবস্থান আমার জন্যে দুঃখজনক। অথচ আমার সঙ্গীরা পৌত্তলিকদের অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন।

হযরত ওসমান (রা.) ওলীদের কাছে গেলেন এবং ধন্যবাদের সাথে তাকে দেয়া নিরাপত্তার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন। ওলীদের নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর একজন পৌত্তলিক অকারণে হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-কে চপেটাঘাত করলো এবং ঝগড়া বাধিয়ে দিল। সেই আঘাত এমনভাবে করা হয়েছিলো যে, হযরত ওসমানের একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। তার এ অবস্থায় একজন সাহাবী বললেন, ওহে ওসমান তুমি ক্ষমতাদর্পী ওলীদের নিরাপত্তায় ছিলে। বড় শান্তিতে ছিলে অথচ সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছো। যদি প্রত্যাখ্যান না করতে তবে আজ তোমাকে একটি চোখ হারাতে হতো না। হযরত ওসমান বললেন, আল্লাহ্র পানাহ অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং সম্মানজনক। আমার যে চোখে দৃষ্টি আছে সেই চোখের চেয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ বেশী মূল্যবান। রসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনে আমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। কঠিন পরীক্ষাকালীন সময়ে হযরত ওসমানকে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে পুনরায় নিরাপত্তা হেফাযতে থাকার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে অবিচল থাকার কথা জানিয়ে দেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজেও ওসমানের কাছে এসে এই প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি এতটুকু নমনীয় হলেন না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কারো আশ্রয়ের আমার দরকার নেই।

সুললিত কণ্ঠের বহু ওয়ায়েয এমন রয়েছেন যারা বক্তৃতার ফুলঝুরিতে আবেগের খই ফোটান। বহু কবি সাহিত্যিক ভাষার কারুকাজে উচ্চাঙ্গের জযবাসমৃদ্ধ লেখা লিখে পাঠকদের চমকে দেন। কিন্তু তাদের কারো ভেতরে কি ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর মতো ঈমানের নূর পাওয়া যাবে? বহু বড় বক্তা এবং বহু বড় লেখককে আমরা দেখেছি কঠিন পরীক্ষার সময়ে তাদের পা নড়বড়ে হয়ে যায়। তাদের ঈমানের শক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। যালেমদের চোখে চোখ রাখার সাহস তারা হারিয়ে ফেলেন। হয়তো যালেমদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করেন অথবা তাদের সাথে আপোসের ব্যবস্থা করেন। তারপর মুর্দার মত হয়ে নামকাওয়াস্তে ঈমান রক্ষার দাবী করেন। এ ধরনের আপোস প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের শক্তি বৃদ্ধির একটা প্রক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। কঠিন পরীক্ষার সময়ে বাগপটু বক্তা এবং কবিদের দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্র প্রেমে পাগলপাড়া

হযরত আবু ফকিহা (রা.) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি মক্কার বিশিষ্ট সরদার উমাইয়া ইবনে খালফের ক্রীতদাস ছিলেন। আবু ফকিহা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মালিক ভীষণ নাখোশ হয়। দুর্বৃত্ত স্বভাব মালিক উমাইয়া আবু ফকিহা (রা.)-কে নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। আবু ফকিহার দুই পা দড়িতে বেঁধে মক্কার উঁচু-নীচু জমিতে টেনে নেয়া হতো। এতে হযরত আবু ফকিহার সারা দেহ রক্তাক্ত হয়ে যেতো। এরপর মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে শুইয়ে বুকে ভারি পাথর চাপা দেয়া হতো। হযরত আবু ফকিহার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো। উমাইয়া ইবনে খালফের ভাই উবাই ইবনে খালফ ছিলো ইসলামের শত্রুতায় উমাইয়ার চেয়েও ভয়ংকর। সে তার ভাইকে বলতো আরো বেশী অত্যাচার করো। তার ওপর এতো বেশী নির্যাতন, এতো বেশী অত্যাচার করা হতো যে, হযরত আবু ফকিহা বেহুঁশ হয়ে যেতেন। মাঝে

মাঝে শত্রুরা মনে করতো আবু ফকিহা হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একজন বিশিষ্ট সাহ-াবা হযরত আবু ফকিহাকে ক্রয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত করে দেন। আবু ফকিহার নাম ছিলো ইয়াসার।

ইসলামে যারা দীক্ষা গ্রহণ করতো তাদের মনে মগজে ইসলামের ছাপ পড়ে যেতো। এই ঈমান এতো মযবুত ছিলো যে, তারা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও অটল অবিচল থাকতেন। মোমেন বান্দার জন্যে এই ঈমানই হচ্ছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং ঢালস্বরূপ। সত্যের পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিপদ-মুসিবত আসা এবং পরীক্ষা আসা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা ঈমানের নিদর্শন। আবু ফাতেমা লাইসী বলেন, আমি রসূল (র)-এর কাছে বসে ছিলাম। রসূল (স.) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এটা চায় যে, সব সময় সুস্থ থাকবে কখনো অসুস্থ হবে না? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমরা সবাই চাই হে আল্লাহর রসূল! রসূল (স.) বললেন, তোমরা কি চাও যে, ভবঘুরে গাধার মতো ঘুরে বেড়াবে? আমরা বললাম, জ্বী না হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমরা তা চাই না। রসূল (স.) বললেন, তোমরা কি পরীক্ষায় পড়তে চাও না? সেই পরীক্ষা তোমাদের পাপের কাফ্‌ফারা হোক তা কি চাওনা? আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষা মোমেন বান্দার ইযযত ও সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কোনো নেক আমলের দ্বারা মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করা যায় না, আল্লাহ তায়ালা বিপদ মুসিবতের মধ্যে ফেলে বান্দাকে সেই মর্যাদা ও সম্মান দান করেন।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রসূল (স.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা লাগানো হবে, সদকা খয়রাত যারা করবে তাদের দানের বিনিময়ে পুরস্কার দেয়া হবে। নামায, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি নেক কাজের বিনিময় দেয়া হবে। এরপর আল্লাহ্‌র পথে বিপদ সহ্যকারীদের পালা আসবে। তাদের জন্যে দাঁড়িপাল্লা লাগানোর আগেই তাদের নেক আমল ওযন হয়ে যাবে। তাদেরকে বে-হিসাব বিনিময় দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পারিশ্রমিক বিনা হিসেবে দেয়া হবে।' (সূরা আঝ ঝুমার, আয়াত ১০)

দুনিয়ার জীবনে বিপদে-মুসিবতে বিপন্ন ও অসহায় বান্দারা কেয়ামতের দিন বে-হিসাব পুরস্কার পেতে থাকবেন। এই দৃশ্য দেখে দুনিয়ার জীবনে আরাম-আয়েশে বসবাসকারীরা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, আহা দুনিয়ার জীবনে আমার দেহ যদি কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো, তবে আজ আমি অনেক বেশী পুরস্কার লাভ করতাম, অনেক বেশী মর্যাদা স্থায়ীভাবে লাভ করতাম।

হযরত বেলাল (রা.)-এর সত্যনিষ্ঠা

ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম দিকে যেসব ভাগ্যবান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা নিঃসন্দেহে পরকালে স্থায়ী পুরস্কার লাভের উপযুক্ততা অর্জন করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের কারণে চরম নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে তারা হযরত বেলাল (রা.)-কে ইসলাম থেকে ফেরাতে চেয়েছিলো। কিন্তু বিধর্মী কাফেরদের সকল আশা হযরত বেলাল (রা.) ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি শুধু আহাদ আহাদ, উচ্চারণ করছিলেন। তিনি এতো নির্যাতন সত্ত্বেও বলতেন, ওদের কাছে যদি ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড় কোনো নির্যাতন থাকে তবুও আমি সেই অত্যাচারের সামনে আহাদ, আহাদ শব্দ উচ্চারণ করবো।

হুযুর (স.) এর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের দৃঢ়তা এবং মযবুতী অর্জন করেছিলেন। সাহাবাদের আমল ছিলো তাদের ঈমানের প্রতিচ্ছবি। ঈমানের পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী বলে তারা মনে-

প্রাণে বিশ্বাস করতেন। রসূল (র) বলেছেন, ঈমানের পরীক্ষা হয় তার দ্বীনী মর্যাদা অনুযায়ী। ঈমানের দিক থেকে কেউ বেশী দৃঢ়তা অর্জন করলে তার পরীক্ষাও কঠিনতর হয়।

ইয়ামামার যুদ্ধে জেরার ইবনে আজোয়ার প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। তার পায়ের গোড়ালি শত্রুরা কেটে ফেলেছিলো। তবুও তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হননি। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শত্রুরা তাকে ঘোড়ার পায়ের নীচে ফেলে মাড়িয়ে হত্যা করে। কিন্তু মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি সাহস হারাননি, অস্ত্রও সমর্পণ করেননি।

ছেলা ইবনে আশিয়াম আল আদবী এক যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলেন। তার পুত্রও সঙ্গে ছিলো। পুত্রকে তিনি বললেন, হে বৎস, সামনে অগ্রসর হও, শত্রুর সাথে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লড়াই করো। তুমি যদি শাহাদাত বরণ করো তবে তুমি সফলকাম হবে, আর আমিও পুরস্কার পাবো। পিতার কথা শোনার পর পুত্র বীরত্বের সাথে শত্রুর সাথে লড়াই করতে করতে এক সময় শাহাদাত বরণ করলো।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের দায়িত্ব যারা পালন করেছিলেন তাদের ঈমানের পরিচয় ছিলো এ রকম। তারা যে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ঈমান এনেছিলেন সেই ঈমানের দাবী তারা যথাযথভাবে পূর্ণ করেন। সততা ও আন্তরিকতার সাথে তারা সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঈমানের দাবী পূরণে অটল অবিচল ছিলেন। তারা ভালোভাবেই জানতেন, সত্যের ওপর অটল অবিচল থাকা এবং মিথ্যার প্রতিরোধে জীবন উৎসর্গ করা সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। যারা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ তারা কখনো দুর্বলতার পরিচয় দেয় না, অবমাননা বরদাশত করে না। ইযযতের বিনিময়ে যিল্লত ক্রয় করে না। ফলে তারা সম্মান অর্জন করেছিলেন এবং দ্বীনের পথে সানন্দে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মসআব ইবনে যোবায়ের আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের বাহিনীর মোকাবেলা করছিলেন। হঠাত রবিয়া গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে মসআবের সংগ ত্যাগ করে চলে যায়। এ অবস্থা দেখে মসআব বলেছিলেন প্রতিটি মানুষই এক সময় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্‌র শপথ, সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করা অসম্মানের সামনে আত্মসমর্পণ করে অবমাননাকর জীবন যাপনের চেয়ে হাজার গুণ বেশী উত্তম।

তাগুতি অত্যাচারী শক্তি মোমেন বান্দার মন থেকে ঈমানের আলো নির্বাপিত করার আশায় অত্যাচার নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায়। এখান থেকেই আল্লাহ্‌র শত্রু বিদ্রোহী পৌত্তলিকদের সাথে ঈমানদারদের শক্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। এ ধরনের সংঘাত বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে ইসলামের সৈনিকদের দৃঢ়তার অর্থ হচ্ছে শত্রুর মোকাবেলায় তারা বিজয় অর্জন করেছে। মিথ্যা ও বাতিল শক্তির হাতে যদি তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয় তবুও তাদের বিজয় অবধারিত। তারাতো ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় সফলকাম। হঠকারী তাগুতি শক্তি তাদের পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য অস্ত্রশস্ত্র শত্রুতার যাবতীয় উপকরণ প্রয়োগ করেও ঈমানদারদের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার সামনে আপনা আপনি মরে যায়। অত্যাচারীরা মনে মনে ভাবে যে, তাদের কাছে অস্ত্রও আছে, সম্পদও আছে। এ কারণে তারা কিছুতেই পরাজিত হবে না, কিন্তু তাদের এ খামখেয়ালী চিন্তা নিমিষে কর্পূরের মতো উবে যায়। তারা নিজেদের ক্ষতবিক্ষত বিবেকের জখম জিহ্বা দিয়ে চাটতে থাকে।

হযরত যোবায়ের (রা.)-এর ঈমান

সত্যের সৈনিকদেরকে চাবুক দিয়ে যেমন দাবিয়ে রাখা যায় না, তেমনি কোটি কোটি টাকা দিয়ে খরিদও করা যায় না। দৃশ্যত যদিও তারা দুর্বল থাকে, কিন্তু নিজেদের ইমানের দৃঢ়তার কারণে শক্তিশালী এবং বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তাগুতি শক্তি অবিচল আস্থাবান ঈমানদারদের ওপর অকল্পনীয় অত্যাচারের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সত্যপ্রেমীরা কখনোই পরাজয় স্বীকার করেন না। ইসলামের ইতিহাসে ফাঁসীতে প্রথম মৃত্যুদন্ড দেয়া

হয়েছিলো হযরত যোবায়েব ইবনে আদী (রা.)-কে। সেই কঠিন সময়ে আপন বিশ্বাসে বলীয়ান মর্দে মোজাহেদ মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন-

শক্রুর অত্যাচার নির্যাতনের সামনে
চিৎকার করবো না আমি
প্রকাশ করবো না ভীরুতা
আমি তো যাচ্ছি আমার
মালিকের সামনে হাযিরা দিতে।
ইসলামের জন্যে শক্রুদের হাতে
কোরবান করছি প্রাণ
মৃত্যুর পর কোনো পাশে পড়ে যাবো
সেকথা মোটেই ভাবি না
আমার এই ত্যাগ আল্লাহর জন্যে
আমার এ পরীক্ষা আল্লাহর পথে
আমার কর্তিত দেহে বরকত দেবেন
আল্লাহ তায়ালা যদি চান।

ইসলামের এই মহান শহীদ শক্রুদের পরিকল্পনা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে প্রাণ কোরবান করেন, কিন্তু তিনি শক্রুদের সামনে মাথা নত করেন নি। সত্যিকার মোমেন সত্যের পথ ছেড়ে কখনো তাগুতের সাথে সমঝোতা করেন না। কি দৃঢ় ঈমান। কি অতুলনীয় ধৈর্যশীলতা!

শাহাদাতের প্রেরণা

আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সত্তার ওপর ভরসা ঈমানদারদের ফানাফিল্লাহর স্তরে নিয়ে যায়। দ্বীনের স্বার্থে সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাচীনকালের মুসলমানরা বিপদাশংকার মধ্যে দ্বিধাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেন। হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েবের এক চোখ কানা হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনি দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তবুও জেহাদের জন্যে রওয়ানা হলেন। কেউ একজন তাঁকে বললো, জনাব আপনিতো অসুস্থ এ কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে মা'যুর আপনার জেহাদে না যাওয়াই অনুমোদিত। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তায়ালা জেহাদে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আমরা সুখে বা দুঃখে, অসুস্থ থাকি বা সুস্থ, যুবক থাকি বা বৃদ্ধ, অবসর থাকি বা ব্যস্ত। যদি আমি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করি সেটা হবে সৌভাগ্য, আর যদি ফিরে আসি তবে দুনিয়ার কাজ কর্মের চিন্তা করবো, স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করবো।

রসূলে আকরাম (স.) বদরের যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হওয়ার সময়ে ছোট বালকদেরকে সেনাদল থেকে ফিরিয়ে দিলেন। আমর ইবনে আবু ওয়াক্কাসের বয়স ছিলো ষোল বছর। তাকে ফিরে যেতে বলা হলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তার জোরালো আবেদনের পর অবশেষে তাকে জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো। বদরের যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং শহীদ হন। একজন আনসার যুবককে রসূল (স.) জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমিত দিলে সামুরা ইবনে যুন্দবও অনুমতি চান। তিনি ছিলেন বেঁটে এবং বয়সে ছোট। এ কারণে রসূল (স.) তাকে অনুমতি দিলেন না। হযরত সামুরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুককে অনুমতি দিলেন অথচ কুস্তি তে তাকে আমি হারিয়ে দিতে পারি। রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে, তবে কুস্তি লড়ে দেখাও। উভয়ের মধ্যে কুস্তি হলো। সামুরা তার সাথীকে চিৎপাত করে ফেললেন। এরপর তাকেও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো।

বীরত্ব, সাহসিকতা ও বাহাদুরির এসব উদাহরণ শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। মহিলারাও এ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আজ আমরা তাদেরকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) যৌবনেও ছিলেন ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত। বার্ধক্যের সময়েও তার ঈমান এবং সাহসিকতার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো। তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) মক্কায় কাবা ঘরের হেফাযতের জন্যে সিরীয় সৈন্যদের মোকাবেলায় অটল অবিচল ছিলেন। অবস্থা যখন নাজুক পর্যায়ে পৌঁছলো তখন তিনি তার মহীয়সী মায়ের কাছে পরামর্শের জন্যে হাযির হলেন। মা বললেন, বৎস, শত্রুদের অবমাননাকর কোনো শর্ত কিছুতেই গ্রহণ করবে না। মরণকে কিসের ভয়? আল্লাহর শপথ, আত্মমর্যাদা এবং সম্মান বজায় থাকা অবস্থায় শত্রুর তলোয়ারের আঘাত সহ্য করা এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন উৎসর্গ করা অসম্মানজনক শর্তে শত্রুর হাতে চাবুকের আঘাত সহ্য করার চেয়ে অনেক মূল্যবান, অনেক উত্তম।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) পুত্র আব্দুল্লাহর ঈমানের ঘাটতি পড়ে যাওয়ার কারণে তাকে পরামর্শ দেন যে, ঈমান কখনো মোমেনকে দুর্বল হতে দেয় না। হযরত আসমা শুধু পুত্রকে কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার পুত্র ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে উত্তম আদর্শ পেশ করুক, উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। সত্যের সৈনিকরা ভবিষ্যতে যেন এই উদাহরণ থেকে অনুপ্রেরণা লাভে সক্ষম হয়। অসম্মান এবং অবমাননা যে জীবনের অবধারিত অংশ হয়ে পড়ে সেই জীবনের কোনো মূল্য আছে কি? যে বিশ্বাস শুধু অধঃপাতে নিয়ে যায়, যে বিশ্বাস অসম্মান অবমাননার কারণ হয়ে দেখা দেয়, সেই বিশ্বাসের কি মূল্য আছে? রসূল (স.) বলেছেন, সাবধান। তোমাদের মধ্যেকার কেউ যেন মানুষের ভয়ে সত্য উচ্চারণ থেকে বিরত না হয়। কারণ কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় যে, তোমাকে নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। ঠিক তেমনি নির্ধারিত রেযেক প্রাপ্তি থেকে তোমাকে বঞ্চিত করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যের কালেমা উচ্চারণ করতে থাকো এবং মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করতে থাকো।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ

এসব বিষয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ স্বীকার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল মোমেনদের দায়িত্ব হচ্ছে নাফরমান এবং ফাসেকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করা। এতে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াতের ধারা অব্যাহত থাকবে। রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে। প্রয়োজনবোধে পাপী লোকদের হাত ধরে তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তাতে না হলে তাদেরকে সত্যের পথের অনুসারী করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করবে। অন্যথা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরকে পাথরের মতো করে দেবেন এবং তোমাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করবেন, যেভাবে বনি ইসরাইলীদের অভিশপ্ত করেছিলেন।

রসূল (স.) আরো বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বল্পসংখ্যক মানুষের মন্দ কাজের পরিণামে সাধারণ মানুষদের শাস্তি দেন না। কিন্তু মানুষের মধ্যে পাপ অন্যায় যখন সার্বজনীন হয়ে ওঠে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পাপ অন্যায় প্রতিরোধে অগ্রসর হয় না তখন ঢালাওভাবে সকলের ওপর আযাব নাযিলের আদেশ দেয়া হয়। কাজেই মুসলমানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনের উন্নতির জন্যে কাজ করতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সকলের সামনে প্রকাশ্যে সেকথা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই ঘোষণার মাধ্যমে আরো কোনো ভাগ্যবান হয়তো কিছুটা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে। পৌরুষ এবং সাহসিকতা তাকে এ মর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যে, নিজের গ্রহণ করা বিশ্বাসের কথা গোপন না রেখে প্রকাশ করতে হবে। হযরত ওমর (রা.)

ছিলেন সুপরিচিত সাহসিকতাসম্পন্ন বীর পুরুষ। তিনি সুস্পষ্টভাবে খোলাখুলি সব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে কারো শত্রুতাকে পরোয়া করতেন না।

কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অত্যাচার নির্যাতনের কথা চিন্তা করলেই শংকিত হয়ে ওঠে। এটা কি সত্য নয়? কিছু মানুষ দ্বীনের দাওয়াতের পরিণামের ভয়ে মরার আগেই মরে যায়? যে জাতি একবার ভীতিকবলিত হয়েছে এবং কাপুরুষতার পথের অনুসারী হয়েছে, তাদের ওপর চেপে বসেছে দীর্ঘমেয়াদী অবমাননা এবং লাঞ্ছনা। পক্ষান্তরে দ্বীনের সহায়তার কারণে কোনো জাতির লোকেরা যদি অত্যাচার নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, সত্য থেকে বিমুখ না হয় তবে তাদের জীবন অবশ্যই মর্যাদা এবং সম্মানের জীবনে পরিণত হবে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিপদ মুসিবত দেখে যারা ভয়ে কাঁপতে শুরু করবে তারা শুকনো ঘাসের মতো গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। কেউ যদি আল্লাহর দ্বীনের আওয়ায বুলন্দ করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে পড়ে তবে আল্লাহ তায়ালা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং বিজয় ও সফলতা তার ভাগ্য লিখনে পরিণত করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে অবমাননা এবং পরাজয়ের মুখে ফেলে দেন।

বর্তমান বিশ্বে সকল কুফুরী শক্তি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। মুসলমান পরিচয়ে পরিচিত একদল লোকও ইসলাম বিরোধীদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি সাহসিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসি এবং যে কোনো প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকি তবে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করতে পারবো। আমরা ইহকাল এবং পরকালে লাভবান হবো। আল্লাহর পথে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করা হলে এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা হলে আল্লাহ তায়ালা বিরাট রকমের নেয়ামত দান করবেন। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী। এ কাজের জন্যে আমাদেরকে আল্লাহর নামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসা এবং এখলাছের পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মোত্তাকীরা ব্যতীত। হে আমার বান্দারা আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াত বিশ্বাস করেছিলে এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ (করো)। সোনার থালা এবং পানপাত্র নিয়ে তাদের প্রদক্ষিণ করা হবে। সেখানে রয়েছে (এমন) সবকিছু যা অন্তর চায় এবং যাতে চোখ তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। সেথায় তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।' (সূরা যোখরুফ, আয়াত ৬৭-৭৩)

রসূল (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে শেষ যামানায় এমন কিছু ভাগ্যবান মানুষ থাকবে যারা 'ছাবেকুনাল আউয়ালুন' অর্থাৎ পূর্ববর্তীকালের প্রথম পর্যায়ের লোকদের মতো বিরাট সম্মান অর্জন করে ধন্য হবে। এসব লোক মন্দ কাজ প্রতিরোধ এবং ফেতনা সৃষ্টিকারীদের সাথে লড়াইয়ের বিনিময়ে এরূপ সম্মান লাভ করবে। এটাতো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে মুসলামানরা যদি সমগ্র দুনিয়াকেও নারায বা অসন্তুষ্ট করে তবুও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এত নেয়ামত দেবেন যা তারা ভাবতেও পারবে না। যে পথের পথিক হয়ে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বিরাট পুরস্কার অর্জন করেছিলেন সেই পথের পথিক হয়ে আমরা কি সে রকম পুরস্কার অর্জন করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। তবে প্রয়োজন শুধু আমাদের ইচ্ছা ও দৃঢ়সংকল্পের এবং যেসব মুসলমানের ওপর যেসব আমল অবশ্য কর্তব্য, সেসব আমল করার ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অলসতা না করা।

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা বলার মতো নয়। এই অবস্থার পরিবর্তন সেইসব লোকের দ্বারা সম্ভব নয় যারা শুধু কথায় ইসলামের আদর্শের ব্যাপারে সোচ্চার, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে অনেক দূরে। আমার এ কথা শুনে আপনারা অবাক হবেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখুনতো ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধানের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পরও নিশ্চিন্তে সেসব বিধানকে যারা উপেক্ষা করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর নিয়মিত বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করে উভয়ের মধ্যে কতো পার্থক্য বিদ্যমান। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা এমনভাবে আমল করে যেন তারা আল্লাহকে সচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। যদি সে রকম অবস্থা মনে তৈরি না হয় তবে অন্তত এটা ঠিকই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের দেখছেন।

হাসান বসরীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আবুল হাসান আপনি কি মোমেন? জবাবে তিনি বললেন, ঈমান দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যদি তুমি প্রচলিত নিয়মের ঈমানের কথা জিজ্ঞেস করো তবে আমি মোমেন। যেমন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর রসূলদের প্রতি, কেতাবসমূহের প্রতি, আখেরাতের প্রতি, জান্নাত জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। তবে তুমি যদি সেই ঈমানের কথা বলে থাকো, যে ঈমানের কথা আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি জানি না আমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত কিনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মোমেনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মোমেন। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্যে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। এটা এরূপ যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ মোমেনদের একদল এটা (তখন) পছন্দ করেনি।' (সূরা আনফাল, আয়াত ২-৫)

হযরত ওমর (রা.) ফারূক উপাধি পেলেন

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে বহু নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তাদের মধ্যে দুর্বল লোকও ছিলেন, শক্তিমানও ছিলেন, কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যাপার ছিলো ভিন্নরকম। রসূল (স.) সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর রসূল (স.)-এর কাছে এ মর্মে আবেদন জানালেন যে, আমি কা'বাঘরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই। রসূল (স.) দারে আরকামে কারো ভয়ে আত্মগোপন করেননি। তিনি তো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে এবং মোমেনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় তিনি নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। মোমেনদের ওপর এমন কোনো বিপদ আসবে যেটা তারা সহ্য করতে পারবে না এমন যেন না হয়। এ কারণেই রসূল (স.) নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব শুনে রসূল (স.) খুশী হলেন। তিনি সাহাবাদের সংগে নিয়ে দুই সারিতে কাবাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। এক সারির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত হামযা (রা.), অন্য সারির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। কোরায়শ কাফেররা এই দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে অবলোকন করলো। এর আগে তারা এ ধরনের দৃশ্য আর দেখেনি। সেদিনই রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-কে ফারূক উপাধি দেন। এর অর্থ হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

ওমর ফারূক (রা.)-এর অন্তরে সত্যের আলোক শিখা

ইসলাম গ্রহণের আগে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন। মুসলমানদের ওপর তিনি নির্যাতন করতেন। কিন্তু ইসলামের শত্রু হলেও অমুসলিম অবস্থায়ও

হযরত ওমর (রা.)-এর অন্তরে সত্যের আলোকশিখা বিদ্যমান ছিলো। সেই আলোকশিখা মাঝে মাঝে কিরণ ছড়াচ্ছিলো।

লায়লা বিনতে আবু হামনা এবং তার স্বামী আমের ইবনে রবিয়া (রা.) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। লায়লা বলেন, মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারী কাফেরদের মধ্যে ওমর ছিলেন শীর্ষে। আমরা যখন হাবশায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সফরের পাথেয় বাঁধাছাদা করছিলাম এমন সময় হযরত ওমর (রা.) আমার কাছে এলেন। আমার স্বামী আমের ইবনে রবিয়া বাইরে গিয়েছিলেন। শিশু আব্দুল্লাহ বাইরে খেলছিলো। ওমর জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কোথায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছো আব্দুল্লাহর মা? আমি বললাম, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম গ্রহণের কারণে তোমরা মক্কায় আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছো, কিন্তু আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়। আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ছাহেবাকুমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সঙ্গী হোন। একথা বলে ওমর (রা.) চলে গেলেন। আমার স্বামী আমের ইবনে রবিয়া ঘরে ফেরার পথে তাকে আমি একথা জানালাম। তিনি বললেন, আশা রাখো, ওমর ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

এখানে আমরা একজন মহিলার সাহসিকতার পরিচয় পাচ্ছি। তিনি জনতেন যে, ওমর ইসলামের কট্টর দুশমন, তবুও নির্ভীক চিত্তে তিনি তার সামনে নিজেদের হিজরতের গোপন কথা প্রকাশ করে দিলেন। দ্বিতীয় একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ওমর (রা.) ইচ্ছা করলে লায়লার স্বীকারোক্তির পর তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু এখানে তিনি পুরুষোচিত ভূমিকার পরিচয় দিলেন। একজন মহিলাকে কোনো পুরুষের নির্যাতন করা কোনোক্রমেই ভদ্রতা এবং শালীনতার পরিচায়ক নয়, ওমর এটা প্রমাণ করলেন। হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত দম্পতির পথরোধের চেষ্টা না করে ওমর (রা.) তাদের প্রতি সমর্থন জানালেন। সত্যের আলোয় তার মনের অন্ধকার তখন দূর হতে শুরু করেছে।

এখানে হযরত লায়লার স্পষ্টবাদিতা এবং সাহসিকতার প্রশংসা করতে হয়। ওমরের প্রতিক্রিয়া কতো মারাত্মক হতে পারে একথা চিন্তা না করেই তিনি হিজরতের কথা অকপটে ওমরের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আরো একটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য। হযরত আমের ইবনে রবিয়া (রা.) তার ঈমানের আলোয় এটা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ওমর যতোই উদ্ধত এবং ইসলাম বিদ্বেষী হোন না কেন তার আশু পরিবর্তন হয়েও যেতে পারে। ইমানীদৃষ্টিতে আমের ইবনে রবিয়া (রা.) ওমরের অন্তরে ইসলামের আলোর শিখা লক্ষ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে আমের ইবনে রবিয়া (রা.)-এর এই আশাবাদ সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। একরোখা জেদী উদ্ধত ওমরের মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো। ওমর (রা.) ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নেকী সত্ত্বেও তিনি পরবর্তীকালে আল্লাহর আযাবকে বড় বেশী ভয় করতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং তার আমল ছিলো ইসলামের এক মহান সাফল্য। আমরা পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও আল্লাহর আযাব সম্পর্কে গাফেল রয়েছি। হযরত ওমর (রা.) আখেরাতের ভয়ে কাঁপতেন। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতো। প্রায়ই বলতেন, পাপ পুণ্য সমান হয়ে যদি কোনোরকমে ক্ষমা পেয়ে যাই তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।

সত্যের পথে অভিযাত্রা

লজ্জাশরম মৌলিকভাবে কল্যাণকর বিষয়। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) স্বভাবগতভাবে ভীষণ লাজুক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগেও তার লজ্জাশীলতার পরিচয় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তার এ লজ্জাশরম সোনায় সোহাগা হয়েছিলো। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একবার হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সেই জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হামযার ইসলাম গ্রহণের তিনদিন পর আমি ঘর

থেকে বের হলাম। পরে একজন মাখজুমীর সাথে দেখা। সেই মাখজুমী বাপ দাদার ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি নাকি বাপদাদার ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছো? মাখজুমী বললো, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তাতে কী হয়েছে? তুমি আগে নিজের ঘরের খবর লও। তোমার বোন ফাতেমা এবং তোমার ভগ্নিপতি সাঈদও ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। এটা আমার জানা ছিলো না। কথাটা শোনার পর ভীষণ রাগ হলো, দুঃখ হলো। আমি সোজা বোনের বাড়ী গেলাম। দরোজায় করাঘাত করলাম। ভেতর থেকে গুনগুন শব্দ ভেসে আসছিলো। দরোজা খোলার পর জিজ্ঞেস করলাম কিসের শব্দ পাচ্ছিলাম। আমার বোন বললো, কই কিসের আওয়ায আসবে? কিছুই না। আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। বোন এবং ভগ্নিপতিকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেললাম। হঠাৎ আমার বোন আমার মাথার চুল ধরে বললো, শোনো, আমরা মুসলমান হয়েছি, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। আমরা জীবন দেব কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করবো না। বোন ভগ্নীপতিকে প্রহারের কারণে প্রবাহিত রক্ত এবং বোনের এ রকম দৃঢ়সংকল্প দেখে আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম। মনে মনে ভাব-লাম এটা আমি কী করলাম?

হযরত ওমর (রা.)-এর পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় স্বভাব, পবিত্র পরিচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনা, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের কারণে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের আগেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছিলো যেসব ঘটনা থেকে হযরত ওমর (রা.)-এর পরিচ্ছন্ন রুচি প্রকৃতি এবং তার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের আগে একদিন আমি রসূল (স.) এর সাথে গোস্তাখি করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রসূল (স.) প্রথমে সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। এরপর সূরা আল হাক্কা পাঠ করতে শুরু করলেন। কোরআনের সুললিত মাধুর্যমন্ডিত বাণী, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, ভাবের গভীরতা এবং লালিত্য আমার অন্তরকে দ্রবীভূত করে ফেললো। আমি মনে মনে বললাম, কোরায়শদের কথাই ঠিক। এই ব্যক্তি একজন বড় কবি। মনে মনে আমি একথা বলার সাথে সাথে রসূল (স.) পাঠ করলেন, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সম্মানিত রসূল (স.)-এর উপর অবতীর্ণ, বাণী কোনো কবির কথা নয়। তোমরা স্বল্পই ঈমান আনো। আমি মনে মনে বললাম, কবির কথা যদি না হয় হবে নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি জাদুকর, একথা একজন জ্যোতিষীর। রসূল (স.) সাথে সাথে পাঠ করলেন, এটা কোনো জাদুকরের কথা নয়, জ্যোতিষীর কথা নয়, তোমরা কমই চিন্তাভাবনা করে থাকো। রসূল (স.) সমগ্র সুরার সবগুলো আয়াত পাঠ করেন। আমি রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভেতরে যেন কম্পন শুরু হলো। আমার সে সময়ের অনুভূতি ছিলো বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই ইসলামের মযবুত আওয়ায আমার মনের দ্বার খুলে দিয়েছিলো। অন্তরের গভীর প্রদেশে আমি ইসলামের গুঞ্জন শুনতে পেয়েছিলাম।

নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে যিলহজ্ব মাসে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিলো ২৬ বছর। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে ৪০ থেকে ৪৫ জন নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় রসূল (স.) এবং সাহাবারা আরকাম ইবনে আবু আরকাম সাহাবীর ঘরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে রসূল (স.) সাহাবাদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট ঘটনা। তার ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলমানরা কাবাঘরে নামায আদায় করতে পারতেন না। কারণ মুসলমানদের প্রতি কোরায়শদের শত্রুতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস কারো হয়নি। মুসলমানরা কাবাঘরে নামায আদায় করতে শুরু করলেন। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ়পদ করে দেবেন।

মুসলিম শাসকদের উচিত তারা যেন নিজেদের আশেপাশে দায়িত্বশীল, সৎ, বিশ্বস্ত লোকদেরই একত্রিত করেন। কেননা এরাই হচ্ছে সেই শাসকের উপদেষ্টা। এদের পরামর্শেই সেই শাসক সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার সুযোগ পাবেন। এ ব্যাপারে রসূল (স.) আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) তার শাসনকালে বিশ্বস্ত, সৎ এবং যোগ্য লোকদেরকেই বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) ও তার সাথী

৩

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত ওমর (রা.) ও তার সাথী

জনগণের সমস্যা সমাধান এবং জনগণের শান্তি ও কল্যাণের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত হয় তারা সমকালের লোকদের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। সমকালের লোকেরাও সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা মতামত রাখেন এবং সে অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেন। দায়িত্বশীল ব্যক্তির দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতার সাথে তার যে সব সঙ্গী-সাথী অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থাকে ঘনিষ্ঠ এবং অকৃত্রিম। দায়িত্বশীল সরকারের সাফল্য এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তার উপদেষ্টারা সর্বাধিক ভূমিকা রাখেন। এ কারণে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাকিদ দিয়েছেন ঈমানদাররা যেন সব সময় মন্দ লোকদের সাহচর্য ত্যাগ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৮)

কাজেই মুসলিম শাসকদের উচিত তারা যেন নিজেদের আশেপাশে দায়িত্বশীল, সৎ, বিশ্বস্ত লোকদেরই একত্রিত করেন। কেননা এরাই হচ্ছে সেই শাসকের উপদেষ্টা। এদের পরামর্শেই সেই শাসক সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার সুযোগ পাবেন। এ ব্যাপারে রসূল (স.) আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) তার শাসনকালে বিশ্বস্ত, সৎ এবং যোগ্য লোকদেরকেই বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

শাসকদের সামনে হক কথা উচ্চারণ করা

সৎ, বিশ্বস্ত এবং দ্বীনদার উপদেষ্টাদের উদাহরণ লক্ষ্য করুন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম তাউস একদিন হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের দরবারে এলেন। তিনি বাদশাহকে নসিহত প্রসঙ্গে বললেন, খোদাভীতির পথ অবলম্বন করুন এবং আযানের দিনকে ভয় করুন। হিশাম জিজ্ঞেস করলেন আযানের দিন কবে? ইমাম তাউস বললেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, 'অতপর উভয় দলের মধ্যে একজন আযান দিয়ে ঘোষণা করবে যে, অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত।' একথা শোনামাত্র হিশাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাউস বললেন, সেদিনের বিবরণ শুনেই আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন হে বাদশাহ। সেদিনের দৃশ্য যখন দেখবেন তখন আপনার কি অবস্থা হবে?

যিয়াদ ইবনে আবিহ ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা। মানুষ তাকে ভয় করতো। তার অত্যাচারের বিবরণ ছিলো মানুষের মুখে মুখে। রবী ইবনে যিয়াদ ইবনে রবী আলহাবেসী এই অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলার উদ্দেশ্যে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। যিয়াদকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখার জন্যে রবী তার কাছে খোলাখুলি একটার পর একটা চিঠি লিখতেন। যিয়াদের কোনো মন্দ কাজে রবী কখনো সমর্থন দেননি।

এ ধরনের সৎ, বিশ্বস্ত, খোদাভীরু উপদেষ্টা সাধারণ মানুষকেই শুধু অত্যাচার থেকে রক্ষা করে না, বরং শাসকদেরও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। হযরত ওমর (রা.)-এর উপদেষ্টারা ছিলেন

রসূল (স.) এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবী। তারা হযরত ওমরকে (রা.) ও তার সঙ্গীদেরকে শরীয়তের মানদন্ডে যাচাই করতেন। এই মানদন্ড এমন নির্ভুল এবং সঠিক ছিলো যে, কারো ইচ্ছা অনিচ্ছায় সেই মানদন্ড ওঠানামা করতো না।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে রসূল মোহাম্মদ (স.)

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে বহু কিছুই বলা হয়েছে। রসূল (স.) এ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, নিঃসন্দেহে সেসব হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে সর্বাধিক সত্য এবং নির্ভুল। রসূল (স.) আবু বকর এবং ওমরকে (রা.) একদিন একত্রে আসতে দেখে বললেন, এরা দুজন জান্নাতবাসীদের সকল শ্রেণীর নেতৃত্ব দেবেন। আম্বিয়ায়ে কেরামরা ছাড়া সকল যুবক বৃদ্ধ পূর্বাপর জান্নাতীর নেতৃত্বে এরা থাকবেন। মাশাআল্লাহ কতো বড়ো সম্মান, কতো বিরাট সৌভাগ্য। এই দুই ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কে এতোবড় মর্যাদা পেতে পারে? তাদের সমপর্যায়ে আর কে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে? হাদীসে রসূল (স.) গাভী এবং নেকড়ে বাঘের কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সাহাবারা এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। রসূল (স.) বললেন, আমি একথা বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, ওমর একথা বিশ্বাস করে। এবার ভেবে দেখুন আবু বকর এবং ওমরের মর্যাদা কতো বেশী। ওমরের অতিরিক্ত মর্যাদা রসূল (স.)-এর এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে ওমরের সন্তুষ্টি আল্লাহ তায়ালার রহমত।

একবার ওমর (রা.) রসূল (স.)-এর হুজরায় প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি চান। রসূল (স.) অনুমতি দিয়ে বললেন, হে আমার প্রিয় ভাই, নিজের নেক দোয়ার মধ্যে আমাদেরও শামিল রেখো। আমাদের ভুলে যেয়ো না।

রসূল (স.) নিজে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে দোয়া চাচ্ছেন। রসূল (স.) হযরত ওমরকে (রা.) নিজের স্নেহমমতা এবং করুণায় সফলকাম করে দিয়েছেন। কি বিস্ময়কর ঈর্ষণীয় সাফল্য! স্বয়ং আল্লাহর নবী দোয়া চাচ্ছেন এবং বলছেন যে, আমাদের ভুলে যেয়ো না। হে ওমর কতো উচ্চ আপনার শান, কতো উন্নত আপনার মর্যাদা। ওমর (রা.) ছিলেন রসূল পাকের (স.) বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। এ মর্যাদাই ওমর (রা.)-এর জন্যে যথেষ্ট ছিলো। 'আসাদুল গাবা' নামক গ্রন্থে সংকলিত রসূল (স.)-এর একটি ভবিষ্যত বাণীতে তিনি বলেন, আমার পরে তোমরা কিছু নতুন কাজ করবে। সেসব কাজের মধ্যে ওমরের কাজ হবে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

রসূল আকরাম (র) আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। রসূল (স.)-এর কাছে এই দু'জনের মতো উচ্চ মর্যাদা অন্য কারো ছিলো না। রসূল (স.) আবু বকর এবং ওমর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, তারা দু'জন আমার দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি। অর্থাৎ আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) আমার চোখ এবং কানের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন যে, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে সে হতো ওমর (রা.)। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে এতো বড় সম্মান অন্য কোনো উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। রসূল (স.) আবু বকর এবং ওমর সম্পর্কে বলেছেন, সেই আল্লাহ তায়ালার জন্যে সকল প্রশংসা যিনি তোমাদের দু'জনের দ্বারা আমাকে সহায়তা করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন রসূল (স.) বলেছেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার সামনে কয়েকজন লোককে হাযির করা হলো। সকলের পরিধানে ছিলো কামিজ। কারো কামিজ ছিলো বুক পর্যন্ত, কারো তার চেয়ে ছোট। এরপর ওমর (রা.) এলো। তার কামিজ ছিলো এতো লম্বা যে মাটি হেঁচড়ে যাচ্ছিল। সাহাবারা বললেন, হে রসূলুল্লাহ (স.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? রসূল (স.) বললেন, দ্বীন। রসূল (স.) জান্নাতের প্রসংগ আলোচনা করলেন। হযরত ওমর (রা.)-কে জান্নাতী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী বলে সুসংবাদ দিলেন। রসূল (স.) বলেন, জান্নাতীদের

মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী থাকবে। কিছু সংখ্যক জান্নাতী অন্য জান্নাতীদের প্রতি তাকালে তাদের মনে হবে তারা উর্ধাকাশে নক্ষত্র দেখছে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূল (স.) উচ্চ মর্যাদা কি আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্যে নির্দিষ্ট করা থাকবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ওসব উঁচু উঁচু মহল নবীরা এবং সেই সব মোখলেস ঈমানদারদের জন্যে হবে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রসূলদের সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। এই হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বোখারী ও মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেই অংশে রসূল (স.) বলেছেন, বে-শক আবু বকর এবং ওমর সেই আলীশান মহলের জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন রসূল (স.) বলেছেন, আমি স্বপ্নের ভেতর নিজেকে একটি কূয়ার তীরে দেখতে পেলাম। কূয়ার তীরে একটি পানি তোলার বালতি ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি কয়েক বালতি পানি তুললাম। এরপর ইবনে আবু কোহাফা কয়েক বালতি পানি তুললেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার পানি তোলার ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এরপর সেই পানি তোলার জন্যে ওমর বালতি হাতে নিলেন। আমি তার মতো পানি তুলতে অন্য কাউকে দেখিনি। তিনি এতো বেশী পানি তুললেন যে, তার তোলা পানিতে উট জানোয়ার সব তৃপ্ত হয়ে গেলো।

সাহাবারা রসূল (স.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা নবুয়তের আমলের পর খেলাফতে রাশেদার আমল দ্বারা করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে বহু ফেতনা দেখা দেয় এবং ইসলাম দৃশ্যতঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। হযরত আবু বকর (রা.) সকল ফেতনা সমূলে উৎপাটন করেন। তবে তার খেলাফতকাল ছিলো সংক্ষিপ্ত। এরপর এলো হযরত ওমর (রা.)-এর যুগ সেই যুগ ছিলো ইসলামের বিজয়, শক্তি ও মর্যাদার সোনালী অধ্যায়।

রসূল (স.) বলেছেন, হে ওমর! যে পথে তুমি কোথাও যাও যদি সেই পথে শয়তান সামনের দিক থেকে আসতে থাকে তবে সে তোমার ভয়ে পথ ছেড়ে দূরে চলে যায়। রসূল (স.) বলেছেন, ওমর (রা.)-কে সকল প্রকার সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন। হে ওমর! আপনার এতো উচ্চ মর্যাদা, উন্নত অবস্থান এবং অনুপম গৌরবের কারণে আপনাকে জানাই মোবারকবাদ।

ওমর (রা.) সম্পর্কে প্রথম খলীফার অভিমত

নবীদের পরে সকল মানুষের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে তার অভিমত কথায়, কাজে এবং লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নিজের জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর (রা.) কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চাচ্ছিলেন। জীবনের শেষ রোগ শয্যায় তিনি হযরত ওমরকে (রা.) তার পরে খলীফা মনোনীত করে ওসীয়ত লেখান। হযরত ওমর (রা.)-এর রূঢ় আচরণ এবং কঠোর নীতির কারণে কয়েকজন সাহাবা এ মনোনয়নের স্পষ্ট বিরোধিতা করেন। তারা ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে খলীফাতুর রসূল হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে শেকায়েত করেন। তারা বলেন, আপনি নিজের জীবদ্দশায় আপনার পরে হযরত ওমরকে (রা.) আমাদের খলীফা মনোনীত করেন। আপনি শীঘ্রই আল্লাহর কাছে যাবেন, সেখানে আপনি কি জবাব দেবেন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি যখন আমার প্রতিপালক মাওলার দরবারে যাবো তখন বলবো, 'হে আল্লাহ তায়ালা! আমি তোমার মাখলূকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভালো মানুষকে খলীফা মনোনীত করেছি।'

এই সাক্ষ্যে হযরত আবু বকর (রা.)। বিশ্বজগতে সকল আল্লাহপ্রেমীদের মধ্যে হযরত ওমরকে (রা.) শ্রেষ্ঠতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এমন একজন পরীক্ষিত মর্দে মোমেন ছিলেন যিনি ন্যায় ও সত্যের মোকাবেলায় মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের

মোকাবেলায় কোনো ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার কথা কখনো চিন্তাই করেননি। তার সাক্ষ্য ছিলো সততা ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবু বকর (রা.)-এর বিবেচনায় ওমর (রা.) ঈমানী শক্তি, চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং উন্নত ব্যক্তিত্বের কারণে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.) তার কাছে এলেন। ঘরের বাইরে বহুসংখ্যক সাহাবা সমবেত ছিলেন। তারা খলীফার কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি ভালো করেই ওমর (রা.)-এর কঠোর স্বভাবের কথা জানেন। জেনে শুনেও আপনি তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করলেন? আপনার এই মনোনয়নের বৈধতা কতটুকু? হযরত আবু বকর (রা.) এসব কথা শুনে বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। আবু বকর (রা.) খুবই দুর্বল এবং কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তাকে বসিয়ে দেয়া হলো। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় দেখাচ্ছো? তোমাদের ওপর আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করেছি সে যদি তাকওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারকে নিজের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে তবে সন্দেহাতীতভাবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তো বলি হে আল্লাহ তায়ালা! আমি আপনার মাখলুকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষটিকে খলীফা মনোনীত করেছি। বাইরে সমবেত লোকদের কাছে আমার একথাগুলো পৌঁছে দাও।

এসব কথা বলার পর আবু বকর (রা.) দুর্বলতার কারণে শুয়ে পড়লেন। এরপর হযরত ওসমান (রা.)-কে ভেতরে আসতে বললেন। হযরত ওসমান (রা) আসার পর বললেন লেখো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। পরম করুণাময় ও অতীব দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা এই চুক্তিনামা লেখাচ্ছেন। আখেরাতের জীবনের দ্বার আবু বকর (রা.)-এর সামনে শীঘ্রই খোলা হবে। জীবনের এই শেষ সময়ে এসে মানুষ ঈমানের প্রতি ঝুঁকে যায়। পাপী বান্দা নেক কাজের ইচ্ছা করে। মিথ্যাবাদী সত্যকথা বলতে শুরু করে। মুসলিম মিল্লাতের জন্যে আমি আমার পরে ওমরকে খলীফা মনোনীত করেছি। কাজেই তোমরা ওমর (রা.)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে। আমি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন তোমাদের কল্যাণ এবং নিজের কল্যাণের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ওমর (রা.) যদি ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করে তবে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, প্রতিটি মানুষকে তার নিজের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। আমি কল্যাণ এবং মঙ্গলের চেষ্টা করেছি। অদৃশ্যের খবর আমি জানি না। গায়েবী এলেম আমার নেই। অত্যাচারীরা তাদের পরিণাম শীঘ্রই জানতে পারবে। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।'

এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই ওসীয়তনামা একখানি খামে ভরে মুখ বন্ধ করলেন। খাম হাতে নিয়ে ওসমানকে সঙ্গে করে ঘরের বাইরে এলেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এবং উসায়েদ ইবনে কারজি (রা.) এ সময় আমীরুল মোমেনীন আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, এই খামে যার নাম রয়েছে তোমরা কি তার বাইয়াত করার জন্যে প্রস্তুত? সবাই বললেন, হ্যাঁ আমরা প্রস্তুত। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমরা জানি এই খামে হযরত ওমর (রা.)-এর নাম রয়েছে, আমরা এতে সন্তুষ্ট। সমবেত সাহাব-ারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানালেন এবং বাইয়াতের অংগীকার করলেন।

এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে একান্তে ডেকে নিয়ে নসিহত করলেন। নসিহত শেষে ওমর সহ বাইরে এসে দোয়ার জন্যে হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ

তায়ালা! আমি এ সিদ্ধান্ত দ্বারা উম্মতের কল্যাণ এবং মঙ্গল কামনা করেছি। আমার এই প্রচেষ্টার কারণ হচ্ছে আমি আশংকা করছি এই উম্মতের ওপর কোনো ফেতনা বা পরীক্ষা এসে না পড়ে। আমি সদুদ্দেশ্যে যে ফয়সালা করেছি হে আল্লাহ তায়ালা! আমার উদ্দেশ্য তোমার জানা আছে। আমি সততার সাথে এজতেহাদ করেছি। এরপর আমি এমন ব্যক্তিকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছি যিনি উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ভলো মানুষ, শক্তিশালী মানুষ। তিনি উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে সকলের চেয়ে বেশী চিন্তিত এবং লালায়িত।

হে আমার মালিক! তুমি তো জানো, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। জীবন প্রদীপ নিভু নিভু। আমার চলে যাওয়ার পর হে আল্লাহ তায়ালা! উম্মতে মোহাম্মদীর নেগাহবান এবং হেফাযতকারী তো তুমিই। উম্মতে মোহাম্মদী তো তোমারই বান্দা। তাদের ভাগ্যলিখন তোমার হাতে ন্যস্ত। হে আল্লাহ তায়ালা! উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে তাদের শাসনকর্তাকে নেককার এবং পুণ্যবান করে দাও। আমার উত্তরাধিকারীকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শামিল করে নাও। তিনি অর্থাৎ ওমর (রা.) রহমতে আলম রসূল (স.) এবং পুণ্যবান বান্দাদের অনুসারী।

ইবনে ইয়াসারের বর্ণনায় রয়েছে, যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসুখ বেড়ে যাওয়ার পর তিনি ঘরের ছাদে গিয়ে লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে লোকসকল আমি একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছি, তোমরা কি তার ওপর সন্তুষ্ট এবং ঐক্যবদ্ধ? সবাই সমবেত কণ্ঠে বললো, হে খলীফাতুর রসূল আমরা একমত এবং সন্তুষ্ট। হযরত আলী (রা.) বললেন, আপনি যদি হযরত ওমর (রা.)-এর পক্ষে ফয়সালা দিয়ে থাকেন তবে আমরা রাযী এবং সন্তুষ্ট।

এই বিশ্লেষণের পর হযরত ওমর (রা.)-এর নাম খোলাখুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। গোপনে, প্রকাশ্যে, মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে মোটকথা সকল প্রকারে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। সমালোচনাকারীদের জবাবও এই চুক্তিপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত গভীর এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ। হযরত আবু বকর (রা.) তার মহান উত্তরাধিকারী সম্পর্কে শুধু অভিমতই ব্যক্ত করেননি বরং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এই মানুষেরা একে অন্যকে কতো বেশী শ্রদ্ধা করতেন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে আমরা যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই কোনো দেশেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে ওরকম ঈর্ষণীয় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। খলীফা তার উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও একজন অতি সাধারণ মানুষকেও তার অধিকার থেকে কোনো অবস্থাতেই বঞ্চিত করতেন না। ঠিক তেমনি একজন সাধারণ নাগরিককে পর্যন্ত খলীফার যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখা হেতো না। সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা এবং সাহসিকতার সাথে খলীফার কাছে প্রশ্ন করতেন। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতের কল্যাণ এবং মঙ্গল। এর মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা উন্নত করাই ছিলো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সত্যতো মৌলিকভাবে সত্য। পরিস্থিতির পরিবর্তনে সত্য ন্যায়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। সত্যের নীতি ও আদর্শ মযবুত এবং অপরিবর্তনীয়। কেউ প্রকাশ করুক বা না করুক সত্যের সত্য হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। সত্য কারো মান্য করার কারণে সত্য হয় না বরং সত্য মৌলিকভাবেই সত্য, কেউ তাকে মান্য করুক অথবা অস্বীকার করুক। সত্য প্রকাশ করা এ কারণে জরুরী নয় যে, সত্য গোপন থাকলে সত্যের কোনো ক্ষতি হবে বরং জনকল্যাণের স্বার্থেই সত্য প্রকাশ পাওয়া দরকার। মানব ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমরকে (রা.) যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে যোগ্য আসনে

বসিয়েছিলেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, অথচ হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকরের কোনো আত্মীয় ছিলেন না। তারাই সত্যকে চিনেছিলেন এবং সত্য অনুযায়ী আমল করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকালে আকরা ইবনে হারেছ এবং উয়াইনা ইবনে হাছান খলীফাতুর রসূল (স.)-এর কাছে এসে নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করলেন। তারা বললেন, অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে তাদের অবস্থা খুব খারাপ। তারা দারুণ পেরেশানির মধ্যে রয়েছে। তারা কিছু সরকারী খাস জমির জন্যে আবেদন জানালেন। আবেদন অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) তাদের ফরমান লিখে দিলেন। উপস্থিত সাহাবাদের সেই ফরমানে সাক্ষ্য হিসেবে দস্ত খত রাখা হলো। সে সময় হযরত ওমর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আকরা ইবনে হারেছ এবং উয়াইনা ইবনে হাছান জমির দলিলে হযরত ওমর (রা.)-এর স্বাক্ষর নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আসার পর সাক্ষীর স্বাক্ষরের জন্যে দুটি দলীলই তার সামনে দেয়া হলো। তিনি দলীল দুটি পাঠ করে সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেললেন। এতে উভয় সাহাবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে নালিশ করলেন। তারা বললেন দেশের খলীফা আপনি, নাকি ওমর ইবনে খাত্তাব?

হযরত ওমর (রা.) খলীফার দরবারে পৌঁছার পর এ বিষয়ে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হলো। ওমর বললেন, রসূল (র)-এর সময়ে ইসলাম যখন দুর্বল ছিলো তখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মন জয় করার জন্যে তিনি কিছু কিছু দান করেছেন। বর্তমানে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। তোমরা ইচ্ছে হলে ইসলামের সাথে থাকো অথবা না থাকো। সেটা তোমাদের ব্যাপার। খাস জমির মালিক সকল মুসলমান। সেই মালিকানা থেকে তোমাদেরকে কিসের ভিত্তিতে দান হিসেবে দেয়া হবে?

খলীফার সামনে হযরত ওমর (রা.) এই ব্যাখ্যা দিলেন। ওমর (রা.)-এর যুক্তি এবং বক্তব্য ছিলো সত্যের অধিক নিকটবর্তী। হযরত আবু বকর (রা.) ওমরের কথা শোনার পর পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আত্মম্ভরিতার পরিবর্তে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য দেখালেন। শুধু তাই নয় হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতকে হযরত আবু বকর (রা.) ন্যায়ানুগ, সত্যনিষ্ঠ এবং যুক্তিযুক্ত বলে আখ্যায়িত করলেন।

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হযরত ওমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত ছিলো খলীফাকে অস্বীকার করার শামিল। তাছাড়া এটা হচ্ছে প্রটোকল পরিপন্থী কাজ। এসব প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, সেই সময় ছিলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেই সময়ে খলীফা নিজের মর্যাদা সত্ত্বেও নিজেকে ত্রুটিমুক্ত এবং সমালোচনার উর্ধে মনে করতেন না। সাধারণ নাগরিকের মতোই খলীফাকে নিজের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হতো। জনগণের মধ্যে সত্যিকার সাম্য বিদ্যমান ছিলো এবং ন্যায় ও সত্য ছিলো সকল বিচার বিবেচনার মাপকাঠি। হযরত ওমর (রা.) যদি রূঢ়তার পরিচয় দিতেন, তবে সত্য ছিলো তার সিদ্ধান্তের অনুকূলে। এ কারণে খলীফা আবু বকর (রা.) বা অন্য কোনো সাহাবী হযরত ওমরকে (রা.) সমালোচনা করেননি, বরং খলীফা নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। হযরত ওমর (রা.) চাইতেন যে, ব্যক্তিগত পরিচিত ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ না পাক। কারণ এতে সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রসার ঘটবে। আমি মনে করি উক্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়–

১. খলীফা আবু বকর (রা.) উম্মতের দুই জনকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, অথচ এই সুবিধা পাওয়ার মতো কোনো অধিকার তাদের ছিলো না।

২. এই দু'জন সাহাবী ছিলেন প্রভাবশালী ও গোত্রের সর্দার। তারা নিজেদের এই পরিচিতিকে হাতিয়ার হিসেবে প্রদর্শন করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিশেষ সুবিধা পেতে চান।

৩. 'তা'লিফে কুলুব' বা মানুষের মন জয় করা বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিলো। মনে করা হচ্ছিলো যে, এই সুবিধা সব সময় চালু থাকবে।
৪. হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানান। কেননা ওমর (রা.)-এর মতামত ছিলো শরীয়তের সিদ্ধান্তের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।
৫. উভয় সাহাবী আবু বকর (রা.)-কে ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন।
৬. হযরত আবু বকর (রা.) নীরবতা অবলম্বন করে এ সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন।
৭. শাসক এবং শাসিত উভয় শ্রেণীই নিজেদের দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝতেন। এ কারণে তাদের মধ্যে পূর্ণ বোঝাপড়া বিদ্যমান ছিলো।

এ বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। তার মধ্যে রাগ ক্রোধের কোনো প্রকাশ ছিলো না। তিনি মানুষের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগ্রহে যাকে যতটা বোধবুদ্ধি দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কারো মনে কোনো বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা ছিলো না। বরং সত্যের এবং ন্যায়ের সামনে তারা ছিলেন পূর্ণ আনুগত্যপরায়ণ। সেই সময়ের সমাজব্যবস্থা ছিলো মানব কল্যাণে নিবেদিত। যারা বাহ্যিক বিষয়কে বেশী গুরুত্ব দেয়, প্রটোকল রক্ষা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও নীতিবোধের এসব উদাহরণ তাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হবে না। কিন্তু মুসলমানদের কল্যাণ ও মঙ্গল বাহ্যিক আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের ওপর নির্ভর করে না, বরং ঈমানের সৌন্দর্যের ওপর এবং আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার ওপরই ইসলামী সমাজে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

শেরে খোদা হযরত আলীর (রা.) মতামত

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) বলেন, সেইসব লোকের কি অবস্থা হবে যারা কোরায়শের দুইজন মহান নেতা এবং মুসলমানদের শ্রদ্ধাভাজন বুজুর্গ আবু বকর এবং ওমর (রা.) সম্পর্কে দায়িত্বহীন কথা বলে বেড়ায়? আমি এ ধরনের দায়িত্বহীন কথা থেকে মুক্ত এবং তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কথা আপত্তিকর এবং সামালোচনাযোগ্য। সেই সত্তার শপথ যার নির্দেশে বীজ থেকে কুঁড়ি ফোটে এবং কুঁড়ি থেকে চারাগাছ উৎপন্ন হয়, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমরকে (রা.) তারাই ভালোবাসে যারা মোত্তাকি এবং মোমেন। তারাই উভয়কে ঘৃণা করে যারা পথভ্রষ্ট এবং দুস্কৃতিকারী। উক্ত দুইজন বুজুর্গ রসূল (রা.)-এর ভাই বন্ধু এবং পরামর্শদাতা ছিলেন।

হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওফাতের প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলেন, খলীফাতুল মুসলেমিন আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি খেলাফতের কথা চিন্তা করেন এবং ভবিষ্যত খলীফা হিসেবে হযরত ওমরকে (রা.) যোগ্য মনে করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যদি তিনি অটল অবিচল না হতেন তবে নিজের সন্তানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করতেন।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন স্পষ্টবাদী এবং সত্যবাদী। তিনি যোগ্য মানুষকে যোগ্য সম্মান দিতেন। তাঁর এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আবু বকর এবং ওমরের ওপর কেউ যেন আমাকে শ্রেষ্ঠ মনে না করে। যদি কেউ এরূপ করে তাকে আমি বাড়াবাড়িকারী হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

একদিন হযরত আলী (রা.) আবু হোযায়ফা (রা.) নামে অন্য একজন সাহাবীর সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, ওহে আবু হোযায়ফা, রসূল (স.)-এর পর এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ কে, আমি কি তোমাকে তা বলে দেব? আবু হোযায়ফা (রা.) বলেন, এই উম্মতের

মধ্যে আমি আলীর চেয়ে উত্তম কাউকে যদিও মনে করি না তবু বললাম, অবশ্যই বলুন। হযরত আলী (রা.) বললেন রসূল (স.)-এর পর আবু বকর এবং আবু বকরের পর হযরত ওমর (রা.)।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর তার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, হে বিদায়ী মোসাফের! তুমি তো চলে গেলে কিন্তু এমন কাউকে তো রেখে যাওনি যাকে আমি ঈর্ষা করবো। তার মতো এবাদাত করে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার মতো ঈর্ষা কাকে করতে পারি? হে ওমর! আপনার নেক আমল দেখে আমি সব সময় এই আকাংখাই করেছি যে, আমি যেন আপনার মতো আমল করতে পারি। তারপর সেই পাথেয় নিয়ে আমি যেন স্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছে যেতে পারি। আমি রসূলে আকরামের (রা.) কাছে শুনেছি প্রায়ই তিনি বলতেন, আমি এসেছি এবং আবু বকর, ওমর এসেছে। অথবা আমি প্রবেশ করেছি আবু বকর, ওমর প্রবেশ করেছে। অথবা আমি বের হয়েছি, আবু বকর, ওমর বের হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম হে ওমর! আপনি নিজের প্রিয় সাথী রসূলে করিম (স.) এবং আবু বকর (রা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। এখন আপনি তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে বিদায় নিয়ে গেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) অভিমত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন রসূল (রা.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য আলেম এবং বুজুর্গ। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ, বিজ্ঞ এবং উঁচুস্তরের মর্দে মোমেন। তিনি আল্লাহর নাফরমানিকে ভীষণ ভয় করতেন। তিনি সেই পাখির মতো ভয় পেতেন যে পাখির জন্যে জাল বিছানো হয়েছে, ফাঁদ পাতা হয়েছে এবং পাখি সেই ফাঁদ সম্পর্কে অবহিত। এ কারণে তিনি নিতান্ত সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করতেন। পাখি যেমন শিকারীর জালে ও ফাঁদে আটকে যাওয়ার ভয় করতো, ঠিক তেমনি হযরত ওমর (রা.) পাপ ও অন্যায়ে জড়িয়ে যাওয়ার ভয় করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ নকশা কে আর পেশ করতে পারে? ইবনে আব্বাস হযরত ওমর (রা.) এর গুণাবলী সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি লোকদের বলতেন তোমরা ওমর ফারুকের প্রসঙ্গ বেশী বেশী আলোচনা করো, তার সম্পর্কিত আলোচনা ন্যায় বিচার ও ইনসাফের আলোচনা কল্যাণ তুল্য। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের আলোচনা করা হলে আল্লাহ তায়ালার আলোচনা করা হবে। এমনিভাবে ওমরের আলোচনা মঙ্গল বয়ে আনবে।

উপরোক্ত বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রসঙ্গ আলোচনার গুরুত্ব এ কারণেই উল্লেখ করেছেন যাতে তার ন্যায়নীতি ও সুবিচারের উদাহরণ মানুষের সামনে প্রকাশ পায়। এর ফলে জনসাধারণের মনমগজে ন্যায়নীতি ও সুবিচারের স্থায়ী নকশা খোদাই হয়ে যাবে। সেই ন্যায়নীতি ও সুবিচারের আদর্শ বর্তমানে আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে আজ ন্যায়নীতি এবং সুবিচারের আদর্শ নেই। মানুষের হাতে মানুষ নির্যাতন ভোগ করছে, মানুষের হাতে মানুষের রক্ত ঝরছে। নির্দোষ মানুষের রক্তে মাটি রঞ্জিত হচ্ছে। রক্তের এই হোলিখেলা অব্যাহতভাবে চলছে। অথচ সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্যে ন্যায়নীতি সুবিচার অবশ্য কর্তব্য, আর আমরা তা থেকে বঞ্চিত।

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর (রা.) শ্রদ্ধার্ঘ্য

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) হযরত ওমরকে (রা.) শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন এভাবে, ওমর আমাদের মধ্যে শুরুর দিকের ইসলাম গ্রহণকারী এবং প্রথমেই হিজরতকারী ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দুনিয়া বিরাগী এবং আখেরাত সন্ধানী।

আল্লাহ তায়ালার ভয় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ছিলো। তারা ভালো করেই জানতেন যে, মোমেন বান্দার অলংকার হচ্ছে খোদাভীতি এবং তার সাফল্য হচ্ছে আখেরাতের সম্মান। খোদাভীতি বা তাকওয়া বান্দার এক বিরাট গুণ। আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি এবং বান্দার মধ্যে খোদাভীতি দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। সাহাবাদের কাছে একজন মুসলমানের মূল্য ও মর্যাদা নির্ণয়ের মাপকাঠি ছিলো এটাই যে, তিনি নিজ স্রষ্টা ও প্রতিপালককে কতোটা ভয় করেন। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব থেকে দূরে অবস্থানকারী, আখেরাতের তলবগার মানুষকেই ভালো মানুষ এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হতো। খোদাভীতিই ছিলো মানুষকে যাচাই করার মাপকাঠি। বর্তমানে আমরা মাপকাঠির কথা তো ভুলতে বসেছি। মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণে যদি আমরা সেই মাপকাঠির প্রতি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করি তবে আমাদের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হবে। বর্তমানে আমরা যে রকম অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি তা থেকে বের হওয়ার এই একটা পথই খোলা রয়েছে।

সংযম, সাধনা, তাকওয়া, কিন্তু বৈরাগ্যবাদ নয়

সাহাবায়ে কেরামের সংযম সাধনা ছিলো অনুসরণযোগ্য আদর্শ, তাদের আচরণে দুনিয়াত্যাগী বৈরাগ্যবাদী কোনো মনোভাব ছিলো না। দুনিয়ার জীবনে নিজেদেরকে যোগীদের মতো নির্যাতনে নিষ্পেষণে লিপ্ত করার কোনো মানসিকতা তাদের ছিলো না। দুনিয়াত্যাগী মনোভাব দ্বারা এটা মনে করার কোনো কারণ ছিলো না যে, তারা মৃত্যু কামনা করতেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এ রকম যে, যতোদিন তাদের জীবন মংগল ও কল্যাণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হতে পারে ততোদিন তারা বেঁচে থাকবেন। যখনই মৃত্যু তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে তখন তারা মৃত্যুবরণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। জীবন এবং মৃত্যু কোনোটাই কোনো অবস্থায় তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিলো না; বরং তারা কল্যাণ এবং মঙ্গলের কামনা করতেন। ইহকাল অথবা পরকাল উভয় স্থানেই তারা মঙ্গল প্রত্যাশী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার দাস বা দুনিয়াপূজারী ছিলেন না, তারা বস্তুজগতের ওপর জীবনপাত করা দুনিয়াদার ছিলেন না। তবে আল্লাহর পথে সবকিছু বিলিয়ে দিতে তারা ছিলেন সদা প্রস্তুত। তারা মনে করতেন জীবন ও অর্থসম্পদ এক কথায় জানমাল সবই আল্লাহর আমানত। ত্যাগ ও কোরবানীর সময়ে তারা কখনো কষ্ট পেতেন না, বা বিচলিত হতেন না। আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা যে বিরাট পুরস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন তার মোকাবেলায় জানমাল সন্তান সন্ততি মোটকথা সমগ্র পৃথিবীরও কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিলো না। তারা জানতেন দুনিয়ার জীবনের সবকিছু ভংগুর এবং অস্থায়ী। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন যেমন স্থায়ী তেমনি আখেরাতের শাস্তি অথবা পুরস্কারও স্থায়ী। আমরা যখন বলি যে, তারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং উদাসীন ছিলেন তখন এটা বোঝানো হয় না যে, তারা ঘরের দরোজা বন্ধ করে পড়ে থাকতেন। তারা বরং বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতেন। তারা জানতেন আল্লাহর এই দুনিয়া সংকীর্ণ নয় বরং বিস্তৃত। জ্ঞানার্জনের জন্যে তারা সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। দুনিয়াদাররা যেসব কাজ করতেন তারাও সেসব কাজ করতেন, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকতো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

কোনো সমস্যা, কোনো ব্যস্ততা, কোনো কলহ-বিবাদ তাদেরকে দুনিয়া থেকে অমনোযোগী এবং গাফেল করতে সক্ষম ছিলো না। তারা সব সময় আল্লাহর প্রতি মনোযোগী এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পাবন্দ থাকতেন। তাদের মরণের ভয় যেমন ছিলো না তেমনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনা ছিলো না। মৃত্যু আজ হোক বা কাল হোক এতে চিন্তার কিছু নেই। মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়েই আসবে। সাহাবারা সব সময় পরকালের জীবনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন এবং সেখানের ক্ষেতখামারকে আবাদ করতেন। পরকালের জীবনে যেহেতু তাদের পর্যাপ্ত সঞ্চয়

ছিলো এ কারণে তারা সেখানে যাওয়ার জন্যে সানন্দে প্রস্তুত থাকতেন। পরকালে যাওয়ার জন্যে তো তারাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকেপাপাচারের কারনে যাদের জন্যে সেখানে জেলখানা প্রস্তুত রয়েছে। সাহাবাদের সংযম, সাধনা এবং তাকওয়ার মূলকথা ছিলো এ রকমই, যেমন আমি উল্লেখ করেছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অভিমত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সীরাতের কিছু অংশ আমাদের সামনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ওমর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা শক্তিশালী এবং সম্মানিত হয়ে গিয়েছিলাম। ওমর ছিলেন জ্ঞানী মানুষ। তাঁর জ্ঞান দাড়িপাল্লার এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় আরবের সব গোত্রের জ্ঞান একত্রে রাখা হলেও ওমরের জ্ঞান রাখা পাল্লা ভারি হবে। আমরা মনে করি ওমর আল্লাহর রহমতে এবং তাঁর তওফীকের মাধ্যমে জ্ঞানের ৯ থেকে ১০ ভাগ অংশ পেয়েছেন। ওমরের মজলিসে একবার বসে অর্জিত জ্ঞান সারা বছর জ্ঞান অর্জনের চেয়ে অধিক কল্যাণকর এবং উপকারী বলে আমি মনে করি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। হযরত ওমর (রা.)-এর মজলিসে কিছুক্ষণ বসার পুণ্য এবং সওয়াব, দ্বীনী এবং আমলী সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে সারা বছর জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত ওমরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এ রকম বলেছেন, অন্যথা তিনি বিষয়টাকে কখনোই গৌরবের বিষয় এবং পূণ্য অর্জনের বিষয় বলে মনে করতেন না।

সাহাবাদের মর্যাদা সকল ক্ষেত্রে উচ্চ। তারা সংগীদের মূল্য ও মর্যাদা জানতেন, এরপর তা মুখে ও কলমে নয় বরং অন্তরের গভীর থেকেও প্রকাশ করতেন। তাদের হৃদয়ের ভাব ছিলো মুখে কথার প্রতিধ্বনিস্বরূপ। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিলো না। তাদের অন্তরে ভালোবাসার যে তরঙ্গ ছিলো বর্তমানকালে তা খুঁজেও পাওয়া যায় না। দুনিয়াবী জীবনের এখলাছ এবং সংশোধনের উপায় হচ্ছে সেই অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল ভালোবাসা অন্তরে পুনরায় সৃষ্টি করা যা বর্তমানকালে নেই। ভালোবাসার অভাব উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং দামী মানুষদেরকে মূল্যহীন করে দিয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ ধরনের এখলাছসম্পন্ন ভালোবাসার নমুনা আমাদের সামনে পেশ করছেন। এই ভালোবাসা ছিলো আল্লাহর জন্যে ভালোবাসার এক প্রভাব বিস্তারকারী আভিজাত্যপূর্ণ জ্ঞান। আব্দুল্লাহর আপন ভাই ওতবা ইবনে মাসউদ-এর মৃত্যুতে কেঁদে ফেললেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ কাঁদছি। কেননা ওতবা বংশগত দিক থেকে আমার ভাই ছিলো, কিন্তু রসূল (রা.)-এর সাহাবিয়াত-এর ক্ষেত্রে ছিলো আমার সাথী। ওমর ইবনে খাত্তাবকে (রা.) হারানোর পর ওতবা ছিলো আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) শুধু এ কারণে কাঁদেননি যে, তার আপন ভাই বিদায় নিয়েছিলো বরং তার ভাই ছিলো বিশ্বাস এবং সাহাবিয়াত-এর ক্ষেত্রেও তার সহমর্মী। ভাইয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন এবং প্রকাশ করছেন যে, ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) প্রতি তার আরো বেশী ভালোবাসা বিদ্যমান ছিলো। তিনি জানতেন যে, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তার ভাইয়ের চেয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্যে অধিক কল্যাণকর ছিলেন। এ কারণে তিনি ওমরকে (রা.) অধিক গুরুত্ব, মর্যাদা ও প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাই ইসলামের শিক্ষা যে, প্রত্যেকে মুসলমান দ্বীনের হক আদায় করার জন্যে আমল করবে এবং অন্যের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

গৌরবময় অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত

ওপরে যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কথা প্রকাশ করা হয়েছে, সে রকম ভালোবাসা যদি আমাদের মধ্যেও বিদ্যমান থাকতো তবে আমরা বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত এবং শরীয়তী

বিভিন্ন সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে সক্ষম হতাম। প্রতিটি দেশেই আজ মুসলমানরা দুর্দশাগ্রস্ত এর কারণ সুস্পষ্ট। ইসলামী চিন্তা থেকে আমরা বহু দূরে অবস্থান করছি। উদাহরণ হিসেবে যে কোনো ইসলামী দেশের সংস্থাসমূহের কথা বিবেচনা করা যায়। এমন বহু ইসলামী বা অনৈসলামী সংগঠন রয়েছে যাদের নেতৃত্বে একজন মুসলমান রয়েছেন, কিন্তু তিনি নামমাত্র মুসলমান, বাস্তব জীবনে তিনি ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন। কারণ তিনি উক্ত সংগঠনে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। মুসলিম বা অমুসলিম দেশে ইসলামের নামে হোক বা ইসলামের নামে না হোক, বহু সংগঠনে আজ মুসলমান নেতা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এরা নিজেদের চিন্তাচেতনায় ইউরোপ আমেরিকার আদর্শে বিশ্বাসী। কেউ ফরাসী, কেউ রাশিয়ার, কেউ বৃটিশ, কেউ আমেরিকার গোলামী করছে। এ রকম পরিস্থিতিতে ইসলামী চিন্তাচেতনা কোথা থেকে আসবে? চিন্তার ঐক্য কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তা আদর্শ এবং মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করছে। কারো রাগরাগিনীর মধ্যেই ঐক্য নেই, কারো চিন্তাচেতনায় সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ না দিয়ে শুধু একটি দেশের একটি সংস্থাকে টেস্টকেস হিসেবে গ্রহণ করলেও সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। নেতৃত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন তিনি নতুন চিন্তা, নতুন কর্মসূচী চালু করেন। অধীনস্থ কর্মকর্তারা কর্মচারীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। কিন্তু তারা নিরুপায়। তারা প্রাক্তন কর্মকান্ড পরিত্যাগ করে নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেন। ফলে সংস্থা তার ভাবমূর্তি এবং জনকল্যাণের ক্ষেত্রে বড় রকমের হোঁচট খেতে বাধ্য হয়। ফলে সংস্থা তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না। এটা আমাদের বড় রকমের দুর্বলতা। এর সমাধান অন্য কোথাও থেকে ধার না করে আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজতে হবে। যেসব কর্মসূচী একসময় সমগ্র মুসলিম জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলো সেই কর্মসূচীর মাধ্যমেই আমরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।

হযরত ওমর (রা.)-এর সত্যনিষ্ঠা

হযরত মায়া'য ইবনে জাবাল (রা.) ইয়েমেন থেকে মদীনায় ফেরার পর তার প্রচুর অর্থ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। হযরত ওমর (রা.) এখবর পাওয়ার পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরকে (রা.) পরামর্শ দেন, মায়া'য যেন তার লাভের অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেন। এ ধরনের ঘটনায় হযরত ওমর (রা.) ছিলেন কঠোর সত্যনিষ্ঠ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। হযরত মাআজের (রা.) ঘটনায় হযরত ওমরের ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। খেলাফতের আমলে প্রত্যেকে খোলাখুলি নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতেন। সমাজের পরিচ্ছন্নতা ছিলো তাদের লক্ষ্যস্থল, ব্যক্তি যত বড়ই হোন না কেন সেই ব্যক্তির অতোটা গুরুত্ব ছিলো না।

উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ এবং আমানত থেকে অর্থ নিয়ে তিনি ব্যবসা করেন এবং লাভবান হন। লাভের অর্থ নিজে রেখে মূল অর্থ বায়তুল মাল বা মক্কা বিজয়ের বছর রসূল (রা.) মায়া'য ইবনে জাবালকে (রা.) সরকারী দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। ইয়েমেনে অবস্থানকালে মায়া'য নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি পালন করেন। রসূল (স.) মায়া'য (রা.)-কে পত্র লিখেন যে, আমি খবর পেয়েছি তুমি নানারকম সমস্যার মধ্যে রয়েছো, তোমার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, অনেক ঋণগ্রস্থ হয়ে গেছো। যদি কোনো হাদীয়া পাও সেটা তুমি গ্রহণ করতে পারো।

মায়া'য (রা.) ইয়েমেনের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। বায়তুল মালে সঞ্চিত আমানতী অর্থ তিনি ব্যবসার কাজে লাগান। রসূল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত মায়া'য (রা.) ইয়েমেন

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বপ্ন

হযরত ইবরাহীম (আ.) যে স্বপ্ন দেখেছেন তার বিবরণ কোরআনের সূরা সাফফাত-এর ১০২ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশে তিনি নিজের পুত্রকে যবাই করছেন। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি নিজের পুত্রকে কোরবানী করার জন্যে বের হলেন এবং একপর্যায়ে পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে পিতাপুত্র উভয়েই মাথা নত করলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-এর কোরবানী গ্রহণ করলেন এবং ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা পেশ করলেন। সেই দুম্বা কোরবানী করা হলো। এই দুম্বা কোরবানীকে পবিত্র কোরআনে জবহে আজিম বা মহান জবাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিবরণ কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রথম স্বপ্নের বিবরণ কোরআনের সূরা ইউসুফের ৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, পিতা. ইয়াকুবকে (আ.) ইউসুফ (আ.) বলেন, হে আব্বাজান, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য আমাকে সেজদা করছে। এই স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এগার ভাই, পিতা এবং সৎ মা মিসরের সিংহাসনে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সমাসীন দেখে সৌজন্যমূলক সেজদা অর্থাৎ সম্মান করেছিলেন। এখানে সেজদা বলতে কি ধরনের সেজদা বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে মোফাসসেররা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সেজদা অবশ্যই সম্মানসূচক ছিলো, কিন্তু সেজদার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সে যাই হোক, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং স্বপ্নের বাস্তবতার বিবরণ উক্ত সূরা ইউসুফেই উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থ পাঠে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়।

রসূল (স.)-এর স্বপ্ন

রসূল (স.) এর স্বপ্নের বিবরণ কোরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে। সূরা ফতেহ এর ২৭ তম আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন ছিলো যথার্থই সত্যানুগ। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করবে। মাথা মুন্ডন করবে, চুল ছোট করবে এবং তোমরা কোনোপ্রকার ভয়ে ভীত হবে না। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সেই কথা জানেন, যা তোমরা জানো না। এ কারণে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে হযরত আয়শা (রা.) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার আগে রসূল (স.) স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হতো। তিনি যা কিছু স্বপ্নে দেখতেন সেইসব দিবালোকের মতো সত্য হতো।

রসূল (স.) খাতামুন নাবীয়্যিন। তাঁর রিসালত হচ্ছে সর্বশেষ রিসালত। নবুয়ত বা রিসালতের সোনালী ধারা তাঁর মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছিলেন। সেই ধারা মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। এই সুমহান এবং সর্বশেষ রিসালতের সূচনা স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিলো।

ওহুদ যুদ্ধের আগে রসূল (স.)-এর স্বপ্ন

নবুয়ত লাভের পরও রসূল (স.) বহু স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি সেইসব স্বপ্ন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা হুবহু সত্য প্রমাণিত হতো। স্বপ্ন অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনা ঘটতো। ওহুদ যুদ্ধের আগে রসূল (স.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নে রসূল (স.) একটি ভাঙ্গা দেয়াল,

এ আলোচনা দ্বারা আমি এটা বোঝাতে চাই না যে, সব রকম স্বপ্ন চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি স্বপ্নের যে যুক্তি থাকে এমন বলা যাবে না এবং সব মানুষ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতাও রাখে না। স্বপ্নকে আমরা হাদীসের মাপকাঠিতে বিচার করবো। সেই সাথে সালেহীন এবং ফোকাহাদের বক্তব্যকে সামনে রাখবো। কোরআন হাদীসের আলোকে তারা স্বপ্নের সীমা-সরহদ নির্ধারণ করেছেন। উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. যিনি স্বপ্ন দেখবেন তাকে ঘুমোবার আগে ওযুসহ পাক পবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে হবে।
২. যিনি স্বপ্ন দেখবেন তিনি মোত্তাকি এবং পরহেযগার হবেন।
৩. স্বপ্ন ভালো হতে হবে।
৪. শেষরাতে ফজরের আগে দেখা স্বপ্ন অধিক সত্য হয়ে থাকে।
৫. যিনি স্বপ্ন দেখবেন, ঘুমোবার আগে তাকে চিন্তামুক্ত টেনশনমুক্ত থাকতে হবে। কোনো প্রকার দুর্ঘটনায় তিনি যেন প্রভাবিত না থাকেন।
৬. সারাদিনের বিশেষ ধরনের কর্মব্যস্ততায় কাজের প্রভাব থাকতে পারবে না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্বপ্নে যেন কাজের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত না হয়।
৭. যিনি স্বপ্ন দেখবেন তাকে শারীরিক ও মানসিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

উল্লিখিত শর্তাবলী যদি বিদ্যমান থাকে তবে কোনো স্বপ্ন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞ কোনো আলেমের মাধ্যমে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেয়া যেতে পারে। এ ধরনের স্বপ্নকে রসূল (স.) নবুওয়তের অংশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, তবে অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকতে পারে। রসূল (স.) বলেছেন, নবুয়তের ধারা আমার কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে কোনো নবী নেই, রসূল নেই। সাহাবারা এ খবর শুনে পেরেশান হলেন। সাহাবাদের পেরেশানি লক্ষ্য করে রসূল (স.) বললেন, তবে সুস-ংবাদের ধারা অব্যাহত থাকবে। সাহাবারা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল! সুসংবাদ কাকে বলে? রসূল (স.) বললেন, সুসংবাদ হচ্ছে পুণ্যবান মুসলমানদের স্বপ্ন। এটা নবুয়তের অংশ।

ওসমান ইবনে যোবায়ের রাসেবি (রা.) আবু তোফায়েলের বর্ণনায় একটি এ মর্মে হাদীস উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম এবং ইবনে মাজাও উক্ত হাদীস সংকলন করেছেন।

ইমাম মালেক বলেন, সত্যিকার স্বপ্ন নবুয়তের অন্যতম অংশ। নবুওয়াতকে খেল-তামাশার বিষয় করা ঠিক নয়। ইমাম শাফেয়ী মিসরে থাকা অবস্থায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সামনে কঠিন পরীক্ষা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন দেখার পর ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার জন্যে চিঠি লিখে পরামর্শ দেন।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং ইবনে হাম্বলের স্বপ্ন সম্পর্কিত মতামত জানার পর আমাদের কি এ সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তিতে জড়ানো উচিত? স্বপ্ন নিয়ে যারা ঠাট্টা তামাশা বা রসিকতা করে তারা বলে যে, স্বপ্ন রূহের জগতের সাথে সম্পর্কিত। রূহের জগতের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো নেই। রূহ যে আল্লাহ তায়ালা তাবারক ওয়া তায়ালার আদেশ এ বিশ্বাস আমরাও পোষণ করি। কিন্তু স্বপ্ন সম্পর্কে রসূল (স.) এর বক্তব্য জানার পর স্বপ্নকে অর্থহীন বিষয় বলে উপেক্ষা করা কিছুতেই সমীচীন নয়। আমরা কোনো মানুষের কথায় বা যুক্তিতে রসূল (স.)-এর বাণীকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে পারবো না। সেই ব্যক্তি যতোই বিজ্ঞ, যতোই পন্ডিত, যতোই অভিজ্ঞ হোন না কেন।

জনগণের দৃষ্টিতে হযরত ওমর (রা.)

আমাদের নেতা হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মতামত সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষও এই মহান ব্যক্তিত্বের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর ছিলো না।

গ্রহণের পর রসূল (স.)-এর সামনে গিয়ে আনুগত্যের শপথ নেয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে হিন্দ বিচলিত হয়ে পড়েন। রসূল (স.)-এর সামনে তিনি একা হাযির হতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অনেক ভেবেচিন্তে হিন্দ ওমর ইবনে খাত্তাবকে (রা.) সাথী হিসেবে রসূল (স.)-এর সাথে মধ্যস্থতা করার জন্যে মনোনীত করলেন। হযরত ওমরকে (রা.) সঙ্গে নিয়ে হিন্দ রসূল (স.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলেন।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তদানীন্তন আরব সমাজে নারী পুরুষ সবার কাছেই হযরত ওমর (রা.)-এর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো অসাধারণ ও অসামান্য। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো, সম্মান করতো এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করতো। উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালমা (রা.) একবার হযরত ওমর (রা.)-কে বলেছিলেন ওমর, আপনার কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। আপনি সব ব্যাপারে খবরদারি করেন। ইদানীং রসূল (স.)-এর সহধর্মিনীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, উম্মে সালমার (রা.) কথাগুলোতে হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচনা করা হয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বীনী বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন বড়ই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তববাদী। তিনি ছিলেন ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সত্যিকার অনুগত এবং এখলাসের অধিকারী। দূরে ও কাছে সর্বত্রই হযরত ওমর (রা.) ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে ছিলেন সদা সচেষ্ট।

আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা

হযরত ওমর (রা.) তার সমসাময়িক কালের লোকদের মধ্যে এবং তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে মর্যাদা এবং সম্মানের যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে তথাকথিত মহান নেতাদেরকে যে ধরনের লৌকিক মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়, হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি সম্মান তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এ সম্মানের ক্ষেত্রে কোনো কৃত্রিমতা নেই। কোনো প্রকার জবরদস্তি নেই। নির্লোভ ভালোবাসা, ভয়হীন শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ এই সম্মান। এই ভালোবাসা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। দুনিয়ার মাপকাঠিতে এ ভালোবাসা বিচার করা যায় না। রক্ত, বংশধারার সম্পর্ক, বন্ধুত্বের বন্ধন, পারস্পরিক স্বার্থ কিছুই এ ভালোবাসার বিনিময় হতে পারে না। এ ভালোবাসা সত্যিকার ঈমানদারের ঈমানের আকাংখা এবং এটাই তার জীবনের প্রকৃত উৎস– আল্লাহর জন্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখা। মোমেন হচ্ছে তার অন্য মোমেন ভাইদের বন্ধু এবং তাদের দুঃখকষ্টের সাথী। মোমেন অন্য মোমেনের সাথে এমন সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ যে, যার সামনে পিতাপুত্র, চাচা-ভাতিজা, মামা-ভাগ্নে, রক্ত সম্পর্কীয় সহোদর ভাইয়ের সম্পর্কও তুচ্ছ হয়ে যায়। বংশ মর্যাদা, জাতীয়তা গোত্রপ্রীতি, দেশপ্রেম সবকিছু খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। মোমেন একে অন্যের সাথে এমন অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, যা কখনো ছিন্ন হয় না।

বংশধারা ছিন্ন করে ভালোবাসা অটুট রয়, কার বা সন্তান, কেবা পিতা নেইকো পরিচয়

দ্বীন ইসলামের প্রকৃত প্রাণশক্তি হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত। যারা ইসলামকে মানে তাদের অন্তরে এই দ্বীন পারস্পরিক ভালোবাসার এমন বীজ বপন করে যে বীজ সব সময় সতেজ থাকে, সজীব থাকে। এই ভালোবাসার কারণে লক্ষ্যস্থল নির্ধারিত হয়ে যায়। নিজের মনযিলে মকসুদ চোখের সামনে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। চলার পথে গতি হয় দ্রুততর, সাফল্য অর্জিত হয় খুব সহজে। আশা-আকাংখা পূর্ণ হয়ে যায়, লক্ষ্য উদ্দেশ্যও হাসিল হয়ে যায়। বস্তুগত কোনো শক্তির

ওপর ভিত্তি করে কোনো কাজ সফল হতে পারে না। কাজের সফলতার জন্যে আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রয়োজন। সেই আকীদা বিশ্বাস সুস্পষ্ট এবং স্বভাবসম্মত হতে হবে। যদি সেই বিশ্বাসের মধ্যে নেফাক বা কপটতা প্রবেশ করে অথবা বিভ্রান্তির মিশ্রণ ঘটে তবে কখনোই সফলতা আশা করা যায় না।

মুসলমানদের ইসলামী বিশ্বাস অত্যন্ত শক্তিমান ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বিশ্বাসের সেই বুনিয়াদের কারণে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করে এবং এতে কোনোপ্রকার পরোয়া করে না। নিজ ভাইয়ের জন্যে জীবন বিসর্জন দেয়া মুসলমানদের জন্যে কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এসব সংকট তারা সহজেই অতিক্রম করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তার অত্যাচার, নির্যাতন এবং কঠোর আচরণের জন্যে কুখ্যাত ছিলো। ইবরাহীম নাখয়ীকে গ্রেফতার করার জন্যে হাজ্জাজ পুলিশ পাঠিয়েছিলো। পুলিশ ভুল করে ইবরাহীম তাইমীর বাড়ীতে গিয়ে তার খোঁজ করলেন এবং তিনি কোথায় জানতে চাইলেন। ইবরাহীম এগিয়ে এসে বললেন, আমিই ইবরাহীম নাখয়ী। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো। ইবরাহীম তাইমী জানতেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম নাখয়ীর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু জানা সত্ত্বেও অপর ভাইয়ের উপকার করার জন্যে তিনি সেই ভুল সংশোধন করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, আমি গ্রেফতার হয়ে নির্যাতিত হবো ঠিক আছে, কিন্তু ইবরাহীম নাখয়ীতো নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবেন।

গ্রেফতারকৃত ইবরাহীমকে ছাদখোলা জেলখানায় বন্দী করা হলো। সেই কারাগারে রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কোনো ছায়া বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছিলো না এবং শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কোনো শীতবস্ত্রও দেয়া হতো না। শীত গ্রীষ্ম এভাবেই কেটে যেতো। নির্দোষ কয়েদী কারাগারে নির্যাতন ভোগ করতে লাগলেন। মা তাকে দেখার জন্যে কারগারে গিয়ে পুত্রকে চিনতে পারলেন না। কথা বলার পর কণ্ঠস্বরের কারণে ইবরাহীম তাইমীর মা তাকে চিনলেন। সেই কারাগারে ইবরাহীম তাইমী ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রহমত করুন।

আমাদের পূর্ববর্তীকালের সালেহীনদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন ত্যাগী জীবনের এটা একটা উদাহরণ। এ রকমের বহু উদাহরণে আমাদের ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনদের বিশ্বাসের বুনিয়াদ ছিলো খুবই শক্ত। তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পবিত্রতা এবং তার মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। নিজ মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করা, অকল্যাণ করার ইচ্ছা, তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করাতো দূরের কথা, নিজ ভাইয়ের জন্যে তারা জীবন উৎসর্গ করে দিতো। নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে অন্য কোনো ভাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার কথা তারা চিন্তাই করতে পারতো না।

রসূল (স.) মোমেনীনদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। একজন ভালো মুসলমান এটা ভালোভাবেই জানে যে, রসূল (স.) তাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন। মোমেন বান্দাদের মধ্যকার ভালোবাসা ও সততার ভিত্তি হচ্ছে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী গুণ। এই চমৎকার গুণের মধ্যে দুর্বলতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ধরনের দুর্বলতার পরিচয় দেয়া থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই। রসূল (স.) বলেছেন, মুসলিম মিল্লাতের সাথে প্রত্যেক মোমেনের সম্পর্ক হচ্ছে দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো। মুসলিম জাতির ওপর কোনো বিপদ-মুসিবত আপতিত হলে একজন সত্যিকার মোমেন তার ব্যথা অনুভব করে। কেননা দেহের যে কোনো অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ব্যথা বেদনা দেখা দিলে মানুষের মাথায় সে ব্যথা অনুভূত হয়।

ঈমানদারদের কাছে বিশ্বাসগত সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ত সম্পর্কের চেয়েও অধিক বিবেচ্য। এটাকে তারা বেশী মূল্য ও মর্যাদা দেয়। কুখ্যাত মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে

উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ একজন ভাল মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তার পিতা আবদুল্লাহ ছিলো একজন মোনাফেক। সেই মোনাফেক আবদুল্লাহ রসূল (স.) এর শানে ঔদ্ধত্যমূলক মন্তব্য করার কারণে পুত্র আব্দুল্লাহ মদীনার প্রবেশপথে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, হে পিতা, আমি তোমাকে মদীনায় কিছুতেই প্রবেশ করতে দেবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর রসূল (স.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করো। আল্লাহর রসূল (স.)-এর শানে তুমি গুরুতর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছো, গোস্তাখি করেছো। তুমি বলেছ যে, তুমি সম্মানিত, আর আল্লাহর রসূল অসম্মানিত। এই মন্তব্য প্রত্যাহার করে রসূল (স.)-এর কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি মদীনায় প্রবেশ করতে দেবো না। পুত্রের ঈমানের দৃঢ়তা দেখে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ প্রমাদ গুণলো। শেষ পর্যন্ত তাকে রসূল (স.)-এর কাছে ক্ষমা চাইতে হলো। রসূল (স.) মোনাফেক আবদুল্লাহকে ক্ষমা করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তাঁর রসূল (স.)-এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ যারা করে তারা ঈমানের দাবী পুরোপুরি পালন করে। আত্মত্যাগ হয়ে ওঠে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আবুল হাসান নাতাকি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কাছে রাঈ প্রদেশের এক গ্রাম থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন বন্ধুবান্ধব এসেছিলো। আবুল হাসান নিজে ছিলেন দরবেশ। তার বন্ধুরাও ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। রুটি ছিলো কম, মেহমান ছিলেন সংখ্যায় বেশী। এ কারণে রুটি টুকরো করে একটি পাত্রে রেখে চেরাগ নিভিয়ে দেয়া হলো। সবাই ছিলেন ক্ষুধার্ত, কিন্তু প্রতেকেই অন্যকে খাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে নিজেরা কিছুই মুখে তুললেন না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো যে, খাবার পাত্রে দেয়া রুটিগুলো সবই অবশিষ্ট রয়েছে, কেউ এক টুকরো রুটিও মুখে তোলেননি।

রাগের মাথায় এক ভাই অন্য ভাইকে অনেক সময় মন্দ কথা বলে ফেলে, বাড়াবাড়ি করে ফেলে। কিন্তু এর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা শত্রুতা করা উদ্দেশ্য থাকে না। যার প্রতি বাড়াবাড়ি করা হয় তিনি ধৈর্যের পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে যিনি বাড়াবাড়ি করেন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথে দ্বিধা সংকোচ ভুলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফোযয়েল ইবনে ইয়াজদান সম্পর্কে জানা যায় যে, একবার এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো অমুক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিয়েছে। তিনি বললেন, যে শয়তান আমার ভাইকে গালি দিতে প্ররোচিত করেছে সেই শয়তানকে আমি কিছুতেই খুশী হতে দেবো না, আমি তাকে জ্বালিয়ে ছাড়বো। এরপর তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ রব্বুল ইযযত! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার সেই ভাইকেও ক্ষমা করুন।

তুমি যদি তোমার বন্ধুকে তোমার পছন্দ ও আদর্শের অনুসারী করতে চাও তবে তার সমালোচনা করো না। তাকে তিরস্কার করো না বরং তার সাথে নম্র ভদ্র ব্যবহার করো। যদি তার কোনো অভ্যাস, কোনো স্বভাব তোমার পছন্দনীয় না হয় তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাকে সংশোধনে সচেষ্ট হও। তার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো। প্রয়োজনে কঠোর ব্যবহারও করতে হয়, কিন্তু সব সময় মেজাজ খারাপ করা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য কাজ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা যদি ভালোভাবে নসিহত-এর দায়িত্ব পালন করতে পারি, সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে পারি তবে অন্যের হঠকারিতা, শত্রুতা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ ধরনের কর্মপদ্ধতি গ্রহণে সমর্থ হলে মানুষ সত্যিকার মানসিক শান্তি লাভে সক্ষম হবে।

কবি বলেন–

অপরিষ্কার পানি পান করতে যদি
অভ্যস্ত না হও তবে মরে যাবে পিপাসায়,
সব সময়ে পানের জন্যে স্বচ্ছ পানি কেইবা পায়?

সববিষয়ে বন্ধুজনে করো যদি তিরস্কার
দোষমুক্ত মানুষ তুমি খুঁজে পাবে কোন্ ঠিকানায়?

যথাযথভাবে উপদেশ এবং নসিহত প্রসঙ্গে এযাবত আলোচনা করা হয়েছে। এবার অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। একজন মানুষ নিজেকে একদিকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে অথচ দ্বীনের বিধিবিধানের সমালোচনা করে। দ্বীনের হুকুম-আহকাম মেনে চলে না, ফরয তরক করে। আল্লাহর নির্ধারণ করা সীমা লংঘন করে। প্রবৃত্তির দাসত্ব করে অথচ নিজেকে দ্বীনের সেবক হিসেবে দাবী করে। ইসলামের হুকুম-আহকাম থেকে দূরে সরে গিয়েও নিজেকে জনগণের সেবক, দেশপ্রেমের সৈনিক হিসেবে পরিচয় দেয়। এ ধরনের লোক ভন্ড। এরা নিজেদের মুসলমান হিসেবে যে পরিচয় দেয় সেই দাবী মিথ্যা। আল্লাহর মোকাবেলায় এরা ঘৃণ্য দুঃসাহস এরা দেখায়। এটাতো সবাই জানে যে, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর আনুগত্যে সৎ এবং আন্তরিক না হয়, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে না চলে তবে সে ব্যক্তি কিভাবে মানবকল্যাণে সৎ এবং আন্তরিক হবে? দেশপ্রেম একটি প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু ঈমানদারের জানমাল ইযযত আব্রুর হেফাযত মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যে ব্যক্তি মুসলমানদের ইযযত আবরু রক্ষায় সক্ষম নয় সে কিভাবে দেশের মর্যাদা এবং সম্মান রক্ষায় সক্ষম হবে?

দেশ কাকে বলে? এক টুকরো ভূখন্ডকে কি দেশ বলা যাবে? দেশ বলতে নির্দিষ্ট ভূখন্ড এবং সেই ভূখন্ডের অধিবাসীদের বোঝানো হয়। সত্যিকার দেশপ্রেমিকের চোখে দেশের মানুষের মূল্যের চেয়ে দেশের মাটির মূল্য বেশী হতে পারে না। ঈমান আকীদা এবং তার দাবী সম্পর্কে যে ব্যক্তি সচেতন নয় তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা বৃথা। কেননা এ ধরনের মানুষ আত্মপ্রেমে বুঁদ হয়ে থাকে এবং এরা শুধু প্রবৃত্তির দাসত্বই করে। যার চিন্তা চেতনা আত্মকেন্দ্রিক, তার তো অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার সময়ই নেই।

সবকিছু খুব সহজেই বলা হয়েছে। মানুষ যদি বুঝতে পারে তবেই এ বলা সার্থক হবে। আল্লাহর বিধান যে ব্যক্তি মেনে চলে না তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। কেননা এ ধরনের মানুষ বিবেকশূন্য এবং অনুভূতিহীন। এ ধরনের মানুষদের কাছ থেকে ইসলামের সেবা এবং মানব কল্যাণ আশা করা বৃথা। পাপ সম্পর্কে যাদের অনুভূতিই নেই তারা কিভাবে পাপ থেকে আত্মরক্ষা করবে? রসূল (স.) বলেছেন, এখলাসসম্পন্ন মোমেন নিজের পাপের পরিমাণ দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে। সে মনে করে যে, একটি পাহাড়ের নীচে তার অবস্থান। মাথার ওপর পাহাড় ঝুলে আছে, যে কোনো সময় সেই পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। অথচ পাপী দুষ্কৃতকারীরা পাপকে মনে করে নাকের ওপর বসা এমন মাছি যে মাছি হাতের ইশারায় উড়িয়ে দেয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ। তাঁরা ছিলেন রসূল (স.)-এর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। রসূল (স.)-এর সীরাতের ছায়া এবং সীরাতের নূর তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিলো। সাহাবারা ঈমান আকীদার ভিত্তিতে পরস্পরকে ভালোবাসতেন। দুনিয়া আপনাআপনি তাদের অধীন হয়ে গেছে। আখেরাতের সাফল্য তাদের ভাগ্যলিখনে পরিণত হয়েছে।

ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) এবং তার পিতা

হযরত এমরান ইবনে হোসাইন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তার পিতা হোসাইন এবং কওমের অন্যরা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। রসূল (স.) হোসাইনের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি (স.) বললেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তবে শান্তি পাবে, নিরাপত্তা পাবে। হোসাইন বললেন, আমার গোত্রের অন্যান্য লোকেরা রয়েছে। তাদের বিষয়টিও বিবেচনা করুন।

আমাকে বলে দিন আমি কি করবো। রসূল (স.) বললেন, তুমি এই দোয়া করো যে, 'হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে সরলপথের হেদায়াত দিন এবং আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি দিন। আমাকে কল্যাণকর জ্ঞান বেশী করে দান করুন।'

রসূল (স.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী হোসাইন আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে তার মনের দ্বার খুলে দিলেন। সেই মজলিস থেকে ওঠার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত ইমরান (রা.) নিজের পিতাকে কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে শোনার সাথে সাথে আনন্দে আবেগে অধীর হয়ে পিতার হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগলেন। রসূল (স.) এই দৃশ্য দেখে ভীষণ প্রভাবিত হলেন। তাঁর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, ইমরানের কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি। ইমরানের পিতা-মাতা আমার সামনে কাফের অবস্থায় এসেছিলো কিন্তু সেই বৈঠকে থাকা অবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ করলো। এতে ইমরান তার পিতাকে আবেগাপ্লুত হয়ে সম্মান করলো। এই দৃশ্য দেখে আমার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

হোসাইন ছিলেন খোজায়া গোত্রের লোক। তিনি পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সাহাবী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন। বলা হতো যে, তিনি পথ চলার সময় ফেরেশতারা তার সাথে করমর্দন করতো।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আত্মত্যাগের বিস্ময়কর উদাহরণ

মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা এতো গভীর ছিলো যে, প্রয়োজনে এক ভাই অন্য ভাইয়ের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতো। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যে কোনো প্রকার কালিমা লেপন হতে দিতো না। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে উভয় পক্ষে বহুসংখ্যক মানুষ হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবা এমন বিস্ময়কর উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, যে উদাহরণ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ঝলমল করতে থাকবে। তারা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে পিপাসায় ছটফট করছিলেন। একজন পানি চাইলেন, সাথে সাথে পানি পানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি তার কাছে পানি নিয়ে গেলেন। পিপাসার্ত সাহাবীর হাতে পানি দিলেন। সেই সাহাবী পানি মুখের কাছে নেয়ার সাথে সাথে তার কানে এলো অন্য একজন আহত সাহাবী বলছেন, পানি, পানি। প্রথম সাহাবী পানি পান করতে অস্বীকৃতি জনালেন। বললেন, ওই পিপাসার্ত ভাইয়ের কাছে এই পানি নিয়ে যাও। এমনি করে ছয়জন সাহাবী পিপাসার্ত হয়েও পানি পান করলেন না। পিপাসার্ত অবস্থায় ছটফট করে নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এসব সাহাবার মধ্যে হারেস ইবনে হেশাম, একরামা ইবনে আবু জেহেল এবং সোহায়েল ইবনে আমর (রা.) নাম জানা যায়।

আসাদুল গাবা গ্রন্থের এক বর্ণনায় হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনাকারী নোমান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর জানাযার নামাযের সময় তার খাটিয়া থেকে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশংসা শোনা যাচ্ছিল। বলা হচ্ছিলো, তিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মধ্যপথের অনুসারী ছিলেন। শারীরিক শক্তিতে তিনি ছিলেন বলীয়ান। আল্লাহর হুকুম-আহকামের অনুসরণ এবং ইসলামের গৌরব বৃদ্ধিতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

রসূল (স.)-এর প্রতি ভালোবাসা

হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-কে ভীষণ ভালোবাসতেন। একদিন রসূল (স.)-এর ঘরের দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট ও জীবনের রুক্ষ্ম কঠিন রূপ দেখে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন। রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-কে কাঁদতে দেখে বললেন, হে ওমর তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, কায়সার-কেসরা নশ্বর পার্থিব জীবনে আমোদ উৎসব করবে অথচ আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের নেয়ামত আমাদের ভাগ্যলিখন হবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমি এতে খুশী।

হযরত ওমর (রা.)-এর মনে রসূল (স.)-এর প্রতি ভালোবাসা ছিলো অতুলনীয়। সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসার কথা সবাই জানে। সন্তানের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে পিতা সর্বদাই সচেষ্ট হন। একদিন হযরত ওমর (রা.) তার কন্যা হাফসা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, হযরত হাফসা কাঁদছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, মা তুমি কাঁদো কেন? রসূল (স.) কি তোমাকে তালাক দিয়েছেন? যদি তালাক দিয়ে থাকেন তবে তিনি তোমাকে ফিরিয়ে নেবেন, কিন্তু তুমি যদি তোমার কোনো কথায়, কোনো কাজে রসূল (স.)-কে কষ্ট দিয়ে থাকো তবে জেনে রেখো, আমি তোমার সাথে আর কখনো কথা বলবো না।

রসূল (স.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভালোবাসার কোনো তুলনা ছিলো না। তিনি রসূল (স.)-এর আত্মীয়-স্বজনকে নিজের আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতেন। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে সঙ্গে নিয়ে রসূল (স.) এর কাছে উপস্থিত হলেন। আবু সুফিয়ানকে দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর এই দুশমন আমাদের তলোয়ার থেকে রক্ষা পেলো কিভাবে? একথা শুনে হযরত আব্বাস (রা.) রাগতভাবে বললেন, আবু সুফিয়ান যদি তোমার গোত্র বনু আদী গোত্রের মানুষ হতো তবে তুমি তাকে হত্যা করতে চাইতে না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আব্বাস, আপনার ইসলাম গ্রহণে আমি কতটুকু খুশী হয়েছি জানেন? আজ যদি আমার পিতা খাত্তাব বেঁচে থাকতেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন তবুও আমি এতো খুশী হতাম না, যতোটা আপনার ইসলাম গ্রহণে খুশী হয়েছি।

হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-কে এতো বেশী শ্রদ্ধা করতেন, এতো বেশী ভালোবাসতেন, যে তাঁর নামের প্রতিও ছিলো তার অসামান্য ভালোবাসা। মোহাম্মদ নামকে শ্রদ্ধা করা, এই নামকে ভালোবাসা তিনি জরুরী মনে করতেন। মোহাম্মদ নামের কোনো মানুষের সাথে তিনি রুক্ষ্ম রূঢ় ব্যবহার করতেন না। অন্য কারো রুক্ষ্ম রূঢ় ব্যবহার তিনি সহ্য করতেন না। মোহাম্মদ নামের কোনো ব্যক্তির দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্রুটি-বিচ্যুতি, অমনোযোগিতা দেখলে তিনি ছট্‌ফট্‌ করতেন। তিনি ভাবতেই পারতেন না যে, এমন পবিত্র নামের অধিকারী মানুষ কিভাবে তাকওয়া পরহেযগারীর ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে পারে? তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং যায়েদ ইবনে খাত্তাবের পুত্রের নাম ছিলো ওমর। একদিন হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, মোহাম্মদ ইবনে যায়েদ ইবনে খাত্তাবের সাথে একজন লোক রূঢ় ব্যবহার করছে। একটি কাজে গাফেলতির জন্যে এরূপ ব্যবহার করা হচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদকে বললেন, আমি এটা সহ্য করতে পারছি না যে, তোমার কারণে রসূল (স.)-এর নাম মোবারক সমালোচিত হচ্ছে। এরপর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন, তোমার নাম হবে আবদুর রহমান অথবা আব্দুল হামিদ।

বনু তালায়া গোত্রে বহুসংখ্যক মানুষের নাম ছিলো মোহাম্মদ। হযরত ওমর (রা.) সেই গোত্রের সর্দারকে ডেকে পাঠালেন। সেই সর্দারের নামও ছিলো মোহাম্মদ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা তোমাদের মোহাম্মদ নাম পরিবর্তন করো। সর্দার বললেন হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁকে স্মরণ করুন। আল্লাহর কসম, আমার নাম স্বয়ং রসূল (স.) রেখেছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আচ্ছা যাও। যে সিদ্ধান্ত স্বয়ং রসূল (স.) করেছেন সেটি পরিবর্তনের কোনোই অবকাশ নেই।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর ধারণা ছিলো খুবই উন্নত। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাইয়াত এবং খেলাফতের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রসূল (স.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর সাহাবারা শোকে কাতর এবং দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারা রসূল (স.)-এর

ওফাতের কথা বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিলেন না। হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ রসূল (স.)-এর ওফাত হয়েছে। একথা শোনার পর সাহাবারা বিশ্বাস করলেন। মোহাজেররা হযরত আবু বকর (রা.)-কে রসূল (স.)-এর স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়ে একমত হন। হযরত আবু বকর (রা.) ভাবলেন এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আনসারদের মতামত নেয়া আবশ্যক। তিনি বললেন, চলো আমরা তাদের কাছে যাই। আনসারদের উপস্থিতিতে দীর্ঘ আলোচনার পর একজন আনসার বললেন, একজন আমীর আনসারদের মধ্য থেকে, একজন আমীর মোহাজেরদের মধ্য থেকে মনোনীত করতে হবে।

এই দাবীর প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, একটি খাপে দুটি তলোয়ার রাখা সম্ভব নয়। এরপর হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরে বললেন, এই সম্মানিত ব্যক্তিই আমাদের আমীর। আমাদের মধ্যে তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, গুহায় থাকা অবস্থায় তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। তার সাথীকে তিনি বললেন, ভয় করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ বক্তব্য পেশ করার পর হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত করলেন এবং উপস্থিত সাহাবাদেরও বাইয়াত করতে বললেন। হযরত ওমর (রা.) সর্বপ্রথম বাইয়াত করেছিলেন। পরদিন প্রায় সকল সাহাবা বাইয়াত করেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) কখনোই হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত করেননি। হযরত আলী (রা.), বনু হাশেম গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি, যোবায়ের ইবনে আওয়াম, খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.) দ্বিতীয় দিনও বাইয়াত করেননি। ঐতিহাসিকদের মতে বেশ কিছুদিন মতান্তরে ছয় মাস পরে তারা বাইয়াত করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর দূরদর্শিতা

একটি খাপে দু'টি তলোয়ার রাখা যায় না। খেলাফাতের দায়িত্বে একই সাথে দু'জনকে সমাসীন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অল্প কথায় হযরত ওমর (রা.) অনেক কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমীরুল মোমেনীন হিসেবে মনোনীত করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে মদীনার আনসাররা! তোমরা সবাই ভালোভাবেই জানো যে, রসূল (স.) তাঁর জীবদ্দশায় নামাযে ইমামতির জন্যে হযরত আবু বকর (রা.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে ব্যক্তি আবু বকর (রা.)-এর উপস্থিতিতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করবে? সবাই বললেন, আবু বকর (রা.)-এর উপস্থিতিতে আমাদের কারোই ইমামতির দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

হযরত ওমর (রা.)-এর দূরদর্শিতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে হযরত আবু বকর (রা.)-কে আনসার ও মোহাজেররা ঐক্যবদ্ধভাবে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এতে মুসলিম জাতি এক বিরাট সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলো। খোদা না করুন, যদি আনসার এবং মোহাজেরদের মধ্যে খেলাফত প্রশ্নে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো তাহলে তার পরিণাম কতো যে ভয়াবহ হতো সেকথা কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

হযরত ওমর (রা.)-এর খোশ মেজায

হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, সাহাবারা হাসতেন কি না। তিনি বললেন, হাঁ তারা হাসতেন। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী হাসতেন। হাসির জন্যে তারা লালায়িত থাকতেন না এবং হাসি-ঠাট্টা-তামাশায় বিভোর থাকতেন না। তাদের ঈমান ছিলো উঁচু মযবুত পাহাড়ের মতো।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ইনসাফ ও সুবিচারের উন্নত নমুনা। ন্যায়নীতি এবং সুবিচারের মাধ্যমে নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা এবং কাজের প্রতি নিবেদিত চিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষের প্রতি যদি আপনি সুবিচার করতে ব্যর্থ হন এবং তাদের গুণবৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন তবে এতে তাদের সৌন্দর্য নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সেসব নেতা এবং শাসকরাই নির্বোধ যারা মানুষের গুণবৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি না দিয়ে শুধু দোষের কথা প্রকাশ করে। এর দ্বারা তারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায় ও অন্য মানুষকে ছোট করতে চায়। এ ধরনের তৎপরতা এবং এ ধরনের কাজের পরিণাম ধ্বংসাত্মক।

একজন মুসলমানের জন্যে হাসি কোনো দোষনীয় ব্যাপার নয়। আল্লাহ তায়ালা হাসিকে মানুষের স্বভাবগত বিষয় করে দিয়েছেন। একবার রসূল (স.) কয়েকজন সাহাবাকে হাসি খুশীতে মশগুল দেখে বললেন, যা কিছু আমি জানি যদি তোমরা সেসব জানতে তবে অবশ্যই হাসতে কম কাঁদতে বেশী। একথার পর হযরত জিবরাইল (আ.) পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নিয়ে এলেন যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন! আল্লাহই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।

কিছুদুর যাওয়ার পর রসূল (স.) সাহাবাদের কাছে আবার ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে চল্লিশ কদম যেতে না যেতেই জিবরাইল (আ.) আমার কাছে কোরআনের এই আয়াত নিয়ে হাযির হয়েছেন।

আয়াজ ইবনে সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, আরশে আযীম থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, আমার উম্মতের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা প্রকাশ্যে হাসে, কিন্তু গোপনে আল্লাহর আযাবের ভয়ে কাঁদে। রসূল (স.) অধিকাংশ সময় মৃদু হাসতেন, কখনো কখনো একটু বেশীও হাসতেন, কিন্তু কখনোই উচ্চঃস্বরে অট্টহাসি হাসতেন না। হাসির সময়ে তাঁর দাঁতের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো। খুব কম সময়েই দাঁতের মাড়ির সামান্য অংশ দেখা যেতো।

যিয়াদ ইবনে ছাবরা আলইয়ামরি বর্ণনা করেছেন, একবার রসূল (স.)-এর সাথে আমি বের হলে আশজা এবং জাহিনা গোত্রের কিছু লোকের সাথে দেখা হলো। রসূল (স.) তাদের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করলেন এবং হাসলেন। বিশিষ্ট সাহাবারা পরিচ্ছন্ন হাসি তামাশা এবং রসিকতা করতেন। হযরত সোহায়েব রুমী (রা.) জ্ঞানের সাধনায় এবং এবাদাত বন্দেগীতে উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন হাসি তামাশা এবং রসিকতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, রসিকতা তামাশা যে ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায় সে ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত থাকে। হযরত ওমর (রা.) অহংকার থেকে মুক্ত ছিলেন। তার মনে যা থাকতো মুখেও তার প্রকাশ ঘটাতেন। এ ধরনের স্বভাব কল্যাণকর। এতে উপকারই হয়, কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না। তিনি মনে এক প্রকার, মুখে অন্য প্রকার এমন কখনোই ছিলেন না। তাঁর জীবন ছিলো উন্নত আদর্শের নমুনা। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে তিনি ভয় করতেন না। ভেতরে বাইরে দুই রকম চিন্তা-চেতনা পোষণ করা তিনি নিজের পৌরুষের অবমাননা মনে করতেন।

মোয়াল্লেমে আখলাক হযরত ওমর (রা.)

একথা প্রকাশ করা জরুরী মনে করছি যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আলোচনা করছি না। আমি ঐতিহাসিক নই। কেউ ওমর (রা.) সম্পর্কে ইতিহাস লিখুক বা না লিখুক এতে হযরত ওমর (রা.)-এর কিছু যায় আসে না। তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু লিখবে এ রকম আশায় তিনি কখনো কোনো আমল করেননি। তিনি যা কিছু করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই করেছেন। আল্লাহর ভয় সব সময় তাঁর মনে জাগরুক থাকতো।

তিনি সব সময় একথা ভেবে শংকিত থাকতেন যে, তার সব কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ওয়াকেফহাল। আল্লাহর সামনে তিনি সব সময় হাত প্রসারিত করে রাখতেন। মানুষের কাছে যা কিছু রয়েছে তার দৃষ্টিতে সেসব কিছুর কোনো মূল্য ছিলো না।

হযরত ওমর (রা.)-এর খোদাভীতি ও তাকওয়া আমাদের প্রশিক্ষণের জন্যে উন্নত আদর্শ হিসেবে বিদ্যমান। আল্লাহর কুদরতে হযরত ওমর (রা.)-এর তাকওয়া পরহেযগারির কিছুটাও যদি মুসলিম মিল্লাতের ভাগ্যে জোটে তবে মুসলমানদের সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং সকল আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে। মানব জীবনে তাকওয়া এবং খোদাভীতির প্রভাব প্রতিক্রিয়া অপরিসীম। আল্লাহভীতি বলতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের আধিক্য বুঝায় না । হজ্জ পালন করা মানুষের সংখ্যা তো কম নেই। নামায রোযার যারা পাবন্দি করে তারাও সংখ্যায় অনেক। এটা অনস্বীকার্য যে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইসলামের মূলনীতিও অত্যাবশ্যকীয় ফরয। এসব কিছুর ওপর ইসলামের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। এসব ফরয ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। কিন্তু এসব ফরয যদি প্রাণহীন হয়ে পড়ে তখনই তা গুরুত্ব হারায় এবং তার প্রভাব বলতে কিছুই থাকে না। খোদাভীতি বলতে আমি মনের সেই অবস্থা বোঝাচ্ছি, যে অবস্থা হওয়ার পর মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা সব সময়ের জন্যে তার সামনে উপস্থিত রয়েছেন।

এরূপ অবস্থা হওয়ার পর মানুষের প্রাণস্পন্দন মানুষকে তার আত্মপরিচয় বুঝিয়ে দেয়। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তাকে ইসলামের দাওয়াত এবং চিন্তা ফেকেরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরূপ হওয়ার পর ফরযসমূহ আদায় করা তার জন্যে কষ্টকর মনে হয় না, বোঝা মনে হয় না বরং ফরযসমূহ আদায় করার পর সে মনে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। এরপর আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নফলসমূহ আদায়ে সে মনোযোগী হয়ে ওঠে। মন যখন জাগ্রত অবস্থা অর্জন করে তখন মানসিক তৃপ্তি এবং নিজের অর্জিত সৌভাগ্য সম্পর্কে জানা যায়। মন হয়ে ওঠে পুষ্পস্তবক। সেই পুষ্পস্ত বকের প্রতিটি ফুল বসন্ত বাহার দেখায়। মন হয়ে ওঠে চেরাগদান। সেই চেরাগদানে আলোর চেরাগ জ্বলতে থাকে। সেই চেরাগের আলোয় দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। এধরনের মন কেবলার কথা চিন্তা করলে কেবলা দেখার আগে আল্লাহ তায়ালা তাবারক ওয়াতায়ালাকে দেখতে পায়। অভাবগ্রস্তদের হাতে দান খয়রাতের অর্থ বা অন্ন সামগ্রী অর্পণ করার সময়ে আল্লাহ তাবারক ওয়াতায়ালার হাতের স্পর্শ অনুভব করে। রোযা রাখার সময়ে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের বিরাট সত্তার সামনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তুচ্ছ হয়ে যায়।

তাকওয়া ও খোদাভীতির এই পর্যায়ে আমরা এ কারণেই উপনীত হতে চাই যাতে আমরা প্রবৃত্তির অন্ধকার থেকে হেদায়াতের আলোয় পৌঁছুতে পারি। জাগতিক সব চাওয়া পাওয়া থেকে মন মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর এবাদতের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চায়। বান্দা এবাদতের ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু এবাদতের হক আদায় করার জন্যে মহান আল্লাহর সাহায্য দরকার। তিনিই সহায়, তিনিই ওসিলা। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মন যেন ধৈর্যশীল থাকে সেজন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর নূরের তাজাল্লি মনের ভেতর ধারণ করতে হবে। কোনো প্রকার অহংকার মনের ভেতর থাকতে পারবে না। আল্লাহর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। আল্লাহর কাছে সব বিষয়ে সাহায্য চাইতে হবে। পার্থিব জগতের যে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা থেকে মনকে মুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সবকিছু আল্লাহ তায়ালার ওপর ন্যস্ত করা হলেই 'নফসে মোতমায়েন্না' অর্থাৎ পরিতৃপ্ত অন্তরের প্রশান্তি অনুভব করা যায়। মাখলুকের কোনো মতামত নেই, মাখুলকতো অনুভূতিহীন এবং শক্তিহীন। মাখলুকতো খালেকের মুখাপেক্ষী। এ সম্পর্কিত বহু উদাহরণ পেশ করা যায়। এখানে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ পেশ করা যাচ্ছে।

বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গ এবং হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.)

হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.) খবর পেলেন যে, ইয়েমেনে একজন প্রবীণ বুযুর্গ রয়েছেন। তিনি তাকে সিরিয়ায় ডেকে পাঠালেন। দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের অবস্থা জানতে এবং পুরনো

দিনের ঘটনাবলী তার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছিলেন। সেই বুযুর্গ দরবারে উপস্থিত হলে আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বললেন, আপনি যা ইচ্ছা আমার কাছে চাইতে পারেন। বুযুর্গ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, আমার যৌবনকাল আমাকে ফিরিয়ে দাও। মোয়াবিয়া (রা.) বললেন এটাতো আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। বৃদ্ধ বললেন, ঠিক আছে তাহলে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দাও। মোয়াবিয়া (রা.) বললেন, এটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বৃদ্ধ বললেন, দুনিয়া এবং আখেরাতের কিছুই যখন তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে আমাকে যে জায়গা থেকে এনেছো সেখানে পৌঁছে দাও। মোয়াবিয়া (রা.) বললেন, হ্যাঁ তাই দিচ্ছি, তবে আল্লাহ যদি শক্তি না দেন তবে সেটাও আমি পারবো না।

আল্লাহর ভয় যদি মনে জায়গা করে নেয় তাহলে মোমেন বান্দা কষ্টদায়ক বস্তুজগতের ভয় থেকে নাজাত পেয়ে মানসিক প্রশান্তিতে তৃপ্ত হতে পারে। দেহ এবং আত্মা পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই হয়ে ওঠে তার সন্তুষ্টির বিষয়, আর আল্লাহ তাবারক ওয়াতায়ালাও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাযকিয়ায়ে নফস অর্থাৎ আত্মার পরিচ্ছন্নতা কি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি নিজের মনকে এমনভাবে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করবে যে, সেই ব্যক্তি যেখানেই থাকবে সে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার সঙ্গে রয়েছেন।

রসূল (স.) এর এই বাণীর আলোকে কোরআনের একটি আয়াত পেশ করা যায়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের নফসকে পরিচ্ছন্ন করেছে সে সফল হয়েছে, আর যে ব্যক্তি নিজের নফসকে অপরিচ্ছন্ন রেখেছে সে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন এই আয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি সব অবস্থায় আল্লাহকে নিজের সামনে থাকার কথা চিন্তা করতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে কাজ করতেন। তাঁর সমগ্র জীবন ছিলো আল্লাহ তায়ালা ভীতির সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। সেই নমুনা আজো আলোয় ঝলমল করছে।

হযরত ওমর (রা.)-এর শারীরিক গঠন ও ব্যক্তিত্ব

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এটাই চেয়েছিলেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনসৌন্দর্য মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হোক এবং ভবিষ্যৎ বংশধররা সে সম্পর্কে আলোচনা করুক। সকল ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-এর স্বচ্ছতা, খোদাভীতি, পৌরুষ, তার উজ্জ্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইসলামের জন্যে তাঁর অবদান, তার ঈমানী আদর্শ আমাদের জন্যে বিশেষভাবে অনুকরণীয়। এ সম্পর্কে জানার পর স্বাভাবিকভাবেই তার শারীরিক গঠন, প্রকৃতি এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ জাগে। হযরত ওমর (রা.) অন্যসব সাধারণ মাটির মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। নবুয়তের মর্যাদা তার ছিলো না। তার গুণাবলী, তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিলো অনন্যসাধারণ। কিন্তু ওরকম গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় এ রকম চিন্তা বৈধ নয়। সবরকম বৈশিষ্ট্য অন্য মোমেন বান্দাও অর্জন করতে পারে। কিন্তু সেজন্যে প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম। তবে হ্যাঁ, ওরকম পরিশ্রম করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

হযরত ওমর (রা.) তার অনন্য সাধারণ মর্যাদা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারেননি। ইসলাম গ্রহণের আগে এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইসলাম গ্রহণের আগেও হযরত আবু বকর (রা.) কখনো মদ্যপান করেননি, কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেননি এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি কোনো অত্যাচার নির্যাতন করেননি। হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের আগে এসব ভুল করেছিলেন। একথাগুলো আমি এ কারণেই উল্লেখ করছি যাতে একটি বিশেষ বিষয়

আমরা সবাই বুঝতে পারি। পাপ, অন্যায় যারা করে তাদের জন্যে তওবার দরোজা বন্ধ হয়ে যায় না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাপে নিমজ্জিত একজন মানুষেরও উচিত আর বেশী পাপ না করে দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে নিজের পরিবর্তন করে নেয়া। তওবার দরোজা খোলা রয়েছে। আল্লাহর রহমত পাপী এবং দোষী লোকদের স্বাগত জানাচ্ছে। আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা সহজ। কেউ যদি সত্যসন্ধানী হয় তবে তার মুশকিল আসান হয়ে যায়। আল্লাহকে যে সন্ধান করে সে অবশ্যই তাকে পেয়ে যায়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ মিনারে আরোহণ করেন। তিনি সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সততার পক্ষপাতী ছিলেন। মুক্তকণ্ঠে সত্যের প্রচারক এবং দ্বীনের রক্ষক হিসেবে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন। এটা তার স্বাভাবিক স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। তিনি যা ভালো মনে করতেন সেটা সমগ্র উম্মতকে জানানোর ব্যাপারে কোনো দ্বিধা করতেন না। একবার রসূল (স.) মোহাজেরদের মধ্যে গনিমতের কিছু মালমাল বিতরণ করছিলেন। এ সময় হযরত যয়নব (রা.)-এর একটি কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) যয়নব (রা.)-কে রূঢ়ভাবে জবাব দিলেন। রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, ওমর যয়নব বড় দুঃখিনী, তাকে অতো রূঢ় ভাষায় কথা বলো না।

আত্মসমালোচনায় হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) অন্যের ব্যাপারেই কঠোর এবং রূঢ় ছিলেন না বরং নিজের ক্ষেত্রেও ছিলেন একই রকম। নিজের মনে কোনো অপছন্দনীয় চিন্তা এলে তিনি কঠোরভাবে সে চিন্তা বিলীন করে দিতেন। নিজেকে তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং আত্মসমালোচনা করতেন। তিনি সব সময় কেয়ামতে যেসব বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে সেসব ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। নিজের মনের ভাব ইচ্ছে করলে তিনি গোপন রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। অন্যদের সমালোচনার পাশাপাশি হযরত ওমর (রা.) কঠোর আত্মসমালোচনাও করতেন। তিনি কোনো ভুল করে ফেললে খোলাখুলি প্রকাশ করতেন এবং সংশোধন করে নিতেন। সেই ভুলের কথা শুনে মানুষ কি বলবে সেটা কখনো ভাবতেন না।

হযরত ওমর (রা.)-কে যারা ভালোবাসে তাদের উচিত তার কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা এবং তার জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করা। গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে আলোর মশাল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছিলেন ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচারের নমুনা। নিজেকে তিনি কখনোই আইনের উর্ধে মনে করতেন না। কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল অবস্থায় আমাদেরকে ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচারের ওপর থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ। যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ তায়ালা উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না।' (সূরা আন নেসা, আয়াত ১৩৫)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সত্য ও ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে কখনো অলসতা করা যাবে না। ভুল স্বীকার করা মহত্ত্বের লক্ষণ। ভুল স্বীকারের ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলেও ভুল স্বীকার মহত্ত্বের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করে, নিজের ভুল নিজে স্বীকার করে, মানুষের সামনে কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার করে না আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন। আল্লাহর দেয়া বিধান বাস্তবায়নে যারা সচেষ্ট হয় আল্লাহ তায়ালা তাদের রহমত করেন, সাহায্য করেন। সকল প্রকার সংকীর্ণতা এবং মুশকিল থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদের নাজাত দেন।

হযরত ওমর (রা.) সব ক্ষেত্রেই ছিলেন কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত

সব বিষয়ে নিজের ভূমিকা খোলাখুলি ব্যাখ্যা করা চারিত্রিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ। নিজস্ব রুসম রেওয়ায এবং সামাজিক মূল্যবোধের কারণে কোনো কোনো মতামতকে কেউ কেউ অচেনা এবং বিস্ময়কর মনে করে। সেই মতামত যতোই ভালো হোক না কেন শুনতে চায়না। নিজেও কারো কাছে সেই মতামতের প্রশংসা করে না। বিয়ের কথাই ধরা যাক। এটি মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়ের মাধ্যমে একটি সংসারের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং একটি ছোট সমাজের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। বিয়ে-শাদী মানব স্বভাব প্রকৃতির একটি তাকিদও বটে। বিয়ের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, স্বভাবের প্রয়োজন পূর্ণ করে, শারীরিক আরাম-আয়েশ লাভ করে। হযরত ওমর (রা.)-কেও একজন মানুষ হিসেবে এসব প্রয়োজন তাকে স্বাভাবিকভাবেই পূরণ করতে হয়েছিলো। সাধারণ মানুষদের মতোই তারও শারীরিক প্রয়োজন ও মানসিক শান্তির আবশ্যকতা ছিলো। এসব কারণে তিনিও বিয়ে করেছেন, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অনেক উন্নত, অনেক আলাদা। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করি, অথচ বিয়ের এখন আমার বিশেষ প্রয়োজন নেই। আমি স্ত্রীদের সাথে নির্জনে অবস্থানও করি, অথচ তার আমার তেমন প্রয়োজন নেই। যাদের কাছে এসব কথা বলছিলেন তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, হে আমীরুল মোমেনীন তবে আপনি কেন বিবাহ করেন? হযরত ওমর (রা.) জবাবে বললেন, আমি উম্মতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে বিয়ে করি। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, তার উম্মতের সংখ্যা বেশী হলে তিনি উম্মতের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্য উম্মতদের সামনে গর্ব করতে পারবেন। রসূল (স.)-এর এই ইচ্ছা পূরণেও এ আদেশ পালনে আমারও যেন কিছু ভূমিকা থাকে এ কারণেই আমি বিয়ে করি।

হযরত ওমর (রা.) চেয়েছিলেন যে, উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। উম্মতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে তিনি অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। তিনি জানতেন এতে রসূলে করিমের (স.) ইচ্ছা পূর্ণ হবে। রসূল (স.)-কে খুশী করা ছাড়া হযরত ওমর (রা.)-এর বিয়ের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। রসূল (স.)-এর খুশীই ছিলো মূল বিষয়, অন্যান্য বিষয় ছিলো শাখা প্রশাখা। উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-এর এ ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা.) মনের কথা প্রকাশ করতে কোনো প্রকার দ্বিধা সংকোচ করতেন না। রসূল (স.) সম্পর্কে সাহাবারা হযরত ওমর (রা.)-এর যে ভূমিকা দেখেছেন অকপটে সেসব প্রকাশ করেছেন। যোহরা ইবনে সাঈদ তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রসূল (স.)-এর সাথে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর একখানি হাত ধরে রেখেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আপনাকে আমি আমার জীবন ছাড়া অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসি। একথা শুনে রসূল (স.) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালো না বাসবে। একথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রসূলুল্লাহ (স.) এখন আমি আপনাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে ওমর! এইবার ঠিক হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.)-এর এই সাহসিকতার প্রকাশের কারণে উম্মতে মোহাম্মদীর বিরাট লাভ হয়েছে। ঈমানের মৌলিক একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা জানা সম্ভব হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) যদি রসূল (স.)-এর সামনে কথাটি সরাসরি না বলতেন তবে বহু লোক এটা জানতেই সক্ষম হতো না যে, রসূল (স.)-এর প্রতি উম্মতের কি ধরনের ভালোবাসা থাকা দরকার। সত্য বলা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মধ্যেই শুধু কল্যাণ নিহিত থাকে। এর মাধ্যমে চোখে না দেখা অপ্রকাশ্য বিষয় সহজে

প্রকাশিত হয়, দৃশ্যতঃ বিষয় সহজে প্রকাশিত হয়। খোলাখুলি কথা বলার দ্বারা দৃশ্যতঃ সঠিক কিন্তু আসলে ভুল এমন অনেক কিছুর সংশোধন হয়ে যায়। সত্য এবং সেই সত্যের প্রকৃত বিশ্লেষণ হচ্ছে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের মূলভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা সত্য। আমরা যখন আল্লাহর আদেশ নিষেধের সামনে আত্মসমর্পণ করি তখন আল্লাহ তায়ালা খুশী হন। আল্লাহ তায়ালা যার ওপর খুশী হন তার অন্য কারো খুশীর প্রয়োজন নেই। অন্য কারো তোয়াক্কা না করলেও তার চলে।

দৃশ্যতঃ বহু শক্তি, বহু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ বড়ই অসহায়। নিজের শক্তির ঢোল নিজে পেটায়, নিজের শক্তির ঝান্ডা নিজে ওড়ায়, তবু তারা আসলে দুর্বল। বাহ্যিক শক্তির দাপট যদি তারা হকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তবে বুঝে নিতে হবে যে, তারা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছে। ক্ষণস্থায়ী এবং ভংগুর শক্তির কারণে যদি আপনি সত্য ত্যাগ করেন, সত্যের সহায়তা ছেড়ে দেন, তবে জেনে রাখবেন যে, আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে অসন্তুষ্ট করেছেন। যদি নিজের স্রষ্টা এবং প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে ফেলেন তবে বলুনতো আপনি কার কাছে আশ্রয় চাইবেন? আল্লাহর কুদরত এবং শক্তির সামনে সত্যিকারভাবে যদি আপনি আত্মসমর্পণ করেন তবে মানুষ আপনার কী ক্ষতি করতে পারবে?

আপনি কি ক্ষতির আশংকা করছেন? দুর্বল মানুষ আপনার কোনো ক্ষতি করতেও পারবে না। ক্ষতি হয়ে গেলে সেটা রোধও করতে পারবেন না। আপনি কি তাদের কাছে রেযেক চান? তারা আপনার রেযেক কমবেশী করার কি কোনো ক্ষমতা রাখে? না রাখে না। তাদের দ্বারা কি কোনো প্রকার লাভের আশা করেন? তারা আপনার উপকারও করতে পারবে না, উপকার রোধও করতে পারবে না। আপনি কি মৃত্যু ভয়ে মানুষের আশ্রয় নিতে চান? জেনে রাখবেন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আগে পিছে করার কোনো ক্ষমতাই মানুষের হাতে নেই। কাজেই মানুষকে ভয় পাওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। সত্যের সহায়ক হওয়া থেকে মানুষকে কোন্ জিনিস বিরত রাখে? যদি কারো মধ্যে পৌরুষ থাকে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের প্রতি দৃঢ় ঈমান থাকে, তাহলে সত্যের সহায়তা না করে কোনো মানুষ পেছনে সরে থাকতে পারে না। আল্লাহর এই নির্দেশ তার সামনে থাকে এবং তার সাহস বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তুমি ওদের কাছে জিজ্ঞেস করো যে, যমীন ও আসমান কে তৈরী করেছে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা তৈরী করেছেন।' ওদের বলো, যদি এটাই বিশ্বাস করো তবে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের যেসব প্রতিমার পূজা করো তারা কি আল্লাহর দেয়া কোনো ক্ষতি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? ওদের বলে দাও আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসা করলে তার ওপরই করা উচিত।'

সেই ব্যক্তির ইসলামের কী মূল্য আছে যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর হক ও বান্দার হক স্বীকার করেছে, কিন্তু নিজের ঈমানের দাবী পূর্ণ করে না? সত্যের সহায়ক না হওয়ার কি কোনো যুক্তি তার আছে? সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার পরিবর্তে সত্যের ব্যাপারে বৈরী ভূমিকা গ্রহণ করার মতো কোনো যুক্তি কি তার আছে? এরূপ বৈরী ভূমিকা তো তারই বিরুদ্ধে যাবে, কারণ এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষের অংগপ্রত্যঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

সত্য সম্পর্কে মানুষের প্রকৃত অবস্থান আমরা আড়াল করি কেন? বক্র স্বভাবের মানুষদের, ফাসেক, কাফের, দুষ্কৃতিপ্রিয় মানুষদের মুখোশ কেন আমরা তাদের সামনে খুলে ফেলি না? তারা নিজেদের ওপর যে যুলুম করছে সেই যুলুমের কথা, সেই অত্যাচারের কথা কেন আমরা প্রকাশ করি না? ওরা অসন্তুষ্ট হবে ভেবে চুপচাপ থেকে কেন আমার আল্লাহর অসন্তুষ্টির ঝুঁকি গ্রহণ করি? আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমাদের রক্ষা করার মতো আর কে আছে? কোরআনে তিনি বলেছেন, কোনো প্রাণী আল্লাহর আদেশ ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে।

যার অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে তার মন শক্তির আধার হয়ে যায়। তার মনের চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। এটা কোনো কাল্পনিক কথা নয় বরং এটা এক চিরন্তন সত্য কথা। ঈমানদারদের ওপর এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন ঈমানের ঝলমলে রূপ এ বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। হাতেম আসাম নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি খোরাসানে শফিক বলখীর সাথে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে শফিক আমার কাছে এসে বললেন, ওহে হাতেম তোমার মনের কি অবস্থা? আমি বললাম, বাসর রাতের মতো আনন্দ অনুভব করছি। একথা বলে আমি নিজের ঢাল মাটিতে রাখলাম এবং তার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার নাক ডাকার শব্দ অন্যরা শুনতে পেলো।

আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান থাকলে এ রকমই হয়ে থাকে। যুদ্ধের ময়দানে ক্লান্তি ঝেরে ফেলার জন্যে যে বান্দার চোখে আল্লাহ তায়ালা ঘুম এনে দেন সেই ঘুমতো অবশ্যই তৃপ্তি এবং প্রশান্তির ঘুম। এ ঘুম কোনো নির্বোধের ঘুম নয়, কোনো অসতর্ক মানুষের ঘুম নয়। বরং এই ঘুমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মনকে শান্ত করেন, সাহস বাড়িয়ে দেন। বদরের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে ঘুমের রূপে তোমাদের ওপর প্রশান্তি এবং ভয়হীনতার অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। ঘুম সে সময় প্রশান্তি এবং নির্ভীকতার মাধ্যম হয়ে এসেছিলো।'

এ রকম উচ্চ মর্যাদা আত্মার শুদ্ধি এবং আত্মার চিকিৎসার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। আত্মাকে বিশ্বাসের পোশাকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করতে হবে যাতে আত্মা আশংকায় শঙ্কিত হয়ে দিক পরিবর্তনের পরিবর্তে নিজের ভূমিকার ওপর অটল অবিচল থাকে। মোমেন বান্দার জন্যে এ ধরনের বিশ্বাস অর্জন করা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন সে এ ধরনের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে যে, তার জন্যে দুটি দিন সৃষ্টি করা হয়েছে। একদিন জীবনের একদিন মৃত্যুর। মৃত্যুর দিন এসে হাযির হলে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না। যদি সে দিন এখনো না এসে থাকে তবে কিসের ভয়? মৃত্যু সব সময় নির্ধারিত সময়েই আসে। ভয়ে পালাতে চাইলেও পালাবার পথ পাওয়া যাবে না আবার সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেও কোনো লাভ নেই। উভয় অবস্থার পরিণতি একই রকম। মৃত্যুকে ভয়ের কিছু নেই, মৃত্যুতো ভয়ের পরিবর্তে সাহস যোগায়। কবি বলেন–

দু'দিনের একদিন জীবনের আর
একদিন মৃত্যুর।
মৃত্যুর ভয়ে পালাবো কোনো দিন আমি?
যেদিন মৃত্যু লেখা নেই
সেদিনতো ভয় পাওয়া বৃথা।
মৃত্যু যেদিন লেখা আছে সেদিন
ভয় অথবা দিশেহারা ভাব যদি জাগে
কিছু কি লাভ আছে ওতে?
মৃত্যু ভয় পাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত ওমর (রা.)-এর মনে অপছন্দনীয় কোনো চিন্তা আসা মাত্রই তিনি তার মূলোৎপাটন করতেন। রোগের শুরুতেই তার চিকিৎসা করা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। রোগ যদি শেকড় বিস্তার করে বসে তবে সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা বেশ কঠিন। একবার কয়েকজন লোক হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে একটি তুর্কী ঘোড়া নিয়ে এলো। তিনি সেই ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। ঘোড়াটি গর্বিত ভঙ্গিতে চলতে শুরু হলো। হযরত ওমর (রা.) ঘোড়াটিকে প্রহার করলেন। এতে ঘোড়ার গর্বভাব আরো বেড়ে গেলো। ওমর (রা.) নীচে এসে লোকদের বললেন, তোমরা আমাকে

শয়তানের পিঠে সওয়ার করিয়ে দিয়েছো। তাড়াতাড়ি আমি নীচে নেমে এসেছি। অন্যথা আমার মনেও অহংকার জায়গা করে নিতো।

হযরত ওমর (রা.) এমনই অনুভূতিপ্রবণ এবং স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, সামান্য বিষয়েও আত্মসমালোচনা করে নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছেন। অথচ তিনি যদি না বলতেন তবে কারো মনেই এ কথা জাগতো না যে, হযরত ওমর (রা.) তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণের কারণে তার মনে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ কি বলবে, কি ভাববে, ওমর (রা.) সেটা চিন্তা করতেন না। তিনিতো সেই সত্তাকে ভয় করতেন যিনি বুকের গোপন গভীরে লুকানো কথাও ভালোভাবে জানেন। ওমর (রা.) একজন মানুষই ছিলেন। অন্য সাধারণ মানুষ যা দ্বারা প্রভাবিত হয় তিনিও তা দ্বারা প্রভাবিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শীঘ্রই মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে জানতেন। অথচ আমরা বহু মানুষকে বিশেষ যান্ত্রিক যানবাহনে আরোহণ করে গর্বিতভাবে চলাচল করতে দেখি। তারা শুধু গর্ব অনুভবই করেন বরং গর্ব প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করেন। এ ধরনের মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছেন এই ধোঁকা অবশ্যই ধ্বংসাত্মক।

ক্রীতদাসদের প্রশিক্ষণ

হযরত ওমর (রা.) তার ক্রীতদাসদের সংশোধনের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। ক্রীতদাস হিসেবে সাফল্য অর্জনের জন্যে, ভালো সেবক হওয়ার জন্যে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো না বরং দ্বীনী জ্ঞান, বৃদ্ধি এবং ঈমান মযবুত করার জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে ইরাক থেকে জিযিয়া করের উট এলো। হযরত ওমর (রা.) এবং তাঁর ক্রীতদাস সে উট গুনতে লাগলো। উটের সংখ্যা এতো বেশী ছিলো যে, সে সময় গুণে শেষ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। হযরত ওমর (রা.) বারবার বলছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। তার ক্রীতদাস বললো, এটা আল্লাহর ফযল ও তাঁর রহমত। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। এটাতো 'মিম্মা ইয়াজমাউন'। হযরত ওমর (রা.) সূরা ইউনুসের ৫৮নং আয়াতের প্রতি ইশারা করছিলেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বলো এসব আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে ওরা আনন্দিত হোক। ওরা যা জমা করে তার চেয়ে এটা শ্রেয়।'

অর্থাৎ আল্লাহর রহমত তো ধনসম্পদ নয় বরং আল্লাহর রহমত হচ্ছে পবিত্র কোরআন। ধন-সম্পদকে 'মিম্মা ইয়াজমাউন' অর্থাৎ ওরা যা পুঞ্জীভূত করে বলা হয়েছে। রসূল (স.) এর আদেশ পালনে কোনো সাহাবী অলসতা করবে এটা হযরত ওমর (রা.) বরদাশত করতে পারতেন না। বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) একবার আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.)-কে উট চালনার গানের কথা শোনাতে বললেন। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হুদী খাওয়ানি অর্থাৎ উট চালনার গানের কথা তো পরিত্যাগ করা হয়েছে। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) চিৎকার করে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)- কে বললেন, নবী (স.)-এর আদেশ শোনো এবং আনুগত্য করো। হযরত ওমর (রা.)-এর একথা বলা ভুল ছিলো না। কেননা রসূলুল্লাহ (স.) এর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সমার্থক। সূরা নেসায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করেছে সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে।'

আমরা যে সত্যের ওপর ঈমান এনেছি সেটি বিস্তারিতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আমাদের কর্তব্য। মানুষের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সেই দাওয়াত মানুষ পছন্দ করুক বা না করুক তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। নম্রতার সাথে, হেকমতের সাথে, সুন্দর উপস্থাপনার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। যদি যথাযথ নিয়মে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা আমাদের কষ্ট দেয় তবু দুঃখ করা যাবে না এবং হতাশ হওয়া যাবে না। যে কোনো অবস্থায়ই

দ্বীনের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যদি বিশ্বের সব মানুষও দ্বীনের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবু আমাদের হতাশ হওয়ার বা পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। কারণ আমরা তো মানুষের সন্তুষ্টি চাই না, আমরা চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেখানে যা করছো করতে থাকো। আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার পরিণাম মঙ্গলময়। যালেমরা কখনো সফলকাম হবে না। আল্লাহ তায়ালা যে শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্যে এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।' (সূরা আনয়া'ম, আয়াত ১৩৫-৩৬)

সত্যের ঘোষণা অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াত দেয়া ওয়াজেব। এ ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা জরুরী। এই কঠিন এবং মহান কাজের পুরস্কার আমরা শুধু আল্লাহর কাছে চাই, অন্য কারো কাছে নয়। অন্য কারো প্রশংসা বা অন্য কারো কাছ থেকে পুরস্কার প্রয়োজন নেই।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও।' (সূরা আনয়া'ম, আয়াত ৯১)

আমরা যদি আল্লাহর হেদায়াত এবং নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করতে ব্যর্থ হই তবে আমাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সৎ পথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ কষ্ট পাবে না। যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়'।

হে আল্লাহ তায়ালা! সত্য গ্রহণে তুমি আমাদের তওফিক দাও, সত্য বলার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করো। সব সময় সত্যের অনুসরণের শক্তি দাও। এই পথে যতো বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট আসবে সবই সহজভাবে গ্রহণ করার জন্যে আমাদের ধৈর্য দাও। সত্যের অনুসরণ এবং সত্যের দাওয়াত দেয়ার সৌভাগ্য তুমি আমাদের দান করো।

আমরা যদি এ মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হই তবে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না। এ ধরনের সৌভাগ্যবান লোকদের সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওদেরকেই আল্লাহ তায়ালা সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, কাজেই তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো।' (সূরা আনয়াম, আয়াত ৯০)

এক রাতে হযরত ওমর (রা.) মদীনার অলিতে গলিতে ঘোরাফেরা করছিলেন। এক ঘরের পাশে গিয়ে শুনতে পেলেন গৃহকর্তা নফল নামাযে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। লোকটি সূরা তূর পাঠ করছিলেন। গৃহকর্তা তেলাওয়াতে যখন এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী, এর নিবারণকারী কেউ নেই।' এই আয়াত শোনার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, কাবার প্রভুর শপথ, এই কথা সত্য। ভয়ে তার দেহ কাঁপতে লাগলো।

হযরত ওমর (রা.) ও কোরআন

৪

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত ওমর (রা.) ও কোরআন

কোরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই বাণীর মাধ্যমে সবকিছু মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যারা মনে করে যে, কোরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণীর সারমর্ম তারা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হচ্ছে যে, কোরআনের অক্ষর, শব্দ, আয়াত এবং তার অর্থ সবই আল্লাহর কালাম। এই গ্রন্থে বর্ণিত আদেশ, নিষেধ, আহকাম, ফরযসমূহ, ঐতিহাসিক কাহিনী কেসসা, ঘটনাবলী প্রভৃতি সবই আল্লাহর কালাম।

কোরআনের হক

কোরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কালামের জরুরী হক হচ্ছে তা বোঝা এবং তার অর্থ পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করা। আয়াত এবং সূরা মুখস্থ করলেই কোরআনের হক আদায় হয়ে যায় না। কোনো কোনো সালফে সালেহীন বলেছেন, কোরআনের বাণী কণ্ঠস্থ করার পর কেউ যদি কোরআনের নির্ধারণ করা সীমা লংঘন করে তবে সে ব্যক্তি কোরআনের হক পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তি কোরআন সম্পর্কে জানেনি, কোরআনের হকও বোঝেনি। বহু লোক এমন রয়েছে, যারা কোরআন তেলাওয়াত করে অথচ কোরআন তাদেরকে লা'নত দেয়। বহু লোক দাবী করে যে, তারা কোরআন তেলাওয়াত করে কিন্তু তাদের চেহারা, ছুরতে, চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে কোরআনের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কোরআনে নোকতা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কোরআনকে পারায়, রুকুতে এক তৃতীয়াংশে, পারার অর্ধেকে এবং আয়াতে বিভক্তির কাজ সাহাবায়ে কেরামের সময়েই সম্পন্ন হয়েছিলো। সেই সময়ের বিন্যাসকৃত কোরআনই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই।

ঈমানদারদের ওপর কোরআনের দাবী অনেক। রসূল (স.) এই হক বা দাবী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কোরআনের ফযিলত ও বরকত বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে রয়েছে রসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করেছে, মুখস্থ করেছে, তার দাবী পূরণ করেছে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবার-পরিজনের মধ্যেকার এমন দশজনকে তার সুপারিশে বেহেশতে নেবেন যাদের ব্যাপারে দোযখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

রসূল (স.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কণ্ঠস্থ করে হাফেয হয় সে পুণ্যবান সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করতে গিয়ে আটকে যায়, বারবার চেষ্টা করে এবং এ কাজে নিয়মিত সময় ব্যয় করে সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

কোরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কোরআন তেলাওয়াতের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তেলাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাদের সামনে ছিলো। তারা ধীরে ধীরে শান্তভাবে

তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াতের সময় গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং হুকুম-আহকাম অনুযায়ী আমল করতেন। তোতাপাখী বা ময়না পাখীর মতো তাদের তেলাওয়াত ছিলো না। আবু আব্দুর রহমান সালমি বলেন, আমরা কোরআন তেলাওয়াত তাদের কাছে শিক্ষা করেছি যারা দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার পর সেসব আয়াত অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন না।

কোরআন সংকলন

রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মাত্র পাঁচ ছয়জন সাহাবীর কাছে পুরো কোরআন লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে হযরত ওমর (রা.) কোরআনকে একটি গ্রন্থের রূপ দিয়ে সংকলিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-কে গ্রন্থাকারে কোরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত ওমর (রা.) শুধুমাত্র প্রস্তাব পেশ করেই চুপচাপ থাকেননি বরং প্রায়ই তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে কাজের কতটুকু সম্পাদন হচ্ছে সেটা তদারক করতেন। সংকলনের কাজে নিয়োজিত সাহাবাদের তিনি উৎসাহ দিতেন এবং তাকিদ দিতেন। এই পবিত্র কাজে যে কোনো উপায়ে অংশ গ্রহণ করা তিনি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর চেষ্টা এবং যত্নে দ্রুত পবিত্র কোরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ শেষ হয়। আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-কে উত্তম বিনিময় দান করেন।

কোরআনের মজলিস

হযরত ওমর (রা.) কোরআনের হেফযকে গুরুত্ব দিতেন, কিন্তু হাফেয হওয়ার চেয়ে কোরআন বুঝা ছিলো তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর সম্পর্ক ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ। এটা সুন্নতে নববীর পূর্ণ বাস্তবায়ন ছিলো। হযরত উবাই (রা.) বলেন, মসজিদে নববীতে আমরা বিভিন্ন মজলিসে বিভক্ত হয়ে দ্বীনের আলোচনা করতাম। কেউ যেকের, কেউ দোয়া, কেউ কোরআন তেলাওয়াত, কেউ কোরআন সম্পর্কে আলোচনায় মশগুল থাকতাম। রসূল (স.) হুজরা থেকে এসে কোরআনের মজলিসে বসে যেতেন। তিনি বলতেন, আমাকে এই মজলিসে বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রসূল (স.) বলেছেন, যারা কোনো জায়গায় একত্রিত হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে তারা আল্লাহর মেহমান হয়ে যায়। ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উঠে না যায় বা অন্যকাজে লিপ্ত না হয় ততক্ষণ যাবত ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে।

আল্লাহর মেহমান হওয়ার ইচ্ছা কার না হয়? রব্বানী দস্তরখান থেকে পাথেয় সঞ্চয়ের আকাংখা কার না জাগে? হযরত ওমর (রা.) কোরআন হাদীসের অর্থ খুব ভালো বুঝতেন। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনের হারাম করা জিনিসসমূহ হালাল করে নিয়েছে প্রকৃতপক্ষে সে কোরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তিনি আরো বলেছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিছু পরিবার পরিজন রয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হলো কারা আল্লাহর পরিবার হে রসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, কোরআনের সাথে যারা আন্তরিক সম্পর্ক রাখে তারা আল্লাহর পরিবার এবং তাঁর খাস বান্দা। আল্লাহ তায়ালার সন্তানসন্ততি নেই, তিনি এসব থেকে পবিত্র। কিন্তু কোরআনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনকারীদেরকে আল্লাহর আহল বা পরিবার বলা হয়েছে।

কোরআনের সাথে সম্পৃক্তদের মর্যাদা

হযরত ওমর (রা.) কোরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতেন এবং কোরআনের হক আদায় করতেন। কোরআনে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তিনি তাদের বিশেষ সম্মান করতেন।

একদিন হযরত ওমর (রা.) বিশেষ কাজে বের হলেন। তার সঙ্গে অন্য কয়েকজন সাহাবীও ছিলেন। পথে এক বৃদ্ধা হযরত ওমরকে (রা.) থামিয়ে তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। হযরত ওমর (রা.) মাথা নীচু করে দীর্ঘ সময় বৃদ্ধার কথা শুনলেন। একজন সাথী বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! একজন বৃদ্ধার দীর্ঘ কথা শোনার জন্যে আপনি এতোজন মানুষকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি কি জানো এই মহিলা কে? এই মহিলার অভিযোগ আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের ওপর বসে শুনেছেন এবং তার জবাবে সূরা মোজাদেলা নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কথোপকথন শোনেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' এই মহিলা হচ্ছেন খাওলা বিনতে মালেক ইবনে ছা'লাবা। আল্লাহর কসম, এই মহিলা যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে এখানে আটকে রাখে তবু আমি কিছু মনে করবো না। হযরত ওমর (রা.)-এর নামাযের সময় হলে মসজিদে যেতেন, নামায শেষে এসে পুনরায় বৃদ্ধার কথা শুনতেন।

এমনি করে হযরত ওমর (রা.) তার কথায় এবং কাজে কোরআনের প্রতি সম্মানের নমুনা পেশ করতেন। প্রত্যেক মুসলিম শাসকের কর্তব্য এটাই যে, তারা কোরআনের সাথে সম্পর্কিতদের সম্মান করবেন। শাসকদের এ রকম তৎপরতার ফলে সাধারণ মানুষের মনেও পবিত্র কোরআনের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান জাগ্রত হবে। তারা কোরআনের হুকুম আহকাম প্রশান্ত মনে পালন করবে।

হযরত ওমর (রা.) কোরআনের বিধান নিজের ঘরে বাস্তবায়ন করতেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র বাস্তবায়ন করতেন। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন, 'তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং এ কাজে দৃঢ় এবং ধৈর্যশীল থাকো।' হযরত ওমর (রা.) ফরয নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যেও পরিবার-পরিজনকে ঘুম থেকে জাগাতেন। কোরআনের নির্দেশের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-এর আমল ছিলো চমৎকার নমুনা।

হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের সপক্ষে ওহী নাযিল

বিশেষ কোনো সমস্যায় রসূল (স.) সাহাবাদের মতামত নিতেন। সাহাবারা মতামত পেশ করতেন। হযরত ওমর (রা.)ও মতামত দিতেন। বহুবার এমন দেখা গেছে যে, হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের সপক্ষে ওহী নাযিল হয়েছে। এমনি করে হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের সমর্থনে কেয়ামত পর্যন্ত শরীয়তের বিধান প্রবর্তিত হতো। হযরত ওমর (রা.) আল্লাহকে ভীষণ ভয় করতেন। এই ভয় এমন নূর, এমন আলো যে আলো পথ আলোকিত করে এবং মোসাফেরদের পথনির্দেশ দান করে। বিশ্বব্যবস্থায় আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর সময় এবং সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রতিটি কাজের পরিণাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তিক্ত গাছ কেউ রোপন করলে তিক্ত ফলই উৎপাদিত হবে। আল্লাহকে যারা ভয় করে না তাদের পরিণামে অবমাননা এবং লাঞ্ছনা অবধারিত। ভালো কাজের পরিণাম অবশ্যই ভালো হয়ে থাকে।

নাফরমানদের পরিণাম

আমরা সাধারণত দেখতে পাই বহু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহর নাফরমানি সত্ত্বেও ধন-সম্পদ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে। তাদের জীবন যাপনের জৌলুস দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তাদের জীবন যাপনে স্পষ্টতই বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। খোদাভীতি তাদের মধ্যে নামমাত্রও দেখা যায় না। এদের এ রকম রমরমা অবস্থা প্রকৃত পক্ষে সাফল্য বলা যায় না বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিথিলতা। এর ভুল অর্থ আমরা অনেকে করে থাকি। ওসব লোক আল্লাহর দেয়া শিথিলতার মধ্যে যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নাফরমানির পথ ছেড়ে

আনুগত্যর পথে আসে তবে সেটাই তাদের জন্যে কল্যাণকর। যদি তারা সংশোধিত হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করে তবে তাদের মন্দ কাজের পরিণামে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পাকড়াও করবেন। এ ধরনের লোক তখন আল্লাহর দরবারে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। তারা অনুশোচনা এবং আফসোস ছাড়া তখন কিছুই পাবে না। নাফরমানদের নাফরমানি এবং অবাধ্যতা চরম পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের ধন-সম্পদে, অর্থ-বিত্তে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেন, এটা এজন্যেই করা হয় যাতে করে তাদের পাপের তরী ভরে যায় এবং প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সময় মতো ডুবে যায়। ফলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর ধরাও হয় শক্ত ধরা। অবর্ণনীয় অনুশোচনায় তারা তখন দগ্ধ হতে থাকে। অবাধ্য এবং নাফরমানদের ভুলেও এটা মনে করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সম্পর্কে অমনোযোগী বা উদাসীন। তাদের রশি আল্লাহ তায়ালা ছেড়ে দিয়েছেন এটা চিন্তা করা ঠিক নয়। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফেররা যেন এটা মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্যে। আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৮)

হাসান বসরী বলেছেন,বহু লোক এমন রয়েছে যাদের ওপর করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। এটা আসলে তাদেরকে অবকাশ দেয়ার কারণেই হয়ে থাকে। বহু লোক এমন রয়েছে যাদের প্রশংসা তাদের জন্যে ফেতনা হয়ে দেখা দেয়। বহু লোক এমন রয়েছে যাদের পাপের ওপর পর্দা ফেলে রাখা হয় কিন্তু তারা তওবা করে সৎ পথের অনুসারী হওয়ার পরিবর্তে ধোঁকার মধ্যে পড়ে যায়।

বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে বলেছিলো হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে কতো অসন্তুষ্ট করেছি কিন্তু তুমি আমাকে কোনো আঘাত দাওনি, কোনো শাস্তি দাওনি। এ কথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা সেই যামানার নবীর কাছে ওহী পাঠালেন যে, সেই ব্যক্তিকে বলে দাও, আমি তোমার ওপর কতো বড় শাস্তি নাযিল করে রেখেছি কিন্তু সেটা জানতেই পারোনি। তোমার চোখের ওপর গাফেলতির যে পট্টি রয়েছে এবং তোমার মনের যে পাপাসক্তি, এটা আমার পক্ষ থেকে শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কি যে ভালো হতো তুমি যদি এটা বুঝতে সক্ষম হতে।

আল্লাহভীতির পুরস্কার

যে ব্যক্তি আল্লাহভীতির ছায়ায় জীবন যাপন করে সে কখনোই দুর্ভাগ্যের শিকার হয় না। এ ধরনের ব্যক্তি কল্যাণ লাভের তওফিক পায় এবং তাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর জীবন আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ ছিলো। এই ভীতি তার মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। তাকে সেইসব মানুষের কাতারে শামিল করা হয়েছে যাদের সাথে সম্পর্ক থাকা ইহকালে কল্যাণকর এবং পরকালেও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এসব ব্যক্তি হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদায়ে কেরাম, সালেহীন। এদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কতোই না গৌরবের কতোই না সম্মানের।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত ওমর (রা.)-এর আল্লাহভীতির উত্তম পুরস্কার দান করেছেন। তার মুখে উচ্চারিত কথা আল্লাহর ওহী হয়ে নাযিল হতো। কখনো তার কথার সমর্থনে কোরআনের আয়াত নাযিল হতো, কখনো বা তার ইচ্ছা-আকাংখা অনুযায়ী কোরআনের আয়াত নাযিল হতো। আমাদের চিন্তা এবং কথা অনুযায়ী যদি সাধারণ ঘটনাও ঘটে তখন আমরা আনন্দে আটখানা হয়ে বলি, কি আমি তো আগেই বলেছিলাম! কেন বলিনি? গর্বে অহংকারে বুক ফুলে ওঠে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর ক্ষেত্রে কি দেখা যায়? একাধিকবার তার কথার সমর্থনে এবং তার ইচ্ছার

প্রতিফলনে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কখনো তাকে উৎফুল্ল হতে দেখা যায়নি বরং তিনি আরো বেশী ভীতসন্ত্রস্ত আরো বেশী নম্র ও বিনয়ী হয়ে পড়েছিলেন। বেশী বেশী পুরস্কার পেয়েও তার আল্লাহভীতি কিছুমাত্র কমেনি বরং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সামনে যে ব্যক্তি যতো নত হয়, নম্র হয়, বিনয়ী হয়, আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা ও মূল্য ততো বাড়িয়ে দেন।

পবিত্র কোরআন আমাদের রসূল (স.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা। একজন মোমেনের কথার সমর্থনে এবং ইচ্ছার প্রতিফলনে যদি সেই শ্রেষ্ঠ মোজেযার এক বা একাধিক নাযিল হয়ে থাকে তবে এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহভীতির প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সুপ্ত আল্লাহভীতি হেদায়াতের পথে পথনির্দেশ দিয়েছে। এই আল্লাহভীতি অন্তরে এনে দিয়েছে শান্তি। অন্তর আল্লাহর নূরে ঝলমল হয়ে উঠেছে। হযরত ওমর (রা.) ছাড়া অন্য কারোই এ রকম বিরল সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

কোরআন তেলাওয়াতের আদাব

কোরআন তেলাওয়াতের আদাব রয়েছে। তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারতিল এবং খুশু জরুরী। একবার রসূল (স.) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেই কাঁদছিলো। রসূল (স.) লোকটির প্রশংসা করলেন এবং সঙ্গী সাহাবাদের বললেন, তোমরা কি জানোনা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভালো তারতিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করো? তারতিলের অর্থ শুধু বিশুদ্ধভাবে ও স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত নয় বরং মনের বিনয়ও তার সাথে শামিল থাকতে হবে।

হযরত আলকামা (রা.) এক ব্যক্তিকে কোরআন তেলাওয়াত করতে শুনলেন। লোকটি খুব ভালোভাবে তেলাওয়াত করছিলো। আলকামা (রা.) বললেন, আমার পিতামাতা এই ব্যক্তির ওপর কোরবান হোক, এই ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে তারতিলের হক আদায় করেছে।

আবু বকর ইবনে তাহের তারতিলের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারতিল হচ্ছে কোরআন পাঠে বিশুদ্ধতা। কোরআনের মাধুর্য প্রকাশ, নিজেকে কোরআনের আদর্শের অনুসারী করে তোলা, মনমগজ চিন্তা চেতনা কোরআনের জন্যে উৎসর্গ করা এবং কোরআনের নির্দেশানুযায়ী আমল করা।

হযরত কাতাদা (র.) বলতেন, যে ব্যক্তি কোরআনের সাথে কিছুক্ষণ বসেছে সে অবশ্যই কিছু অর্জন করেছে অথবা কিছু হারিয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতের হক আদায় করে তেলাওয়াত করেছে সে কিছু পুণ্য অর্জন করেছে। তার পক্ষে কোরআন দলীল হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করেছে কিন্তু যথাযথভাবে তেলাওয়াত করেনি সে পুণ্য অর্জন করতে পারেনি। কোরআন তার জন্যে দলীল হবে না। সে বরং কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সাহাবাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেই সমস্যা সমাধানে সাহাবারা মতামত পেশ করতেন। হযরত ওমর (রা.)ও নিজের মতামত পেশ করতেন। খুব কম সময়েই এমন হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের সমর্থনে ওহী নাযিল হয়নি। অর্থাৎ অধিকাংশ সময়েই হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের সমর্থনে ওহী নাযিল হয়েছে।

আল্লাহভীতি ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর বিশেষ গুণ। এই আল্লাহভীতির কারণে কোরআনের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো। এ ধরনের সৌভাগ্য খুব কম সাহাবারই অর্জিত হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) কোরআনের প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে চিন্তা করতেন, মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি শব্দ শুনতেন এবং নীরব থাকতেন। মনে হতো তার ওপর বিশেষ

অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আশংকা করতেন, শোনার সময়ে কোনো শব্দ বাদ পড়ে না যায়, কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে না পান। তিনি মনে করতেন কোরআনের প্রতিটি আয়াতে তাকেই যেন সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আরাফের ২০৪ নং আয়াতে কোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরবে শোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) মনে করতেন যে, এই আয়াতে তাকেই সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআনের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর আন্তরিক সম্পর্ক ঈমানের জৌলুস সমৃদ্ধ একটি অধ্যায়।

কোরআন আল্লাহর কালাম। কোরআন একটি প্রশংসিত গ্রন্থ। মানুষের সাফল্য এ ক্ষেত্রে এটাই যে, তারা কোরআনের সাথে ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই সম্পর্ক স্থাপন প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।

হযরত আবু মুসা আশয়া'রী (রা.) সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। রসূল (স.) তার সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতকে লাহানে দাউদী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) প্রায়ই হযরত আবু মুসাকে (রা.) কোরআন তেলাওয়াতের আদেশ দিতেন।

একবার হযরত ওমর (রা.) আবু মুসাকে (রা.) বললেন, মহান প্রতিপালক আল্লাহর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি এই ইচ্ছা পূরণ করুন। হযরত আবু মুসা (রা.) কোরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর আবু মুসা (রা.) তেলাওয়াত থামিয়ে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! নামায। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা কি নামাযের মধ্যে নই? এ কথার পরই অবশ্য হযরত ওমর (রা.) নামাযের জন্যে উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার কথার অর্থ হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত ও নামাযের মতোই এবাদাত। এ কথার সারমর্ম এটা নয় যে, কোরআন তেলাওয়াত করলেই নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে বা নামায আদায়ের দরকার হবে না। এ রকম কেউ মনে করলে সেটা তার মনের বক্রতার শামিল হবে।

যেসব সাহাবা হাফেয ছিলেন, কারী ছিলেন, যারা কোরআন নিয়ে গবেষণা করতেন হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। মোসাফের এবং মুকীম উভয় অবস্থায় কারীদের কাছ থেকে কোরআন শোনার জন্যে হযরত ওমর (রা.) সবাইকে নির্দেশ দেন। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কোরআনের স্বতন্ত্র রং ও রূপ লক্ষ্য করি। প্রত্যাশা এবং চাহিদা মোতাবেকই সাফল্য অর্জিত হয়।

ইয়াজিদ ইবনে জাফর আল আবদি বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে হযরত ওমর (রা.) মদীনার অলিতে গলিতে ঘোরাফেরা করছিলেন। এক ঘরের পাশে গিয়ে শুনতে পেলেন গৃহকর্তা নফল নামাযে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। লোকটি সূরা তূর পাঠ করছিলেন। গৃহকর্তা তেলাওয়াতে যখন এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী, এর নিবারণকারী কেউ নেই।' এই আয়াত শোনার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, কাবার প্রভুর শপথ, এই কথা সত্যি। ভয়ে তার দেহ কাঁপতে লাগলো। মনের অবস্থা ভয় শংকুল হয়ে উঠলো। সওয়ারী থেকে তিনি নীচে নামলেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। এক সময় বেহুশ হয়ে গেলেন। পরে তাকে উঠিয়ে ঘরে নেয়া হলো। প্রায় একমাস যাবত তিনি শয্যাশায়ী থাকলেন। বহু লোক শুশ্রূষার জন্যে এলেন। কেউ জানতে পারেনি তার কি অসুখ। আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহমত করুন। কোরআনের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর সম্পর্ক ছিলো এমনই ঘনিষ্ঠ।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় হযরত ওমর (রা.) শুধু জিহ্বাই ব্যবহার করতেন না। তার দেহ, মন, মগজ কোরআনের মধ্যে যেন লীন হয়ে যেতো। কোরআন শোনার সময় তিনি শুধু কান

দিয়ে শুনতেন না বরং দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোমকূপও যেন কোরআনের মাঝে বিলীন হয়ে যেতো। ওপরে যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, তার ওপর কোরআনের প্রভাব কতো গভীর ছিলো। তার ওপর কোরআনের এই প্রভাব সম্পর্কে তার প্রভু নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। ওমর (রা.) সম্পূর্ণভাবে কোরআনের পাবন্দ ছিলেন। ফলে তার মতামতের পক্ষে ও তার আকাংখা অনুযায়ী কোরআনের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। কোরআন কেন্দ্রিক এ রকম দু'ধরনের সম্পর্ক অন্য কারোই ছিলো না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা এতো উঁচু।

খানায়ে কাবা আল্লাহর ঘর। শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এই ঘর নির্মাণ করেন। হযরত ওমর (রা.) কাবা ঘরের মর্যাদা ও গুরুত্ব ভালোভাবেই জানতেন। কাবা ঘরের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্মৃতি হযরত ওমর (রা.)-এর মনে পড়ে গেলো। তিনি রসূল (স.) -কে বললেন, আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায আদায় করতেন তবে কি যে ভালো হতো। হযরত ওমর (রা.)-এর মনে এ আকাংখা জাগ্রত হওয়ার পরই হযরত জিবরাইল (আ.) ওহী নিয়ে এলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে আদেশ দিলেন মাকামে ইবরাহীমকে তোমার নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করো। এতে হযরত ওমর (রা.)-এর আকাংখা পূর্ণ হলো।

বহু শতাব্দী কেটে গেছে, এখনো হযরত ওমর (রা.)-এর আকাংখা জীবন্ত ও সজীব। কোরআন তেলাওয়াত অব্যাহতভাবে বিশ্বব্যাপী চলছে, বিরতিহীনভাবে নামায আদায় করা হচ্ছে, হজ্জ্ব পালিত হচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তওয়াফের পর হাজী সাহেবরা নফল নামায আদায়ের জন্যে এখনো মাকামে ইব্রাহীমের দিকে ছুটে যান।

হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব

মুসলমানদের ইযযত, আবরু, মানসম্মান পবিত্র। নিজের ইযযত আবরু রক্ষার চেষ্টায় কেউ নিহত হলে ইসলাম তাকে শাহাদতের মর্যাদা দেয়। ইযযত-সম্মানের অধিকারী মানুষই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। এই ব্যক্তিত্ব ঈমানের নিদর্শন। ইযযত আবরুর হেফাযতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল অশালীন কথা ও কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। প্রকাশ্যে বা গোপনে সকল প্রকার অশ্লীলতা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করেছিলেন যে, সর্বস্তরের মানুষ রসূল (স.) এর ঘরে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়াতেন এবং অবলীলায় ভেতরে ঢুকে যেতেন। উম্মুল মোমেনীন সকলেই ছিলেন মোমেনদের মায়ের মতো। তারা চারিত্রিক দিক থেকে ছিলেন পাক পবিত্র। হযরত ওমর (রা.) মনে মনে চিন্তা করলেন যে, নবী সহধর্মিনীদের সামনে মোমেনদের উপস্থিতির ব্যাপারে যেন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা নিষেধ না করায় এ সম্পর্কে রসূল (স.) নীরব ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। ওমর (রা.) বুঝতে পারছিলেন যে, রসূল (স.) তাঁর স্বভাবজাত লজ্জা-সংকোচ এবং কোমলতার কারণে কাউকে কিছু বলতে পারছেন না। কিন্তু বিনা বাধায় যখন তখন রসূল (স.)-এর দরোজায় যাওয়া এবং ঘরে প্রবেশ করা তার কাছেও বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-এর মুখে এ হাদীস শুনেছিলেন যে, কোনো ব্যক্তির ঘরে কে এলো, কে গেলো এ ব্যাপারে যদি সেই গৃহকর্তা উদাসীন থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা তার কোনো এবাদাত কবুল করেন না। হযরত ওমর (রা.) খোলাখুলি কথা বলতে পছন্দ করতেন। কোনো রাখঢাক ছিলো তার স্বভাববিরুদ্ধ। একদিন রসূল (স.)-এর সামনে গিয়ে তিনি বললেন, হে

রসূলুল্লাহ (স.) আপনার কাছে সব রকমের লোক আসা যাওয়া করছে। এদের মধ্যে ভালো লোকও রয়েছে, মন্দ লোকও রয়েছে। আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিন।

কোরআনে পর্দার বিধান

রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব পছন্দ করলেন কিন্তু তিনি আসমানী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) চাচ্ছিলেন তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত হোক। তিনি চাচ্ছিলেন যে, রসূল (স.) নিজেই তার ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করুন। অথচ রসূল (স.) চাচ্ছিলেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে ফয়সালা আসুক। তিনি ছিলেন নবী। কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করা তাঁর পছন্দনীয় ছিলো না। ওমর (রা.) ছিলেন উম্মত। তার মধ্যে নবীর মতো ধৈর্য ছিলো না। তিনি নবুয়তের মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছুতে পারেন। এমনি করে সময় যাচ্ছিলো। একদিন নবী সহধর্মিনী হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.) কোনো এক প্রয়োজনে বাইরে বেরোলেন। হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন বয়স্কা মহিলা। তবু তার পর্দাহীন অবস্থায় বাইরে বের হওয়া হযরত ওমর (রা.)-এর পছন্দ ছিলো না। হযরত সাওদাকে (রা.) পর্দাহীন অবস্থায় বাইরে দেখে হযরত ওমর (রা.) উচ্চস্বরে বললেন, হে সাওদা, আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি।

এ ধরনের কথা নবী সহধর্মিনীকে বলা হযরত ওমর (রা.) ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। হযরত ওমর (রা.) একথা দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, নবী সহধর্মিনীদের বাইরে বের হওয়া শোভনীয় নয়। যদি বের হতেই হয় তবে পর্দা করে বের হওয়া আবশ্যক। হযরত ওমর (রা.) মনে প্রাণে চাচ্ছিলেন যে, যথাশীঘ্র পর্দার বিধান নাযিল হোক।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত ওমর (রা.)-এর আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করলেন। কোরআনের আয়াত নিয়ে জিবরাইল (আ.) এলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্যে নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং ভোজন শেষে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়কে পাক সাফ রাখার জন্যে অধিকতর পবিত্র।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৩)

উপরোক্ত আয়াত শরীয়তের বিধান হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ক্ষেত্রে এই বিধান রক্ষাকবচ হিসেবে কাজে আসবে। মুসলমানদের ইযযত-আবরু, মান-সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা লজ্জা-শরমের তোয়াক্কা করে না, বিবেক যাদের অন্ধ হয়ে গেছে তারাই এই আয়াতের বিধানকে উপেক্ষা করতে পারে। মানব সমাজে সব ধরনের লোক রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে জীবন যাপনের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যারা সেই সীমা লংঘন না করে তারা শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করে।

পর্দার বিশেষত্ব

পর্দার বিধান সম্পর্কে প্রথমে একথা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, পর্দা বিরোধীরা পর্দা সম্পর্কে ভ্রান্ত চিত্র প্রকাশ করেছে। পর্দা শুধু নারীকে আপাদমস্তক ঢেকে রাখা এবং ঘরের কোণে বন্দী করে রাখার নাম নয়। পর্দা মানে এটা নয় যে, নারী কোথাও বেরুতে পারবে না। পর্দা হচ্ছে নারীর সম্মানজনক উপায়ে ছতর আবৃত করা। পর্দা হচ্ছে নারীর শালীন পোশাক পরিধান করা এবং নিজের

সৌন্দর্য পরপুরুষ থেকে গোপন রাখা। তার সৌন্দর্যে যেন এমন কারো দৃষ্টি না পড়ে যা ফেতনার কারণ হয়ে পড়ে।

ভালো-মন্দ আপন-পর সবার জন্যে ঘরের দরোজা খুলে রাখাও নারীর জন্যে বৈধ নয়। স্বামী পছন্দ করে না এমন লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়া উচিত। নাচে গানে মজলিস মাতিয়ে রাখা, নারীদের পর্দার মধ্যে বন্দী করা এবং পর্দার ভেতরে নারীদের জন্যে সবকিছু বৈধ করে দেয়াও পর্দা নয়। পর্দা শাব্দিক এবং পারিভাষিক সকল অর্থেই জরুরী। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের সমাজে লজ্জাশীলা এবং সম্মানিতা মহিলাদের জন্যে পর্দা একদিকে সম্মান বজায় রাখা অন্যদিকে সৌন্দর্য বজায় রাখার উত্তম উপায়। পর্দা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের আলোচনা সমালোচনা মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামের শিক্ষার সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

ইসলামে নারীর উচ্চ মর্যাদা

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের দুরবস্থা দ্বীনী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম নারীদের মর্যাদা ও সম্মান পাশ্চাত্যের অনুকরণের মধ্যে কিছুতেই নিহিত নয়। পাশ্চাত্যের আদর্শে জীবন যাপনের মধ্যে নারীর স্বাধীনতা রয়েছে এমনও বলা যাবে না। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার কারণে এবং ইসলামী চরিত্র ও মূল্যাবোধের ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব পোষণের কারণে মুসলমানরা অবমাননা ও যিল্লতের সম্মুখীন।

ইসলাম চায় না কোনো মুসলিম নারী মূর্খ থাকুক। ইসলাম ও মূর্খতা পরস্পর বিরোধী। প্রতিটি মুসলিম নরনারীর ওপর জ্ঞানার্জন ইসলাম ফরয করেছে। নারীদের অধিকার সংরক্ষণেও ইসলাম অন্য সকল আদর্শের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পুরুষদের জন্যে স্বর্ণ এবং রেশম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু নারীদের জন্যে এর অনুমতি রয়েছে। নারীদেরকে উত্তরাধিকার-এর অধিকার দিয়েছে এবং নারীকে তার অর্থসম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যয় করার অনুমতি দিয়েছে। নিজের অর্থসম্পদ ইচ্ছেমতো ব্যয় করার জন্যে স্বামীর অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন নেই। চৌদ্দশত বছর আগে ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে পশ্চিমা সমাজ কয়েক দশক আগে পর্যন্ত সেসব অধিকারের কথা চিন্তাও করতে পারেনি।

ইসলাম নারীকে সৌন্দর্য রক্ষার, সৌন্দর্য চর্চার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য তার স্বামীর জন্যে, অন্য কারো জন্যে নয়। মানুষ হওয়ার কারণে ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে সমান মর্যাদা দিয়েছে এবং কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। উম্মুল মোমেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ হাতের কাজ জানতেন। চামড়া দাবাগত করে তার ওপর মনোরম নকশা এঁকে তিনি অর্থোপার্জন করতেন। নিজের উপার্জিত অর্থ তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) স্ত্রী ব্যবসা করতেন এবং উপার্জিত অর্থ স্বামী ও সন্তানদের জন্যে ব্যয় করতেন। হযরত ওমর (রা.) মদীনার বাজারের একাংশ নারীদের বেচাকেনার জন্যে আলাদা করে দিয়েছিলেন এবং তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কোনো কোনো ফকীহ মহিলাদের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্যে মহিলা বিচারক নিয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতেন, আহতদের সেবা করতেন, রোগীদের চিকিৎসা করতেন।

বর্তমান যুগে পর্দাহীনতাকে উন্নতির উপায় মনে করা হয়। উন্নত দেশসমূহে নারীরা প্রয়োজনে নয় বরং শখের কারণে ঘর থেকে বাইরে বেরোয়। তারা চায় নিজেদের সৌন্দর্যের ও দেহের প্রদর্শনী হোক। এতে তারা কোনো লজ্জা অনুভব করে না বরং গর্ব অনুভব করে।

মহিলা সাহাবীরা প্রয়োজনের সময়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধও করেছেন। এ ধরনের ঘটনা আমাদের ইতিহাসে অনেক রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মুসলিম মহিলারা বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হযরত আয়শা (রা.) ছিলেন জ্ঞানের আধার। বিশিষ্ট সাহাবারাও শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতেন। ফেকাহ সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। তার মতামত ছিলো নির্ভরযোগ্য। হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বলতেন, ফেকাহ, চিকিৎসা এবং কাব্য ক্ষেত্রে হযরত আয়শার (রা.) চেয়ে বড় জ্ঞানী আর অন্য কাউকে দেখিনি।

ইসলাম নারীকে সব অধিকারই দিয়েছে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণের মধ্যেই মুসলিম নারীর মর্যাদা, সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতা বিদ্যমান। নারী জাতিকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভালো জানেন কিসে তাদের ভালো আর কিসে মন্দ রয়েছে। কিসে তার লাভ আর কিসে তার ক্ষতি রয়েছে।

মোনাফেকদের জানাযার নামায ও হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত

নেফাক একটি ধ্বংসাত্মক রোগ এবং নিকৃষ্টতম দুষ্কৃতি। দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্যে এটা নগ্ন লজ্জার বিষয় এবং আখেরাতের জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হবে। এই নিকৃষ্টতম চারিত্রিক রোগের কারণে মানুষ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের গুহায় নিক্ষিপ্ত হবে। মোনাফেক নেতা ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। সে মারা যাওয়ার পর তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর আবেদনে রসূল (স.) আব্দুল্লাহর জানাযার নামায পড়াতে যান। মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহর পুত্র আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। রসূল (স.) মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহর জানাযার নামায পড়াতে রওয়ানা হলে হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-এর জামার কোণা ধরে তাঁকে বিরত রাখার জন্যে চেষ্টা করেন। রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে বিষয়টিকে ঐচ্ছিক করেছেন। বলেছেন, 'এস্তাগফের আও লা তাসতাগফের লাহুম' অর্থাৎ আপনি মাগফেরাত কামনা করেন অথবা না করেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেতো পাক্কা মোনাফেক ছিলো। রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিষেধ উপেক্ষা করে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়াতে যান এবং পড়ান। হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-কে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু রসূল (স.) ছিলেন রহমাতুললিল আলামীন। মানুষের প্রতি ভালোবাসার মমতায় তাঁর অন্তর ছিলো পরিপূর্ণ। রসূল (স.) জানাযার নামায পড়ানোর পর আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে কোরআনে পরিষ্কার ঘোষণা দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্যে জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-কে অস্বীকার করেছিলো ববং পাপাচারী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে।' (সূরা তওবা, আয়াত ৮৪)

হযরত ওমর (রা.) মোনাফেকদের মোটেই পছন্দ করতেন না। নেফাকের প্রতি তার আন্তরিক ঘৃণা এবং শত্রুতা ছিলো। নেফাক এমন মারাত্মক রোগ যে রোগ মানুষের সকল ভালো গুণ এবং মানবিক চরিত্র কলুষিত করে দেয়। হযরত ওমর (রা.) চাচ্ছিলেন যে, ইসলামী সমাজে মোনাফেকদের কোনো সম্মান যেন না করা হয়। এটা ছিলো তার মনের আকাংখা। আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-এর আকাংখা অপূর্ণ রাখেননি। কোরআনে এ সম্পর্কিত নির্দেশ নাযিল করেন যে, রসূল (স.) যেন কোনো মোনাফেকের জানাযার নামায না পড়ান এবং তাদের কবরের পাশে না দাঁড়ান।

মদ পানে নিষেধাজ্ঞা এবং হযরত ওমর (রা.)

ইসলাম মদ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। মদ নিষিদ্ধ হওয়ার একটি ইতিহাস রয়েছে। মদ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ হয়েছিলো। ইসলামের শুরুতে একজন মুসলমান মদ খেয়ে নামায আদায় করতে

যাওয়ার কারণে কোরআন তেলাওয়াত এলোমেলো করে ফেলেছিলো। এতে মুসলমানরা ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তখন এই আয়াত নাযিল করেন 'হে মোমেনরা মদ্যপায়ী অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো।' (সূরা নেসা, আয়াত ৪৩)

এই নির্দেশে মদ যদিও পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর জাগ্রত বিবেক তাকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, মদ প্রকৃতপক্ষে এক সময় নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে যে, মদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ হওয়ার আগেই হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই মদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেবেন। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দান করে ধন্য করো। আল্লাহ তায়ালা এরপর সূরা মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, 'হে মোমেনরা মদ, জুয়া, মূর্তি, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা ওসব বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তানতো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়। আর তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না'? (সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০-৯১)

আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, কোরআনে 'ফাহাল আনতুম মুনতাহুন' কথার মধ্যে দৃঢ়তা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ধমক দিয়ে বলেছেন, 'তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না'? এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে পরোয়ারদেগার আমরা নিবৃত্ত হয়েছি।

নবী সহধর্মিনীদের নসিহত

একবার রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের সাথে কোনো এক বিষয়ে রসূল (স.)-এর মনোমালিন্য হলো। হযরত ওমর (রা.) খবর পাওয়ার পর নবী সহধর্মিনীদের কাছে গেলেন এবং রূঢ় ভাষায় তাদের সমালোচনা করলেন। তিনি রসূল (স.)-এর প্রতি অসন্তুষ্টির পরিণাম সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীদের সতর্ক করলেন। তিনি বললেন, তোমাদেরকে রসূল (স.)-এর অনুগত হতে হবে। যদি তা না করো তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী রসূল (স.)-কে ব্যবস্থা করে দেবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি খবর পেয়েছি রসূল (স.)-এর কয়েকজন স্ত্রীর সাথে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছে এবং ঘরের পরিবেশ তিক্ত হয়ে উঠেছে। এই খবর পাওয়ার পর আমি রসূল (স.)-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্ত্রীদের বুঝিয়েছি তারা যেন রেসালতের হক আদায় করেন এবং রসূল (স.)-এর ভালো-মন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আমি আরো বলেছি, যদি তোমরা রসূল (স.)-কে কথায় ও কাজে কষ্ট দাও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শাস্তি দেবেন। তাছাড়া তোমাদের চেয়ে ভালো স্ত্রী রসূল (স.)-কে ব্যবস্থা করে দেবেন। রসূল (স.)-এর একজন স্ত্রীকে এসব কথা বলার পর তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, ওমর তোমার সাহসতো কম নয়। তুমি রসূল (স.)-এর ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছো, তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছো। রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের নসিহত করার জন্যে কি রসূলই যথেষ্ট নন? আল্লাহ তায়ালা এরপর সূরা তাহরীমের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন। 'যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক শীঘ্রই তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী; যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, এবাদাতকারী, সিয়াম পালনকারী, হোক তারা অকুমারী এবং কুমারী।' (সূরা তাহরীম, আয়াত ৫)

এ আয়াতের শানে নুযুলে মোফাসসেররা লিখেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্যের সমর্থনে এই আয়াত নাযিল করেন।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত

বদরের যুদ্ধে পরাজিত কাফেররা মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে দড়িতে বেঁধে মদীনায় নেয়া হচ্ছিলো। রসূল (স.) তাদের ব্যাপারে সাহাবাদের মতামত চাইলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবারা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার পক্ষে মতামত দিলেন। রসূল (স.) সাহাবাদের মতামত নেয়ার পর হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত চাইলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মতামত আবু বকরের চেয়ে ভিন্ন। আমার মতে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা হোক। আমার আত্মীয়দেরকে আমার হাতে দেয়া হোক। তেমনি অন্যান্য মুসলমানদের কাছের আত্মীয়দের তাদের হাতে দেয়া হোক। আমরা তাদের হত্যা করবো। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ঈমানের পরিচয় দেয়ার এটাই সুযোগ। এতে আল্লাহ তায়ালা বুঝবেন যে, আমরা কাফেরদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না। রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত প্রত্যাখ্যান করলেন। আবু বকর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবাদের মতামত গ্রহণ করলেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দীদের রাখা কোনো নবীর জন্যে সংগত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ তায়ালা চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (এর বৈধতার ব্যাপারে) আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো সেজন্যে তোমাদের ওপর মহা শাস্তি আপতিত হতো। (সূরা আনফাল, আয়াত ৬৭-৬৮)

বদরের যুদ্ধে বন্দী অমুসলিমদের হযরত ওমর (রা.) হত্যা করতে চেয়েছিলেন কেন? তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এসব অমুসলিম মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারা প্রভাবশালী। ওদের যদি নিশ্চিহ্ন করা যায় তাহলে ইসলামের শত্রুদের একাংশই নির্মূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমরকে (রা.) উচ্চমানের বুদ্ধিবৃত্তি এবং দূরদর্শিতা দান করেছিলেন। তার কাছে ইসলামের আদর্শ এবং ঈমান ছিলো সর্বাগ্রগণ্য বিষয়। এখলাছ এবং ঈমানের ওপর অর্থসম্পদ বা আত্মীয়তা প্রাধান্য পাবে এটা তিনি কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এ কারণেই তিনি কাফেরদের শক্তি খর্ব করে দিতে এবং তাদের দর্প চূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতামত পছন্দ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রসূল (স.) আমার মতামত গ্রহণ করেননি, আবু বকর (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরদিন সকালে আমি হুযুর আকরামের (স.) কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি উভয় বুযুর্গ কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এবং আপনার ছুর পর্বতের গুহার বন্ধু কাঁদছেন কেন। আমিও আপনাদের সাথে কান্নায় শামিল হতে চাই। রসূল (স.) বললেন, মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর যে শাস্তি নাযিল করতে চেয়েছিলেন সেই শাস্তি আমাকে দেখানো হয়েছে। সেই শাস্তি সামনের ওই গাছের চেয়েও কাছে এসে পড়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেই শাস্তি নিজের করুণায় সরিয়ে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের উপরোল্লেখিত আয়াত নাযিল করেন।

সত্য ও ন্যায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হযরত ওমর (রা.)

পর্যায়ক্রমে কোরআনের আয়াত নাযিল হচ্ছিলো এবং মুসলমানদের সামনে সেইসব আয়াত তেলাওয়াত করা হচ্ছিলো। মুসলমানরা নীরবে সেইসব আয়াত শুনতেন এবং শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করতেন। আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী তারা আমল করতেন। নিজেদের জীবনে আয়াতের শিক্ষার

প্রতিফলন ঘটাতেন। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যাপার ছিলো বিস্ময়কর। আয়াত নাযিল হওয়ার আগেই তিনি আয়াতের সারমর্ম উপলব্ধি করতেন। সূরা মোমেনুন এর ১৪ নং আয়াত নাযিল হলো। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাক'-এ অতপর 'আলাক'কে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে। অতপর অস্থিপিঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কৃতজ্ঞচিত্তে উচ্চারণ করলেন, 'ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানাল খালেকিন'– অর্থাৎ অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কতো মহান। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াতের পরবর্তী অংশে হযরত ওমর (রা.)-এর উচ্চারিত শব্দগুলোই সংযোজন করে দিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.) এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, বহু সময়ে তার মনে মুসলমানদের কল্যাণধর্মী আকাংখা জাগ্রত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা সেই আকাংখা পূরণ করেন। কোরআনের আয়াত হিসেবে সেই আকাংখা পূরণ হতো। সেই আয়াতের নির্দেশনা অনুসরণ সকল মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার রসূল (স.) মাদলাজ নামে একটি বালককে হযরত ওমরকে (রা.)-কে ডেকে আনার জন্যে পাঠালেন। হযরত ওমর (রা.) সেই সময় ঘরের দরোজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলেন। বালক বিনা দ্বিধায় মুখে মুখে লাগানো দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে হযরত ওমরকে (রা.) সালাম করলো। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন গভীর ঘুমে, এ জন্যে তিনি টের পেলেন না। হযরত ওমর (রা.) পরে বিষয়টি জেনে ফেলেন। সম্ভবত সেই সময় তিনি অনাবৃত অবস্থায় ঘুমুচ্ছিলেন। বালকের তার ঘরে প্রবেশ এবং তাকে ডাকার কথা জেনে তিনি বললেন, আমি মনেপ্রাণে চাই আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের ঘুমের সময়ে আমাদের সন্তান এবং আমার ক্রীতদাসদেরকে অনুমতি ছাড়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন।

হযরত ওমর (রা.) একথা বলার পর রসূল (স.) এর কাছে গেলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর যাওয়ার আগেই মহান আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখো তখন এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময়ে তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্যে এবং তাদের জন্যে দোষ নেই। তোমাদেরকে তো অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' সূরা নূর, আয়াত ৫৮)

হযরত ওমর (রা.)-এর আকাংখা কোরআনের অংশে পরিণত হয়েছে। সেই কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। সমাজ ব্যবস্থায় কোরআনের সেই শিক্ষা মেনে চলা অত্যাবশ্যকীয়। এর মধ্যে বহু হেকমত এবং কল্যাণ রয়েছে। সুচারিত্রিক মানুষেরা এই শিক্ষা ও আদর্শের মধ্যে নিজেদের জীবন চলার পথের পাথেয় খুঁজে পান। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমরা ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দূরে অবস্থান করছি। নিজেরাও ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করি না, অন্যদেরও সেই আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি না। আমরা যদি ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ মেনে চলতাম তবে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হতাম। দ্বীনের শেখানো আদব- কায়দাকে আমরা তুচ্ছ মনে করি এবং দূরে ফেলে রাখি। ফলে বহু রকম সামাজিক

বিশৃংখলা দেখা দেয়। আমরা অমুসলিমদের অনুকরণ অনুসরণ করি। আমাদের কাছে অনুসরণযোগ্য এমন আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে যে রকম উন্নত আদর্শ বিশ্বের অন্য কোনো জাতির কাছে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অপমানিত লাঞ্ছিত। আমরা নিজেরা পরিবর্তিত হওয়ার চিন্তা না করা পর্যন্ত আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না। সূরা রা'দ-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সেই জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে।'

আমাদের দ্বীন যে মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটি অনেক উন্নত। আমরা যদি সেই সমুন্নত মাপকাঠি পর্যন্ত পৌঁছুতে নাও পারি তবু তার কাছাকাছি পৌঁছার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। দ্বীনে হক ইসলামে প্রত্যেকেরই জবাবদিহির ব্যবস্থা রয়েছে। নিজের অবস্থা, অবস্থান, মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি অনুযায়ী প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানেরই অন্যের দিকে তাকানোর আগে নিজের দিকে তাকাতে হবে এবং ফরয ওয়াজেব পূর্ণ একাগ্রতার সাথে পালন করতে হবে। আমলই হচ্ছে আসল জিনিস। অন্যের সমালোচনা না করে আমলের মাধ্যমে নিজের উত্তম কাজের নমুনা পেশ করতে হবে। কথা ও কাজের মধ্যে আমাদেরকে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। আমরা যদি শুধু ভালো ভালো কথাই বলতে থাকি অথচ আমলের খাতা শূন্য থেকে যায় তবে সেই অবস্থা হবে দুঃখজনক। বুদ্ধিমান এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষেরা কখনোই এরূপ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হতে পারে না, পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই তবে কথা এবং কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং ছোটখাট আমলও নিয়মিতভাবে গভীর মনোযোগের সাথে করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করো না তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।' (সূরা সাফ, আয়াত ২, ৩)

মদীনায় একবার এ মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, রসূল (স.) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এ খবর শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রসূল (স.) বললেন, ওকথা মিথ্যা। এ খবর পাওয়ার পরই হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর দরোজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, রসূল (স.) তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'যখন শান্তি অথবা শংকার কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন (সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই) তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রসূল অথবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনতো তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তবে এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারতো। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া অধিকাংশ শয়তানদের অনুসরণ করতো।' (সূরা নেসা, আয়াত ৮৩)

কোরআনের এই আয়াত শুনে হযরত ওমর (রা.) খুব খুশী হলেন। কেননা রসূল (স.) এর স্ত্রীদের তালাক না দেয়া সম্পর্কে মনে মনে সঠিক ধারণাই করেছিলেন।

কোরআনের আয়াত নাযিল হলে হযরত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবারা রসূল (স.)-এর কণ্ঠেই প্রথম সেই আয়াত শুনতেন। বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিশেষ কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল হলে হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াত শোনার পরই রসূল (স.)-এর কাছে প্রশ্ন করতেন। তিনি জানতে চাইতেন নির্ধারিত সেই ঘটনা এবং বিষয় পর্যন্তই উক্ত আয়াতের বক্তব্য সীমাবদ্ধ নাকি ওই বক্তব্য সার্বজনীন। হযরত ওমর (রা.)-এর মন কোরআনের সাথে সব সময় বাঁধা থাকতো। রসূল (স.)-এর কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব পেয়ে এবং মুসলমানদের কল্যাণের কথা শুনে তিনি সব সময়ই খুশী হতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, ওমর ইবনে গোরার নামে এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক মহিলাকে কথা দিয়েছি যে তাকে খেজুর দেবো এবং একটি ঘর দেব। এরপর আমি মহিলার সাথে নির্জনবাস করেছি, তবে তার লজ্জাস্থান থেকে কোনো ফায়দা উঠাইনি। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন তারপর কি করেছো? সাহাবা বললেন, আমি গোসল সেরে নামায আদায় করেছি। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন, দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা নামায কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নেকীসমূহ পাপকে বিলীন করে দেয়। যাও আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটা সেই সময়ের কথা যখন জাহেলী যুগের রসম অর্থাৎ নারী-পুরুষের মধ্যকার সাময়িক চুক্তি পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই আয়াত ওই বিশেষ ব্যক্তির জন্যে এবং ওই ঘটনার মধ্যেই কি নাযিল হয়েছে নাকি ওই আয়াতের বক্তব্য সার্বজনীন? রসূল (স.) বললেন, আয়াতের বক্তব্য সার্বজনীন। অর্থাৎ কেউ যখন কোনো পাপ করে ফেলে, সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং নেকী দ্বারা পাপ ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।

আমরা যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হই এবং আল্লাহর ভয়ে আমাদের মন পূর্ণ হয় তবে আমাদের আবেগ-অনুভূতিতে আল্লাহ তায়ালার প্রেম জায়গা করে নেবে। আমাদের মন নম্র কোমল হবে। মনযিল নির্ধারিত হবে। আমাদের পথ উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আমরা এমন নেক আমলের যোগ্যতা অর্জন করবো যেসব আমল আমাদের আমলনামায় উজ্জ্বল হয়ে আমাদের পরকালীন জীবনে সাফল্যের নিশ্চয়তা দেবে। সেই সাফল্য মানুষের দৃষ্টিতে পার্থিব সাফল্যের চেয়ে উত্তম, ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভের চেয়ে তা উত্তম, পার্থিব জগতের সাময়িক সাফল্যের চেয়ে বহু বহু গুণে উত্তম। কেননা মোমেন বান্দা এসব সাফল্যকে কোনো গুরুত্ব দেয় না। তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে আখেরাতের সাফল্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

হযরত ওমর (রা.) আল্লাহভীতি এতো বেশী অর্জন করেছিলেন যে, সেই কারণে আল্লাহর নৈকট্যলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তার পরবর্তী সময়ে এমন মর্যাদা লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ যে দরোজা দিয়ে প্রবেশ করে হযরত ওমর (রা.) এই মর্যাদা লাভ করা করেছিলেন সেই দরোজা আজও খোলা আছে এবং সব সময় খোলা থাকবে। যে ব্যক্তি এখনো অন্তরে সত্যিকার খোদাভীতি লালন করে এবং নিয়মিত আত্মসমালোচনা করতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিছুতেই বন্ধুহীন এবং অসহায় অবস্থার সম্মুখীন করবেন না। এ ধরনের মানুষও পাপ করতে পারে, অন্যায় করে ফেলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে পাপের সাগরে না ডুবিয়ে সংশোধিত এবং পরিশুদ্ধ হওয়ার উপায় করে দেন। তার অন্তরকে আলোকিত করেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং অলংঘনীয়। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, ঈমানের পথ চিনে নিয়ে সেই পথে চলা অব্যাহত রাখবে, বুদ্ধিমানের মতো সেই পথ আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে সম্মানিত করবেন এবং আখেরাতের জীবনে চিরসুখের জান্নাত দিয়ে সফলকাম করবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার এবাদাত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।' (সূরা নূর, আয়াত ৫৫)

হযরত ওমর (রা.) বলতেন, এতিমের অর্থসম্পদের ব্যাপারে তার অভিভাবকের যেরূপ দায়িত্ব রয়েছে, বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থসম্পদের ব্যাপারেও আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক তেমনি। আমি যদি অভাবগ্রস্ত হই তবে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ধার নেবো। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সেই অর্থ পরিশোধ করবো। যদি সম্পদশালী হই তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত

৫

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত

হযরত ওমর (রা.)-এর জীবন কথা আলোচনা করতে গিয়ে তার খেলাফতকাল সম্পর্কে আলোকপাত না করলে সে আলোচনা কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারে না। ওমর (রা.) ছিলেন আল্লাহর ওলী। ওলীদের শাসক হওয়া কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আমি মনে করি জনকল্যাণ এবং বৃহত্তর জনস্বার্থে আল্লাহর ওলীদের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত থাকা উত্তম। ওমর (রা.)-এর শাসনকালের আলোচনা শুধু তার গুণকীর্তনের জন্যেই আমি করবো না, কারণ আমি মনে করি আমি যতোই লিখি না কেন তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ শেষ হবে না। এ রকম ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও আমি হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকাল সম্পর্কে আলোকপাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনটি কারণে আমি তার খেলাফতকাল সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। প্রথমতঃ আমি আল্লাহর এবাদাত গোযার বান্দা হওয়ার চেষ্টা করছি। এ ক্ষেত্রে ওমর হচ্ছেন উত্তম আদর্শ। তার অনুসরণ করে মনযিলে মকসুদে পৌছুতে পারি। দ্বিতীয়ঃ হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি আমার ভালোবাসা প্রকাশ করবো। তৃতীয়তঃ এই লেখার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করি।

মানব জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে শাসনকর্তা এবং মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর সমতুল্য তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পৌছার মতো কোনো ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এতো বিরাট যে, কোনো কোনো অমুসলিম তো বলেই ফেলেছেন যে, আসলে ওমর নামে ইতিহাসে কেউ ছিলেন না। মুসলমানরা ওমর নামে একটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছে। কারণ একজন মানুষের মধ্যে এতো রকমের গুণের সমাবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকাল ছিলো স্বল্পস্থায়ী। কতোই যে ভালো হতো যদি আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকাল আরো দীর্ঘ হতো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালের মতো খেলাফতকাল অন্য কারোই ছিলো না। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রসূল (স.)-এর ছুর পর্বতের গুহার বন্ধু, তার পরামর্শদাতা, সত্যবাদী এবং নীতিবাদী।

রসূল (স.)-এর ওফাতের পর দ্বীনের ওপর নানাদিক থেকে ফেতনা সৃষ্টি হয়েছিলো। হযরত আবু বকর (রা.) সেই ফেতনা নির্মূল করে দ্বীনকে শক্তিশালী করেছিলেন। দুর্বল ঈমানের লোকদের ঈমান শক্তিশালী হয়েছিলো, হঠকারী বিশ্বাসঘাতকদের শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামের উজ্জ্বল সত্য সবার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। রসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওপর যে কাজেরই দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। আম্বিয়ে কেরাম ছাড়া সকল মানুষের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। রসূল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত ওমরসহ সকল মুসলমান বিচলিত হয়েছিলেন। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেই

কঠিন দুঃসময়ে হযরত আবু বকর (রা.) কোরআনের আয়াত পাঠ করে সবাইকে জানিয়েছিলেন যে, মোহাম্মদ (স.) ছিলেন অন্যান্য রসূলদের মতো একজন মানুষ। আল্লাহ তায়ালা চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তিনি এখনো আছেন। ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.) মোরতাদ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেহাদ করে ইসলামকে শক্তিশালী করেছিলেন। মোরতাদ মোকাবেলার পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে কি না এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানরাও শঙ্কিত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) সেই কঠিন সময়ে হযরত ওমরকে (রা.) ধমকের সুরে বলেছিলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতে তো বীর পুরুষ হিসেবে তোমার খ্যাতি ছিলো, আজ কেন তুমি এমন কাপুরুষ হয়ে গেলে?

ওসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে সেনাদল

হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর প্রতি এমন গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন যার কোনো তুলনা নেই। আজ চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, রসূল (স.)-এর ওফাতের পর মোরতাদদের ফেতনা সমগ্র আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সেই কঠিন সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) সাহস হারাননি। রসূল (স.) তার জীবদ্দশায় ওসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে একটি সেনাদল গঠন করেছিলেন। একটি অভিযানে সেই সেনাদল পাঠানোর জন্যে রসূল (স.) সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। ওসামা ছিলেন বয়সে নবীন। রসূল (স.)-এর ওফাতের পর প্রবীণ সাহাবারা মতামত দিলেন যে, ওসামার জায়গায় যোগ্য সাহসী কোনো সেনা নায়ককে অভিযানের দায়িত্ব দেয়া হোক। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ রসূল (স.)-এর মনোনীত সেনাদল এবং সেনাপতিকে আমি বাধা দেবো না, পরিবর্তনও করবো না। যদি ভয়ংকর কোনো বন্য জন্তু এসে আমাকে এবং মদীনার অধিবাসীদের খেয়ে ফেলে তবু রসূল (স.)-এর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়োচিত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় যদি পাওয়া না যেতো তবে মোরতাদরা ইসলামের মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। এমন হওয়াও অসম্ভব ছিলো না যে, রসূল (স.)-এর ওফাতের পরপরই দ্বীন ইসলাম শেষ হয়ে যেতো। সেই কঠিন সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) মদীনার অলিতে গলিতে নিজেই এই আহ্বান জানিয়েছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা জেহাদের জন্যে বের হও। মোরতাদদের মূলোৎপাটন করো। রসূল (স.)-এর সময় যেভাবে যাকাত আদায় করা হতো সেই নিয়ম লংঘন করে কেউ যদি আজ যাকাত হিসেবে পাওনা একটি বকরির দড়িও দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জেহাদ করবো। সময়োচিত গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তের পর মোরতাদ এবং যাকাতদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী এবং হযরত আবু বকর (রা.)

হোদায়বিয়ার সন্ধিতে রসূল (স.)-এর স্বাক্ষরের পর সাহাবায়ে কেরাম সন্ধির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারেননি। কোরায়শ প্রতিনিধি মোহাম্মদ নামের সাথে রসূলুল্লাহ কথাটি লেখায় আপত্তি তুললেন। রসূল (স.) রসূলুল্লাহ সন্ধির শর্ত লেখক হযরত আলীকে (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ কথাটি মুছে দাও। হযরত আলী (রা.) অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন, কিভাবে আমি এই শব্দ মুছতে পারি? রসূল (স.) পরে নিজ হাতে সেই শব্দ মুছে দেন। সন্ধির শর্তাবলীতে কোনো মুসলমানই খুশী হননি। হযরত ওমর (রা.) ক্রুদ্ধভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতে এবং ওদের নিহতরা কি দোযখের অধিবাসী নয়? হযরত আবু বকর (রা.) শান্ত ভাবে বললেন, কেন নয়। হযরত ওমর (রা.) ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমরা কেন ওই ঘৃণ্য লোকদের কাছে নতি স্বীকার করে চুক্তি করবো? আমরা কেন ওমরাহ না করে

চলে যাবো? কেন ওদের এবং আমাদের মধ্যে তলোয়ার ফয়সালা করবে না? সব কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওহে খাত্তাবের পুত্র, তিনি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে কিছুতেই বিফল হতে দেবেন না।

সত্য ও ন্যায়ের পথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর অগ্রাধিকার

হযরত আবু বকর (রা.) নিজের অর্থ সম্পদ একাধিকবার আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিলেন। নিজের অর্থ ব্যয় করে দুর্বল অসহায় মুসলমান, দাস-দাসীদের ক্রয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এসব ছাড়াও তিনি সিদ্দিক উপাধি পেয়েছিলেন। ছূর পর্বতের গুহায় রসূল (স.)-এর সাথী ছিলেন এবং রসূল (স.)-এর হিজরতের পুরো পথের সাথী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) বারবার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবুকের যুদ্ধের সময় হযরত ওমর (রা.) তার ধন সম্পদের অর্ধেক রসূল (স.)-এর সামনে হাযির করেন। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন পরিবার পরিজনের জন্যে কি রেখে এসেছো ওমর? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাদের জন্যে অর্ধেক ধনসম্পদ রেখে এসেছি। কিন্তু আবু বকর (রা.)-এর ব্যাপার ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রসূল (স.) জিজ্ঞেস না করলে তিনি বলতেন না।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর আনীত দ্রব্যাদি দেখে রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন পরিবার পরিজনের জন্যে কি রেখে এসেছো আবু বকর? জবাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, ওদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর ভালোবাসা রেখে এসেছি। ধন-সম্পদ সব জেহাদের জন্যে হাযির করেছি। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে বললেন, হে আবু বকর যখনই নেকীর ক্ষেত্রে আপনার সাথে আমি প্রতিযোগিতা করেছি তখনই আপনার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। (তাফসীরে ইবনে কাসির প্রথম খন্ড)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। সকল মুসলমানকে সমালোচনা করা হলেও আবু বকর (রা.)-কে সমালোচনা করেননি। সূরা তওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো তবে আল্লাহ তায়ালা তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিলো এবং সে ছিলো দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলো সে তখন তার সাথীকে বলেছিলো, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ তায়ালাতো আমাদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা তওবা, আয়াত ৪০)

রসূল (স.)-এর ওপর ওহী নাযিল হতো, রসূল (স.) শুনতেন। একবার হযরত আবু বকর (রা.) জিবরাইল (আ.)-এর কণ্ঠে ওহীর মাধ্যমে আসা কোরআন পাঠ শুনেছিলেন। সেই সময় সূরা কাসাস-এর ৫৬ নং আয়াত নাযিল হচ্ছিলো। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি যাকে ভালোবাসো, ইচ্ছা করলেই তুমি তাকে সৎ পথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন সৎপথ অনুসরণকারীদের'। (সূরা কাসাস আয়াত ৫৬)

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রসূল (স.)-এর ছোটবেলার সাথী। আঠার বছর বয়সে তিনি রসূল (স.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন। সেই সময় রসূল (স.)-এর বয়স ছিলো বিশ বছর। আবু বকর (রা.)-এর বন্ধুত্ব ছিলো বিশ্বাসযোগ্য। রসূল (স.) একমাত্র আবু বকর (রা.) সম্পর্কেই বলেছিলেন, জান-মাল দিয়ে অর্থাৎ শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে আবু বকর বাদে অন্য কেউ আমাকে এতো বেশী এহসান করেননি। রসুল (স.) আবু বকর (রা.)-কে অসামান্য মর্যাদাও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আবু বকরের বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমার উম্মতের মধ্যে অন্য কারো ইমাম হওয়া সমীচীন নয়।

সাহাবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত চারটি বংশধারা

সীরাত রচয়িতারা একটি বিশেষ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমমর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর চারটি বংশধারাই সাহাবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলো। হযরত আবু কোহাফা, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আবদুর রহমান এবং হযরত আতিক ইবনে আবদুর রহমান। আবু বকর (রা.)-এর পিতা, তিনি নিজে, পুত্র এবং পৌত্র। হযরত আবু বকর (রা.) এর মর্যাদা লিখে শেষ করা যাবে না। হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও গৌরব অসাধারণ। তিনি তো ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর আলোচনাও কিছুটা হওয়া দরকার। লাইস ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, সকল নবীদের সাহাবাদের মধ্যে কোনো সাহাবাই হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমমর্যাদায় ছিলেন না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণ রেখে হযরত ওমর (রা.)-এর কথা আমরা আলোচনা করতে পারি। বিশ্বের শাসকদের মধ্যে যে কোনো শাসকেরই আলোচনা করা হোক না কেন, কোনো শাসকই সকল ক্ষেত্রে সফল ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম একমাত্র হযরত ওমর (রা.)। তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিবালোকের মতো সত্য। তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যে সমাজ এবং যে পরিবেশে হযরত ওমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেসব বিবরণ পাঠ করতে বসলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অন্য কোনো শাসক এমন বহুমুখী সাফল্য অর্জন করলে খুশীতে পাগল হয়ে যেতেন কিন্তু আমরা জানি হযরত ওমর (রা.)-এর চিন্তা-চেতনায় কোনই পরিবর্তন আসেনি। সুবিবেচক ঐতিহাসিকরা হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সত্যকথা লিখেছেন এবং তাকে যথাযথ স্থান দিতে কার্পণ্য করেননি। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা যদি ন্যায়নীতির অনুসারী হয়ে কলম ধরেন তবে তারাও হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে পারবেন না।

খেলাফতের পদমর্যাদার গুরুত্ব

হযরত ওমর (রা.) খেলাফতের পদমর্যাদার গুরুত্ব এবং নাজুকতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এটা ছিলো তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত। এই দায়িত্বের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি এ ব্যাপারে নিজেকে ওমর ইবনে খাত্তাব মনে না করে নিজেকে রসূল (স.)-এর খলীফা মনে করতেন। তাঁর কাছে ব্যক্তি ওমরের কোনো গুরুত্ব ছিলো না বরং খেলাফতের সেই পদমর্যাদার গুরুত্ব ছিলো, যার ওপর মুসলমানরা তার হাতে বাইয়াত করেছিলেন। আল্লাহর যমীনে খলীফা আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাঁর ছায়া। ন্যায় বিচারক শাসনকর্তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এসব কাজ করিয়ে থাকেন, যে কাজ ন্যায় বিচারক শাসকের অবর্তমানে কোরআনও করতে পারে না। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে চিন্তায় ও কাজে পরিচ্ছন্নতা, কৌশল এবং ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন। রসূল (স.) বলেছেন, শাসনকর্তা অত্যাচার না করা পর্যন্ত আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে। যখনই শাসনকর্তা অত্যাচারী হয়ে ওঠে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে তার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর (রা.) একথা জানতেন যে, একদিনের ন্যায়বিচার চল্লিশ বছরের এবাদতের সমান। রসূল (স.)-এর এই বাণীও হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে ছিলো যে, কোনো শাসক যদি প্রজাদের ওপর অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি করে সেই শাসক কখনো ইনসাফ করতে পারে না। মোটকথা রসূল (স.)-এর সকল কথাই হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে থাকতো। রসূল (স.)-এর এই কথাও হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে ছিলো যে, শাসনকর্তা আল্লাহর যমীনে তাঁর ছায়া। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সকল মযলুম শাসনকর্তার প্রতি মনোযোগী হয়। তার কাছে ছুটে যায়। শাসনকর্তা যদি ন্যায়বিচার করে তবে তার জন্যে পুরস্কার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রজাদের শোকরিয়া প্রকাশ করতে হবে। যদি শাসনকর্তা যুলুম অত্যাচার করে তবে তার জন্যে শাস্তি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রজাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

একজন মুসলমান শাসনকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) ভালোভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন যে, একজন মুসলমান শাসককে ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে হবে। এতেই রয়েছে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ। হযরত ওমর (রা.) নিজেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে কখনো চিন্তা করতেন না বরং ন্যায়নীতির বাস্তবায়নই ছিলো তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-কে এক বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) উম্মতে মোহাম্মদীকে এক অপরাজেয় অবস্থানে উন্নীত করেছিলেন। সত্য-ন্যায়ের এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে, অসত্য ও অন্যায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসৃত মূলনীতি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মানুষ কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। বলাবাহুল্য, মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসৃত আদর্শের বাইরে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প চিন্তা করা যায় না।

জনসমাবেশে প্রথম ভাষণ

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই হযরত ওমর (রা.) শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে জনসমাবেশে প্রথম ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে লোকসকল! ওহীর ধারাতো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি যে কাজই করবো সেটা তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থা এবং আমল অনুযায়ী করবো। ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের জন্যে আমি শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। গোপনীয় বিষয় এবং অন্তরে সুপ্ত বিষয়ের দায়িত্ব আমি নেবো না। সেটা আল্লাহ তায়ালা এবং বান্দার ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী, নিয়ত অনুযায়ী বান্দার হিসাব নেবেন। যে ব্যক্তি অন্যায় এবং দুষ্কৃতি করবে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা নেবো। অন্যায় এবং অপকর্ম করার পর যদি কেউ বলে যে, আমার মনে ওরকম করার কোনো ইচ্ছা ছিলো না আমি তার এ ওযর গ্রহণ করবো না।

এই মৌলিক নীতি অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। কোরআনের আকারে আল্লাহর বাণী বিদ্যমান রয়েছে। সমকালীন শাসক মানুষের মনের অবস্থা বিবেচনা করে কোনো আদেশ দিতে পারেন না। মনের অবস্থা জানেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কোনো মানুষের গোপনীয় তৎপরতা এবং গোপন ইচ্ছার কারণে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে তাকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে পারেন অথবা সেই শাস্তি পরকালের জন্যে মুলতবী রেখে দিতে পারেন। কেয়ামতের কঠিন দিনে তার কাছ থেকে পুরো হিসাব নিতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রসূল (স.) বলেছেন, আমাকে মানুষের মন চিরে দেখার আদেশ দেয়া হয়নি, বুক ফেঁড়ে গোপন তথ্য জানার জন্যেও বলা হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কৌশল হিসেবেই মানব মনের গোপনীয়তা জানার চেষ্টা না করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা কোনো দোষনীয় বিষয় নয় বরং সুবিচার ব্যবস্থাপনার জন্যে এটা জরুরী। এতে কোনো তিক্ততা নেই, কোনো শূন্যতা নেই। রসূল (স.) বলেছেন, শাসনকর্তা যখন মানুষের গোপনীয় বিষয় উদঘাটনে সচেষ্ট হয় তখন তাদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, হাকেম)

আল্লাহর সাথে রসূল (স.)-এর ওহীর মাধ্যমে যোগাযোগ ছিলো, কিন্তু রসূল (স.) কখনো বাহ্যিক বিষয় ছেড়ে গোপনীয়তা অনুসন্ধান করেননি এবং গোপনীয়তার ভিত্তিতে কোনো বিবাদের মীমাংসা করেননি। স্বাভাবিকভাবেই রসূল (স.)-এর পরবর্তী শাসকবর্গও প্রকাশ্য এবং বাহ্যিক বিষয় বিবেচনা করেই বিচার ফয়সালা করবেন। গোপনীয় বিষয় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ধারণা, আন্দায, অনুমান হারাম বা নিষিদ্ধ। এর ভিত্তিতে ফয়সালা করা হলে কেউই সঠিক

ফয়সালা করতে সক্ষম হয় না। অদৃশ্য বিষয়ের ওপর সওয়াব এবং আযাব দেয়া আল্লাহর ব্যাপার এবং এটা তার একান্তই নিজস্ব বিষয়। এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করা কোনো বান্দারই উচিত নয়।

মোনাফেকদের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রসূল (স.) মোনাফেকদের সাথে যে ব্যবহার করতেন সেটা তাদের বাহ্যিক আচরণ এবং কাজ দেখেই করা হতো। ইসলামের উত্তরাধিকার বিয়ে-তালাকের যাবতীয় নীতিমালা তাদের ওপর প্রযোজ্য হতো। এসব উদাহরণ শাসনে থাকা অবস্থায় কোনো মানুষের গোপন গভীরে কি আছে সে সম্পর্কে জানার দাবী করে ফয়সালা দেয়া কি করে সম্ভব? কেউ যদি এ রকম করেও থাকে সেটা হচ্ছে স্রেফ বাড়াবাড়ি।

অধিকার ও কর্তব্যের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা

মুসলিম মিল্লাতের প্রত্যেক সদস্য অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান যদি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সঠিকভাবে সেই কর্তব্য পালন করে, তবে তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার অনুমতিও নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে তবে তাকে আইনের শাসন থেকে এই অজুহাতে অব্যাহতি দেয়া যাবে না যে তার নিয়ত ভালো ছিলো। নিয়তের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তায়ালা যে, কাউকে শাস্তি দিতে পারেন, পুরস্কারও দিতে পারেন। পার্থিব জীবনে প্রকাশ্য আমল অনুযায়ীই আইনের শাসন প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ফয়সালা দিতে হবে। এই মূলনীতি যদি অনুসরণ করা হয় এবং আইন প্রয়োগকারীরা সে সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে সেনাবাহিনী, পুলিশ, সিআইডির সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন থাকে না। মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্যে দুটি মূলনীতি রয়েছে। একটি হচ্ছে দ্বীন, অন্যটি হচ্ছে আখলাক বা সচ্চরিত্রতা। শাসকদের জন্যে এটা বিশেষ কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে। জনসাধারণ ভয়হীনভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। দ্বীন এবং আখলাক ছাড়া শান্তির আশা সুদূরপরাহত। যার মধ্যে দ্বীন নেই তার মধ্যে কিভাবে চরিত্র থাকবে? যে ব্যক্তি চারিত্রিক দোষে দোষী, দ্বীনের সাথে তার সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহর অস্তিত্ব যে ব্যক্তি জানতে না পারে, তার কাছে কোনো কল্যাণ আশা করা যায় না। দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে অবশ্যই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। রসূল (স.) বলেছেন, মোমেনদের মধ্যে সর্বাধিক কামেল ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি হবে যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।

চরিত্রের মর্যাদা ইসলামে অনেক উঁচু। এ কারণে রসূল (স.) চরিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি বলেন, সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দিবারাত্রি জেহাদে নিয়োজিত ব্যক্তির মতোই মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে। রসূল (স.) আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে সুন্দর চেহারা দান করার পর সুন্দর চরিত্র দ্বারা শোভিত করেন তাকে তিনি দোযখে নিক্ষেপ করবেন না।

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষকে সুন্দর আকৃতি এবং গঠন বিন্যাসে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর চেহারা আল্লাহর বিশেষ দান। চরিত্রের সৌন্দর্যও একমাত্র আল্লাহর রহমতেই পাওয়া যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভালোমন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে মন্দ চরিত্রের চেয়ে বড় কোনো অপরাধ নেই। উন্নত সুন্দর চরিত্র পাপকে এমনভাবে গলিয়ে দেয়, ঠিক যেমন সূর্যের আলোর উত্তাপ বরফকে বিগলিত করে। একইভাবে অসৎ চরিত্র সকল নেক আমলকে ঠিক তেমনি নষ্ট করে। অপর এক হাদীসে রসূলে মকবুল (স.) বলেন, আল্লাহর কাছে অসৎ চরিত্রের চেয়ে বড় কোনো পাপ নেই। একারণেই দেখা যায় অসৎ চরিত্রের কোনো মানুষ একটা পাপ ত্যাগ করলেও পরে অন্য পাপে জড়িয়ে পড়ে।

কোনো ব্যক্তির মধ্যে দ্বীনের বিধি-বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য এবং চারিত্রিক দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেলে শরীয়ত এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা শাসনকর্তার কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল প্রচার মাধ্যম এবং উপায়-উপকরণ নাগরিকদের প্রশিক্ষণ এবং সংশোধনে ব্যয়িত হতে হবে। এতে নাগরিকদের কল্যাণের পাশাপাশি শাসনকর্তাদেরও কল্যাণ রয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে প্রতিটি নাগরিক চারিত্রিক ক্ষেত্রে আদর্শ নমুনায় পরিণত হবে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবে। পুলিশের মাধ্যমে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনেরও প্রয়োজন হবে না। এতে ব্যক্তি এবং সমাজ সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম হবে। ফলে একটি দৃষ্টান্তমূলক সমাজ গঠন সহজতর হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা

হযরত ওমর (রা.) চৌদ্দশত বছর আগে একটি সুস্থ সমাজ কাঠামোর বুনিয়াদী নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছিলেন। শাসকদের অধিকার যেমন থাকে, তেমনি থাকে কর্তব্য। ঠিক একইভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদেরও অধিকার এবং কর্তব্য থাকে। একটি রাষ্ট্র টিকে থাকে জনকল্যাণ এবং আনুগত্যের খুঁটির ওপর। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আনুগত্যের মাধ্যমেই রাষ্ট্র বা সংগঠন টিকে থাকে। আনুগত্য ছাড়া এর অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য ছাড়া কোনো সংস্থা, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো খান্দান টিকে থাকতে পারে না। একটি ইট খুলে পড়লে তার পেছনে অন্যান্য ইটও খসে পড়বে। এমনি করে একটি ভবনের মূল কাঠামোই ধসে যায়। কাজেই মানব সমাজ কিভাবে সংগঠন এবং আনুগত্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে? এ কারণেই দ্বীনের মধ্যে আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদাররা, আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূল (স.)-এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক রয়েছে তাদের আনুগত্য করো। এরপর কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়, সেই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসূল (স.)-এর দিকে ফেরাও। যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালা এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাসী হও'। এটাই সঠিক কর্মপন্থা এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম। বিশ্বের সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, আসমানী সকল শরীয়ত মানুষকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যেই নাযিল হয়েছে। মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে এইসব শরীয়ত মানুষের দুনিয়াবী জীবনকে শান্তিপূর্ণ এবং আখেরাতে সাফল্যের উপকরণের ব্যবস্থা করেছে। এই উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে আনুগত্য। শরীয়তের সকল বিধানের আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ ইহকাল ও পরকালে সাফল্য অর্জন করতে পারে। রসূল (স.) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হে লোক সকল! যেসব বিষয় তোমরা পছন্দ করো সেসব এবং যেসব বিষয় পছন্দ করো না সব কিছুরই আনুগত্য করা তোমাদের জন্যে অত্যাবশ্যক। জেনে রেখো, আদেশ পাওয়ার পর যে ব্যক্তি নাফরমানি করেছে তার কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আদেশ পাওয়ার পর আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বোখারী ও মোসলেম শরীফে সংকলিত একটি হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, 'শাসনকর্তার কোনো কাজ দেখে যদি ব্যক্তিগতভাবে কারো অপছন্দ হয় তবে সেই ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, কেননা জামায়াত বা সংঘ থেকে পৃথক হওয়া বিপজ্জনক। যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে অর্থাৎ কোনো ঐক্যবদ্ধ সংঘ থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেছে এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হিসেবে পরিগণিত হবে।'

রসূল (স.) আরো বলেন, 'আল্লাহর সহায়তা জামায়াতের সাথেই থাকে। জামায়াত থেকে পৃথক হওয়ার পরিণাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে রসূল (স.) বলেছেন, শয়তান হচ্ছে মানুষের জন্যে

নেকড়ে বাঘের মতো। একত্রিত থাকা পশুপাল থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বকরিকে যেমন বাঘ খুব সহজেই ধরে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং মসজিদের সাথে মনের টান রেখে জীবনযাপন করতে হবে।'

সহীহ বোখারীতে শাসনকর্তার আনুগত্য সম্পর্কে রসূল (স.) এর নিম্নোক্ত ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে। রসূল (স.) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের ওপর যদি কোনো ক্রীতদাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় তবু তোমরা তার আনুগত্য করবে। তিনি অন্য এক হাদীসে বলেন, যদি তোমাদের ওপর কোনো ক্রীতদাসকে শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কেতাব মোতাবেক শাসন করে তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আদেশ মেনে চলবে।

আনুগত্য এবং আদেশ শোনা সম্পর্কে রসূল (স.) এর আদেশ-নিষেধ মুসলমানরা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে এবং সেসব সংক্ষরণ করেছে। তারপর সেই আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করছে। একবার রসূল (স.) মেম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) একথা শোনামাত্র যেখানে দাঁড়ানো ছিলেন সেখানে বসে পড়লেন। রসূল (স.) এটা লক্ষ্য করেছিলেন। ভাষণ শেষে রসূল (স.) আব্দুল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্যে আব্দুল্লাহর (রা.) আগ্রহ আরো বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করলেন। অন্য একদিন রসূল (স.) মেম্বরের ওপর বসে সবাইকে বসতে বললেন। ঠিক সেই সময়ে আস ইবনে আসোয়াদ (রা.) মসজিদের দরোজায় এসে পৌঁছেছিলেন। রসূল (স.)-এর আদেশ পাওয়া মাত্র আস সেখানেই বসে পড়লেন। রসূল (স.) মেম্বর থেকে অবতরণের পর হযরত আস (রা.) তাঁর কাছে গেলেন। রসূল (স.) বললেন, হে আস নামাযের সময় তোমাকে তো প্রথম কাতারে দেখা যায়নি। হযরত আস ইবনে আসোয়াদ (রা.) বললেন, আমি মসজিদে প্রবেশের সময় আপনার আদেশ শুনতে পেলাম যে, আপনি বলছেন বসে পড়ো। এই আদেশ শোনার সাথে সাথে আমি বসে গেলাম। একথা শুনে রসূল (স.) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, তুমিতো আস নও বরং তুমি হচ্ছো মুতী। উল্লেখ্য, মুতী শব্দের অর্থ অনুগত।

ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়ার শাসনামলে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। শরীয়ত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ওলামাদের মতে ইয়াযিদ মুসলিম মিল্লাতের শাসনকর্তার আসনে বসার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলো না। তার আমল, তার জ্ঞান, তার তাকওয়া একজন মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার মতো ছিলো না। রসূল (স.)-এর সাহাবী আমীর মোয়াবিয়া (রা.) জনগণকে বললেন, ইয়াযিদ সম্পর্কে আপনারা যা বলেন আমিও তাই বলি। তবে আমি উম্মতে মোহাম্মদীর ঐক্য এবং অবিচ্ছিন্নতার কথা ভাবছি। মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদ বিশৃংখলা মোটেই আমি পছন্দ করি না। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্য সবকিছুর উর্ধে। রসূল (স.) একবার কা'কা ইবনে ওমরকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জেহাদের জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্য এবং ঘোড়া তৈরি রেখেছি। রসূল (স.) শুনে বললেন, এটাই প্রত্যাশিত এবং এটাই উদ্দেশ্য।

ইসলামের প্রথম সময়ের মুসলমানরা আনুগত্যের অর্থ বুঝতেন। তারা সঠিক আনুগত্যের পরিচয়ও দিতেন। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার চেয়ে তারা ইসলামের স্বার্থকেই বড় করে দেখতেন। হযরত ওসমান (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) আদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন ইরাক থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। ইরাকের লোকেরা আব্দুল্লাহর (রা.) কাছ থেকে উপকৃত হতো এবং তাঁকে ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। ইরাকের লোকেরা আব্দুল্লাহ (রা.)-কে বললো, আবদুল্লাহ যেন

খলীফা ওসমানের আদেশ উপেক্ষা করেন। এতে যতোরকম সমস্যা দেখা দেবে সেসব সমস্যা সমাধানে তারা নিজেদের বুক পেতে দেবে। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, যিনি আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্যের রশি আমার গলায় বাঁধা। আমি চাই না আমার মাধ্যমে কোনো ফেতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মোচিত হোক।

হযরত ওমর (রা.) এবং আইনের শাসন বাস্তবায়ন

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি সব সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন যে, দেশের নাগরিক এবং শাসক উভয় পক্ষই যেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। কোনো আদেশ বা ফরমান জারি করার পর তা বাস্তবায়নে কোনো প্রকার শিথিলতা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। মদীনাবাসীদের প্রতি তার যেমন দৃষ্টি ছিলো, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের দূরতম এলাকার লোকদের প্রতিও তার একই রকম দৃষ্টি, একই রকম মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো। বেশী আইনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে হযরত ওমর (রা.) মনে করতেন না। তিনি ভাবতেন, আইনের শাসন বাস্ত বায়নই হচ্ছে আসল বিষয়। অল্প আইন যদি যথাযথ বাস্তবায়িত হতে পারে তবে এতেই অনেক বেশী উপকার পাওয়া যায়। টালবাহানার মাধ্যমে আইনকে যদি অকার্যকর রাখা হয় এবং আইনের প্রভাব যদি কমিয়ে ফেলা হয় তাহলে বে-আইনী কার্যকলাপ এবং বেশী তৎপরতা সহজেই বন্ধ করা যায়।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে শোরাইক ইবনে শামি নামে একজন সামরিক অফিসার কৃষি কাজের অনুমতি চান। খলীফা তাকে অনুমতি দেননি। অনুমতি না পেয়েও সেই সামরিক অফিসার মিসরে কৃষি কাজ শুরু করেন। এ খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) মিসরের গবর্নরকে চিঠি পাঠালেন শোরাইককে যেন মদীনায় পাঠানো হয়। গভর্নর শোরাইককে মদীনায় পাঠালেন। খলীফার কাছে হাযির হয়ে শোরাইক ভীষণ ভয় পেলেন। খলীফা বললেন, তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছো আমি তোমাকে শাস্তি দেবো। শোরাইক বললেন, অন্যায় করে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করেন। হে আমীরুল মোমেনীন! আমার ভুল হয়ে গেছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি সত্যিই তওবা করেছো? শোরাইক বললেন, অবশ্যই। হযরত ওমর (রা.) শোরাইককে বললেন, যাও তুমি মিসরে ফিরে যাও, নিজের সরকারী দায়িত্ব পালন করো। তারপর শোরাইককে ক্ষমা করার কথা গবর্নরকে লিখে জানালেন।

মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে এমনকি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও খোদাভীতিকে সামনে রাখতেন। আলেকজান্দ্রিয়া যুদ্ধে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) সৈন্যদেরকে একপর্যায়ে যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু সৈন্যরা তার আদেশ মানলো না। ওবাদা (রা.) যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে জানতে চাইলেন কোনো হত্যাকান্ড হয়েছে কি না। তাকে জানানো হলো যে, না কোনো হত্যকান্ড হয়নি। হযরত ওবাদা (রা.) একথা শুনে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। তিনি বললেন, সেনাপতির আদেশ অমান্য করে কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়নি এটাই আল্লাহর শোকর আদায় করার কারণ। এই সাহাবী জানতেন যুদ্ধের ময়দানেও আমীরের আদেশ অমান্য করা যায় না। যদি কেউ অমান্য করে এবং সেই অবস্থায় মারা যায় তবে সে গুনাহগার হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার শামিল। আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর ফয়সালা দেয়ার পর কোনো ঈমানদার পুরুষ অথবা নারীর জন্যে নিজে থেকে অন্য কোনো ফয়সালা দেয়া বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা এবং রসূল (স.)-এর নাফরমানি যে ব্যক্তি করবে সে সন্তুষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্যের আলোকে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, পরিবারের প্রধান ব্যক্তি এবং শাসনকর্তার আনুগত্য আবশ্যক। রসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি আমার

নির্ধারণ করা আমীরের আনুগত্য করেছে সে যেন আমারই আনুগত্য করেছে। যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্যতা করেছে সে প্রকৃতপক্ষে আমারই অবাধ্যতা করেছে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করেছে সে মূলতঃ আল্লাহরই অবাধ্যতা করেছে।

জামায়াত এবং ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ব্যক্তির জন্যে জামায়াত হচ্ছে নেয়ামত। জামায়াতের জন্যে ব্যক্তি হচ্ছে ভিত্তিস্বরূপ। রসূল (স.) বলেছেন, তুমি জামায়াতের সাথে যদি থাকো তবে তুমি মঙ্গল এবং কল্যাণ লাভ করবে। তিনি আরো বলেন, জামায়াত হচ্ছে রহমত, বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে আযাব। বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন এবং এখলাছের অধিকারী মুসলমানরা ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ করে জামায়া'তের স্বার্থ ক্ষরা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা শাস্তি ভোগ করেছেন তবু জামায়াতের সম্মান রক্ষা করেছেন। হযরত ওসমান (রা.) আবুযর গেফারী (রা.)-কে মদীনা থেকে রবজায় গিয়ে বসবাস করার নির্দেশ দেন। এই খবর পাওয়ার পর ইরাকের একদল লোক আবুযর (রা.)-এর কাছে এসে বললো, ওই লোকটি আপনার ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি যদি তার এই আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তবে আমরা বড় একটি সৈন্যদলসহ আপনার পাশে দাঁড়াবো। হযরত আবু যর (রা.) ইরাকীদের কথা শুনে বললেন, হে লোকসকল তোমরা ওরকম কথা বলো না এবং শয়তানের ইশারায় চলো না। যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ শাসককে নীচু করে দেখাতে চায় তার তওবা কবুল হয় না। আল্লাহর শপথ, ওসমান যদি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলায় অথবা আমাকে দূর দূরান্তের একটি এলাকা থেকে আরেকটি দূরদূরান্তের এলাকায় প্রেরণ করে তবু আমি তার আনুগত্য করবো। আমি ধৈর্য ধারণ করবো। আমি নিজেকে একথা বলে সান্ত্বনা দেবো যে, আমীরুল মোমেনীনের এই নির্দেশের মধ্যে আমার জন্যে পুরস্কার এবং সওয়াব রয়েছে। হযরত আবু যর (রা.) এভাবে একটি ফেতনা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেন।

আইনের সমুন্নতকরণ

হযরত ওমর (রা.) মুসলিম জনগণকে শাসকদের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করেছেন। একই সাথে আঞ্চলিক শাসকদেরও জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তিনি বলেন, দেশের কোনো নাগরিকের প্রতি শাসক যদি বাড়াবাড়ি করে তবে সেটা আমাকে যেন জানানো হয়। আমি সেই শাসকের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। হযরত ওমর (রা.)-এর একথা শুনে মিসরের গবর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, এটাতো বড় বিস্ময়ের কথা। আমরা যদি প্রজাদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার জন্যেও শাসন করে থাকি তবুও আপনি বদলা নেয়ার ব্যবস্থা করবেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ তাই নেবো। আমিতো দেখেছি রসূল (স.) বদলা নেয়ার জন্যে নিজেকে অভিযোগকারীর সামনে পেশ করেছেন।

শাসনকর্তারা কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করলে হযরত ওমর (রা.) বদলা নেয়ার ব্যবস্থা করতেন, কিন্তু অপরাধ দমনে শাস্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের বদলার প্রশ্নই ছিলো না। অপরাধ যে করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কারণ অপরাধীর শাস্তি পাওয়া রাষ্ট্রে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকার এবং জনগণের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পূর্বশর্ত। তবে অন্যায়ভাবে বা বেআইনীভাবে কাউকে শাস্তি দেয়া হলে হযরত ওমর (রা.) ক্ষমতাদর্পী শাসককে ক্ষমা করতেন না। এমনিভাবে শাসক এবং শাসিত উভয় পক্ষই ছিলো নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ। হযরত ওমর (রা.) আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, যারা শাসন করে বিচারের ভার যদি তাদের ওপরই থাকে তবে বহু ক্ষেত্রে শাসকরা

ন্যায়বিচারের দাবী পূরণে সক্ষম হবে না। ইসলাম কোনো শাসনকর্তাকে তার জন্যে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করার অনুমতি দেয়নি।

আল্লাহর আইনের বৈশিষ্ট্য এবং তার বাস্তবায়ন

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সকল নবজাতকই স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। এই স্বাধীনতা সম্মানজনক এবং পবিত্র। জীবনভর এই স্বাধীনতা একজন মানুষ ভোগ করে। কেউ যদি অন্য কারো ওপর অত্যাচার করে, বাড়াবাড়ি করে তাহলে তাকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে। এক ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে অন্য ব্যক্তির অপরাধ দমন করা আবশ্যক। কারণ অপরাধীকে সাজা না দিলে অন্যের স্বাধীনতা এবং সম্মান নিশ্চিত হতে পারে না। আসমানী আইন অথবা দুনিয়ার আইন কোনো আইনেই অপরাধীদের প্রতি কোনো প্রকার নমনীয়তার পরিচয় দেয়া হয়নি। তবে অপরাধীদের অপরাধ অনুপাতে সাজা দিতে হবে, বেশী সাজা দেয়া হলে অপরাধীদের প্রতি যুলুম করা হবে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। অপরাধীকে তার অপরাধের অধিক সাজা দেয়া হলে আল্লাহর নির্ধারণ করা সীমার অবমাননা করা হয়। যারা এ রকম বাড়াবাড়ি করে তারা দুনিয়ায়ও সাজা পাবে, আখেরাতেও শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মানুষ বস্তুগত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেয়েও যদি স্বাধীনতা না পায় তবে সে নিজের মানবতা থেকেই বঞ্চিত হবে। মানুষের মর্যাদা তার স্বাধীনতার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে। যারা মানুষকে পদানত করার জন্যে তাদের ওপর যুলুম অত্যাচার করে, নানাভাবে নির্যাতন করে তাদের জানা উচিত যে, এর মাধ্যমে তারা অন্যের ক্ষতির চেয়ে নিজেরই বেশী ক্ষতি করছে। পার্থিব জগতে তারা মানুষের ঘৃণা লাভ করবে, আর পরকালের জীবনে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। রসূল (স.) বলেছেন, কিছু লোককে বেহেশতের দরোজা থেকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে। কেননা তারা অন্যায়ভাবে অপর মুসলমানের সেই পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছে যে পরিমাণ রক্ত সিঙ্গা দেয়ার সময় ঝরানো হয়।

ফেকাহবিদরা সাজা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে চাবুকের দ্বারা আঘাত করা হয় তবে সেই আঘাত যেন এমনভাবে করা হয় যাতে উক্ত অপরাধী যন্ত্রণা অনুভব করবে, কিন্তু তার দেহে ক্ষতও হবে না, গোশতও কাটবে না। মদ-পানকারীকে চাবুক দিয়ে প্রহার করার নির্দেশ আছে, কিন্তু তাকে জখম করা যাবে না।

আইনের উদ্দেশ্য যারা জানে না তারা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। সাজা দেয়ার ফলে অপরাধী বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তার দেহ রক্তাক্ত হয়। ইসলামতো রহমতের ধর্ম। অপরাধীকে সাজা দেয়ার ক্ষেত্রেও ইসলাম বিশেষ বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে। রসূল (স.) বলেছেন মানুষের জন্যে যে ব্যক্তির মনে দয়া-মায়া ভালোবাসা নেই সে ব্যক্তি সবদিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস-প্রাপ্ত। অন্য এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওপর দয়া করবেন না যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, কঠোর প্রাণ এবং অত্যাচারী মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে। (ইবনে কাসির প্রথম খন্ড)

বিখ্যাত বুযুর্গ মালেক ইবনে দীনার বলতেন, কোনো ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ তায়ালা নিষ্ঠুর মনের অধিকারী করেন তবে সেই ব্যক্তির জন্যে এর চেয়ে বড় কোনো শাস্তি আর হতে পারে না। একইভাবে কোনো জাতির মানুষদের মন থেকে যদি আল্লাহ তায়ালা দয়া-মায়া তুলে নেন তবে সেই জাতির জন্যে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু হতে পারে না।

জবাবদিহির অনুভূতি

শাসনকর্তা হিসেবে হযরত ওমর (রা.) নিজের দায়িত্ব এবং প্রজাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বলেন, আমার কোনো গবর্নর যদি কোনো প্রজার ওপর অত্যাচার করে এবং সেই খবর জানার পরও যদি আমি অত্যাচারের প্রতিকার না করি তবে বুঝতে হবে যে, আমি সেই অত্যাচারে শুধু শরীকই ছিলাম না বরং আমি নিজেই সে অপরাধ করেছি।

হযরত ওমর (রা.) যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এ কারণে তিনি নিজেকে জবাবদিহিতে বাধ্য মনে করতেন। অত্যাচার থেকে লোকদের রক্ষা করা তার বিবেচনায় ছিলো শাসকের প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে এটা হযরত ওমর (রা.) মনে করতেন। জবাবদিহির অনুভূতি হযরত ওমর (রা.)-এর এতো প্রখর ছিলো যে তিনি বলতেন, যেসব অত্যাচারিত লোকেরা আমার কাছে অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে আসে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা, অত্যাচারের প্রতিকার করা আমার দায়িত্ব। শুধু কি তাই? যেসব অত্যাচারের ঘটনা আমার কাছে পৌঁছেনি সেসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার করেও আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সেইসব অত্যাচারের ঘটনা সম্পর্কেও আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এ ধরনের পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র চিন্তার কারণেই হযরত ওমর (রা.) জনগণকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন, এর ফলে অত্যাচারের প্রতিকার করা সহজ হবে। জবাবদিহির ভয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার এধরনের উদাহরণ অন্য কোথাও, অন্য কোনো শাসকের জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার একটি আমানত। সমকালীন শাসক তার আমানতদার। আল্লাহর কাছে এ সম্পর্কে তাকে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, এতিমের অর্থসম্পদের ব্যাপারে তার অভিভাবকের যেরূপ দায়িত্ব রয়েছে, বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থসম্পদের ব্যাপারে, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক তেমনি। আমি যদি অভাবগ্রস্ত হই তবে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ধার নেবো। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সেই অর্থ পরিশোধ করবো। যদি সম্পদশালী হই তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।

গুরুত্বপূর্ণ অথচ নাজুক এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত ওমর (রা.) বলেন, নিজের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ থেকে আমি যে নিয়মে যতটুকু ব্যয় করতাম, বায়তুলমাল থেকে সেই পরিমাণই শুধু গ্রহণ করবো। রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুলমাল সম্পূর্ণ হযরত ওমর (রা.)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই অর্থ দিয়ে কোনো অট্টালিকা তৈরি করেননি অথবা ব্যক্তিগত কোনো মুনাফা অর্জন করেননি। ইন্তেকালের পর জানা গেলো যে, হযরত ওমর (রা.) ঋণী ছিলেন।

অর্থনৈতিক বিষয়ে এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বনকারী হযরত ওমর (রা.) মুসলিম জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেও সদা সতর্ক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পৌরুষ এবং সাহসিকতা জাগ্রত করতে চাইতেন। ভীরুতা, কাপুরুষতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি একজন অভিভাবক হিসেবে বলতেন, সাহসিকতা এবং ভীরুতা মানব চরিত্রের দুটি দিক। সাহসী ব্যক্তি অজানা অচেনা শত্রুর মোকাবেলায়ও বুক টান করে দাঁড়ায়, পক্ষান্তরে ভীরু ব্যক্তি ভয় পেয়ে নিজের মায়ের কাছ থেকেও পালায়। তিনি বলতেন, মানুষের মর্যাদা তার দ্বীন এবং তাকওয়ার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। তাছাড়া বংশ মর্যাদার চেয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষকে অধিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করে তোলে।

মন্দ ধারণার পরিবর্তে ভালো ধারণা

হযরত ওমর (রা.) মানুষের প্রতি মন্দ ধারণার পরিবর্তে ভালো ধারণা পোষণ করতেন। এই কর্মপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির ভিত্তিরূপে কাজ করে। দ্বীনী ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে ওঠে। তিনি বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের মুখ থেকে উচ্চারিত কোনো কথায় তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করো না। যদি ভালো ধারণা পোষণ করার মতো সামান্য কারণও বিদ্যমান থাকে তবে ভালো ধারণাই পোষণ করো।

আত্মসমালোচনা বা আত্মমূল্যায়ন

আত্মসমালোচনা একটি বড় রকমের চারিত্রিক ও মানবিক গুণ। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, অপরে তোমার হিসাব নেয়ার আগে তুমি নিজে নিজের হিসাব নাও। তোমার আমল অপরে ওযন করার আগে তুমি নিজে ওযন করো। যদি এই পদ্ধতি গ্রহণ করো তবে কেয়ামতের দিন হিসাব দেয়া তোমার জন্যে সহজ হবে এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেকে সহজভাবে পেশ করতে পারবে। পার্থিব জীবনেই নিজেকে পরকালের জন্যে প্রস্তুত করে নাও। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।' (সূরা আলহা-ক্কা, আয়াত ১৮)

সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান– যে কোনো পাপ করার পর লজ্জা ও ভয়ে কেঁদে ফেলে এবং তওবা করে। এছাড়া সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান– যে ব্যক্তি কোনো নেকী করার পর খুশী হয় এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। এ ধরনের মানুষ নিজের জন্যে, সমাজের জন্যে, রাষ্ট্রের জন্যে, শাসনকর্তার জন্যে সৌভাগ্যের কারণ। হযরত মোদরাক (রা.)-এর মামা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। অথচ তিনি যদি চাইতেন তবে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে পারতেন। মৃত্যুর পর অনেকে সমালোচনা করে বলেছিলো, মোদরাকের মামা নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। হযরত মোদরাক (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এ বিষয়টি উত্থাপন করেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, সমালোচনাকারীরা ভুল বলছে। ওই সময়ের বীরত্বের এবং সাহসিকতার পরিচয়ই ছিলো শত্রুর মোকাবেলায় এগিয়ে যাওয়া। কাজেই তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন।

সরকারী কোনো সংস্থা প্রশংসা করুক এটা হযরত ওমর (রা.) পছন্দ করতেন না। তিনি জানতেন যে, আমি একজন মানুষ। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। তিনি বলতেন, একজন মানুষ হিসেবে আমার ভুল হতে পারে, ফলে আমি অন্যায় কোনো আদেশও দিয়ে ফেলতে পারি। এসব কারণে হযরত ওমর (রা.) লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষার প্রতি অধিক উদ্বুদ্ধ করতেন যাতে তারা ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারে এবং কোনো কিছুই অন্ধভাবে গ্রহণ না করে? ইসলামে সৃষ্টির আনুগত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে স্রষ্টার অবাধ্যতা পাপ। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, আমি তোমাদের হয়তো এমন কাজ করতে নিষেধ করতে পারি যে কাজ তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এমন কাজের আদেশ দিতে পারি যে কাজে তোমাদের ক্ষতি হতে পারে। কাজেই আমার ভুল হলে তোমরা আমার ভুল ধরিয়ে দেবে। কোরআনের শেষ আয়াত ছিলো সুদ সম্পর্কে। রসূল (স.) আমাদের সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। কাজেই যে বিষয়ে সন্দেহ সংশয় দেখা দেয় সে বিষয় তোমরা পরিহার করো। পক্ষান্তরে যে কাজে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ স্পষ্ট সে কাজ করতে থাকো।

তাকওয়ার পরিচয়

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন সকল ক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাকওয়া বা আল্লাহভীতির ক্ষেত্রেও তার স্থান ছিলো উচ্চে। তবু তিনি মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে তাকওয়া সম্পর্কে

ব্যাখ্যা জানতে চান। একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়ার পরিচয় কি? উবাই (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি কাঁটাঘেরা বাগানের মেঠোপথ ধরে পথ চলেছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ চলেছি। উবাই (রা.) বললেন, আপনি কি সেই মেঠোপথ ধরে চলার সময় খুব সতর্কতার পরিচয় দেননি? নিজের জামা কাপড় এবং দেহের অংগ-প্রত্যঙ্গ কাঁটার আঘাত থেকে রক্ষা করে চলেননি? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ তাইতো চলেছি। উবাই (রা.) বললেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া।

হযরত ওমর (রা.) তাকওয়া সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশী জানতেন। তিনি নিজেও ছিলেন তাকওয়ার মাপকাঠি। তবুও তিনি হযরত উবাইয়ের কাছে তাকওয়ার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের তাকওয়া সম্পর্কে জানানোর উদ্দেশ্যে। তাছাড়া এটাও তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রশ্ন করার ফলে কারো সম্মানের হানি হয় না।

দুর্ভিক্ষের সময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনযাপন

হযরত ওমর (রা.) প্রজাদের কোনো কাজের আদেশ দেয়ার আগে নিজে সেই কাজের অনুশীলন করতেন। জনগণের সামনে যেন উত্তম কাজের আদর্শ বিদ্যমান থাকে। দেশের মানুষকে সহজ নির্বিলাস জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়ার আগে নিজের জীবনকে সহজ সরল ও সাদাসিধে করে নিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে সকল মানুষের কাছে জীবন ধারণের উপকরণ পৌঁছে দিতে না পারা পর্যন্ত নিজের জন্যে সকল উত্তম জিনিস তিনি নিজেই নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন।

দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের কষ্ট দেখে তিনি বিচলিত হয়ে উঠতেন। মানুষের দুঃখে কষ্টে তিনি যেন নিজের জীবন দিয়ে দেবেন। পাঁচ ছয় বছর যাবত এই দুর্ভিক্ষাবস্থা বিদ্যামান ছিলো। এই দীর্ঘ সময়ে হযরত ওমর (রা.) সব ভালো খাবার নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, একবছর অথবা দুবছর দুর্ভিক্ষের প্রচন্ডতা খুব বেশী ছিলো। এ সময়ে ক্ষুধায় এবং প্লেগে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্বকে মনে করতেন আমানত। এ ধরনের দায়িত্বানুভূতির ফলে হযরত ওমর (রা.) কথায় এবং কাজে এতোটা সচেতন ছিলেন যে, আমানতের হক তিনি পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন।

নিজের পরিবার-পরিজনকে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী তাকিদ দিতেন। এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের ওপর পড়তো এবং যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতো। দুর্ভিক্ষের সময়ে একদিন নিজের শিশুপুত্রের হাতে খরবুজা দেখে হযরত ওমর (রা.) ক্ষেপে গেলেন। পুত্রকে তিরস্কার করে বললেন, ক্ষুধায় মানুষ মারা যাচ্ছে আর আমীরুল মোমেনীনের পুত্র খরবুজা ফল খাচ্ছে। বাহ্ চমৎকার! শিশু কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে চলে গেলো। হযরত ওমর (রা.) অস্থিরতায় ছটফট করছিলেন। তাকে জানানো হলো যে, শিশুর মা নিজের সঞ্চিত কিছু পয়সা দিয়ে শিশুকে ফলটি কিনে দিয়েছে। এই ফল কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থে কেনা হয়নি। একথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) শান্ত হলেন।

বর্তমানে দেখা যায় অর্থবিত্তে, সম্পদে, প্রাচুর্যে যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ তাদের মধ্যে মানবিক চেতনা তিরোহিত প্রায়। আশেপাশের মানুষেরা ক্ষুধায় ছটফট করলেও তারা আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দেয়। এমন ব্যক্তির সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক থাকতে পারে যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, ক্ষুধায় বিনিদ্র রাত কাটায়, অথচ সেই সচ্ছল ব্যক্তি কোনো খোঁজ নেয় না?

বায়তুলমালের অর্থের ব্যাপারে সতর্কতা

বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ থেকে একজন গবর্নর হযরত ওমর (রা.)-এর দুই পুত্রকে একবার কিছু অর্থ দিয়েছিলেন, কিন্তু বিষয়টি হযরত ওমর (রা.) সহজভাবে নেননি। তিনি তাদেরকে লাভের অংশসহ বায়তুলমালে জমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ। হযরত ওমর (রা.)-এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং ওবায়দুল্লাহ দুজনই ছিলেন সাহাবী। ইরাকে তারা জেহাদে গিয়েছিলেন। জেহাদ শেষে ফেরার পথে ইরাকের গবর্নর আবু মূসা আশয়া'রী (রা.) তাদের ডেকে নেন। সসম্মানে বসিয়ে বলেন যে, মদীনায় আমীরুল মোমেনীনের কাছে আমি কিছু সরকারী অর্থ তোমাদের হাতে পাঠাতে চাই। তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা এই অর্থে ইরাক থেকে কিছু জিনিস কিনে নাও। মদীনায় গিয়ে বিক্রি করে লাভটা তোমরা নিয়ো, আর মূল অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করার জন্যে খলীফার হাতে দিয়ো। এসব কথা উল্লেখ করে গবর্নর মদীনায় আমীরুল মোমেনীনকে একখানি চিঠিও দুই পুত্রের সঙ্গে দিলেন।

আব্দুল্লাহ এবং ওবায়দুল্লাহ (রা.) মদীনায় পৌছার পর হযরত ওমর (রা.) পুত্রদের কাছে জানতে চাইলেন, ইরাকের গবর্নর কি মদীনার সকল সৈন্যকেই তোমাদের দেয়া অর্থের মতো ব্যবসায়ের অর্থ দিয়েছেন? আব্দুল্লাহ এবং ওবায়দুল্লাহ বললেন, জ্বী-না তা দেননি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, লাভের অর্থ এবং মূল অর্থ দুটোই কোষাগারে জমা দাও। একথা শুনে আব্দুল্লাহ কিছু বললেন না, কিন্তু ওবায়দুল্লাহ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমরা যে জিনিস কিনেছি সেই জিনিস বিক্রি করে লোকসানও হতে পারতো। সে অবস্থায়ও তো আমরা মূল অর্থ কোষাগারে জমা করতাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি আমাকে যুক্তি দিয়ে আমার সাথে তর্ক করো না। আব্দুল্লাহ চুপ করে রইলেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। হযরত ওমর (রা.) তার বক্তব্যে অটল। ওবায়দুল্লাহ (রা.) পুনরায় যুক্তি দেখালেন। দরবারের একজন আলেম বললেন, লাভের অর্ধেক অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হোক, অবশিষ্ট অংশ তারা দু'জনে নিক। হযরত ওমর (রা.) এই সিদ্ধান্তে কোনো আপত্তি করলেন না।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্য লোকদের যে বিষয়ের অনুমতি দিতেন না, নিজের পরিবারের কাউকেও সেই কাজের অনুমতি দিতেন না। গবর্নর আবু মুসা আশয়ারীর (রা.) প্রস্তাব শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ছিলো না, কিন্তু হযরত ওমর (রা.) উচ্চস্তরের তাকওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থে সামান্য মুনাফার সুযোগও নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। খেলাফতের দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্বের অনুভূতি তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিলো। খেলাফতকে তিনি সকল প্রকার কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত রাখতে চাইতেন। এ কারণেই শাসনকর্তাদের কাজের প্রতি তিনি বিশেষ নযর রাখতেন। একই সাথে পরিবার-পরিজনের কাজকর্মের প্রতিও ছিলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার পরিবারের কারো কাজ সমালোচিত হোক এটা তার পছন্দ ছিলো না। এ কারণে ছোটখাট বিষয়কেও হযরত ওমর (রা.) বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। নির্ধারিত সীমানায় কেউ পৌছে গেলে সীমানা অতিক্রমের আশংকা থেকে যায়, কিন্তু সীমানায় পৌছার আগেই যদি পথচলা বন্ধ করা যায় সেটাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

উপঢৌকন গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং তার কারণ

গবর্নর আবু মূসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী আতেকা (রা.)-এর জন্যে এক প্রস্থ পোশাক উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা.) সেই পোশাক ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং গভর্নরের তীব্র সমালোচনা করেন।

হাদীয়া বা উপঢৌকন দেয়া নেয়া ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধতো বটেই বরং এটি একটি সুন্দর সামাজিক রীতি। কিন্তু শাসনকর্তাদের উপঢৌকন দেয়া এবং নেয়া প্রায়ই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে। পরিচ্ছন্ন জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থায় উপঢৌকন দেয়া-নেয়ার প্রশ্নই অবান্তর। সাধারণ শাসকদের যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা যদি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌছেও যায় তবু লক্ষ্য করার মতো যে, নিজের জন্যে না হলেও পরিবার-পরিজনের জন্যে তারা উপঢৌকন সানন্দে গ্রহণ করেন। কিন্তু

হযরত ওমর (রা.) নিজের জন্যে তো নয়ই, নিজ পরিবার-পরিজনের জন্যেও কোনো উপঢৌকন কখনো গ্রহণ করেননি। তার ঘনিষ্ঠ কোনো শাসক বা আত্মীয়-স্বজন যদি কোনো উপঢৌকন গ্রহণ করেছে এমর্মে খবর পেতেন তবে তাকে তিরস্কার করতেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হযরত ওমর (রা.) জানতেন, উপঢৌকন যদি উর্ধতন শাসনকর্তা গ্রহণ করেন তবে তার অধীনস্থদের জন্যে সেটা আপনা আপনি বৈধতা পেয়ে যাবে এবং এটা একটা রেওয়াজে পরিণত হবে। ফলে বিচারকার্য শাসনকার্য ন্যায়নীতি বা ইনসাফের পরিবর্তে উপঢৌকনের মানদন্ডে এবং বিনিময়ে সম্পন্ন হতে থাকবে। ঢালাওভাবে উপঢৌকন গ্রহণের রেওয়ায একবার চালু হয়ে গেলে সেই রেওয়ায এমন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, সেটা যে কোনো সমাজের ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যায়

যাকাত আদায়ের জন্যে রসূল (স.) ইবনে তাবিহ (রা.)-কে এক এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি আদায়কৃত যাকাতের অর্থ রসূল (স.)-এর কাছে বুঝিয়ে দিলেন। এরপরও দেখা গেলো তার কাছে কিছু পরিমাণ অর্থ রয়েছে। সেই অর্থ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইবনে তাবিহ (রা.) বললেন, এগুলো লোকেরা আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছে। একথা শুনে রসূল (স.) ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের মা-বাপের ঘরে বসে থাকুক তারপর দেখুক কে তাদের জন্যে উপঢৌকন পাঠায়।

নির্বিলাস জীবনের সাধনা

জনগণকে যে কাজের আদেশ দিতেন সেই কাজ হযরত ওমর (রা.) নিজেও পালন করতেন। মানুষকে সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশ দেবার আগে নিজেই সেভাবে জীবন কাটাতেন। কাঠোর আত্মসংযম এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তার কন্যা উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসা (রা.) তাকে বললেন, আব্বু আপনি এতো বেশী সংযম পালন করলে তো শেষ হয়ে যাবেন। একথা শুনে সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) তার কন্যাকে রসূল (স.) এবং তার ছূর পর্বতের গুহায় সাথী আবু বকর (রা.)-এর কঠোর সংযমী জীবনের উদাহরণ পেশ করলেন। হাফসা (রা.)-এর কাছে কয়েকটি ঘটনা হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করলেন। হাফসা সেইসব ঘটনা শুনে কাঁদতে লাগলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি সম্ভব হতো তবে আমি তাদের মতোই অনাড়ম্বর নির্বিলাস সংযমী জীবন যাপন করতাম। এতে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের জীবনে আমাকে তাদের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। একই সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনও সম্ভব হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

হজ্জ-এর সফরে হযরত ওমর (রা.) কোনো তাঁবু টানাতেন না। প্রচন্ড রোদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে কোনো গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিতেন। এক টুকরো শুকনো চামড়া ছিলো, সেই টুকরো মাথার ওপর দিয়ে মাঝে মধ্যে রোদের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করতেন। উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে সেই আশ্রয় কতোটা রক্ষা পাওয়ার মতো হতো! তিনি নিজের জন্যে ভালোভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন কিন্তু তিনি ভাবতেন যে, সকল প্রজার জন্যে একই রকম ছায়ার ব্যবস্থা না করে তিনি কি করে উত্তম ছায়ায় আরাম ভোগ করবেন? প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমর (রা.) সূর্যের উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তার চেয়ে কেয়ামতের ময়দানের সেই উত্তাপকে এবং দোযখের আগুনের সেই উত্তাপকে ভয় করতেন যার তুলনায় সূর্যের আলোকে মোটেই উত্তপ্ত বলা যায় না।

কি যে ভালো হতো মুসলিম শাসনকর্তারা যদি এসব উদাহরণ নিজেদের সামনে রাখতেন এবং অনুসরণে সচেষ্ট হতেন। তখন সমাজ পরিণত হতো আদর্শ সমাজে। হযরত ওমর (রা.)-এর

পরিধানের জামায় একাধিক তালি লাগানো থাকতো। এর চেয়ে বড় সংযম সাধনা আর কি হতে পারে? স্বচ্ছন্দ এবং বিত্তশালী মুসলমানরা নিজেদের আশপাশের লোকদের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে যদি সচেষ্ট হতেন তাহলে আমরা অধঃপতন থেকে অবশ্যই রক্ষা পেতাম। সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির উন্নতি-অগ্রগতি নিশ্চিত হতো। অথচ মুসলমানরা আজ গাফেলতির ঘুমে বিভোর। এ ধরনের ঘুমের উদাহরণ অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে সচ্ছল লোকদের হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন ক্ষুধার্ত মানুষদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতিকে এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।

দুঃস্থ-দুর্গত মানুষদেরকে হযরত ওমর (রা.) শুধু মৌখিক সমবেদনা জানানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি জানতেন যে, মৌখিক সমবেদনায় ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণ হয় না, বস্ত্রহীনের পরনে পোশাক ওঠে না। দুঃখ-কষ্টের কথা আলোচনা করে চুপচাপ বসে থাকার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। এ কারণে এ ধরনের অসহায় অবস্থাকে হযরত ওমর (রা.) অপছন্দ করতেন। দুঃখপীড়িত লোকদের পাশে বসে কান্নাকাটি করার চেয়ে বিদ্যমান জীবনোপকরণ তিনি সবার কাছে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এটাই ছিলো সমস্যার প্রকৃত সমাধান। এখনো ওই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসৃত নীতি সমস্যা সমাধানে অবশ্যই সহায়ক হবে। বর্তমানকালের শাসকরা এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম নয়। কেননা তাদের মধ্যে জাগ্রত বিবেক এবং দ্বীনী প্রেরণার বড়ই অভাব। মুসলিম শাসকদের আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের মৃত বিবেককে জীবিত করার চেষ্টা করা উচিত। এ ধরনের অবস্থা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন শাসকরা নিজেদের সংশোধন করবেন এবং প্রজা সাধারণের মনে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেরণা সৃষ্টির জন্যে সচেষ্ট হবেন।

মুসলমানদের বায়তুলমালের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) আল্লাহকে ভীষণ ভয় করতেন। এক বছর হজ্জ-এর সফর আশি দিরহামে সম্পন্ন করেও হযরত ওমর (রা.) অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা ভেবে আত্মসমালোচনা করেন। তিনি সফর শেষে বলেন, আমি এতোটা নির্বোধ, নির্ভয় হয়ে গেছি যে, বায়তুলমাল থেকে বাড়াবাড়ি পরিমাণ খরচ করেছি।

এ রকমই ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। বর্তমান কালে কি দেখা যায়? রাষ্ট্রীয় হজ্জ কাফেলায়, রাষ্ট্রীয় সফরে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়, অথচ কারো বিবেকে কোনো আঁচড় লাগে না। হজ্জ-এর সফরে বাহুল্য ব্যয় একটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে সততা এবং মানবকল্যাণ ছিলো সবকিছুর ওপরে। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার দুর্বলতা দেখতে রাযি ছিলেন না। শাহাদাতের আগে খেলাফত পরিচালনার জন্যে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর সেই কমিটিকে বলেন, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করে নাও এবং তার সম্পর্কে মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করো। হযরত ওমর (রা.) ভালো করেই এটা জানতেন যে, মুসলমানদের কল্যাণই খেলাফতের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এতে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। ছয় সদস্যের কমিটি গঠনের পর হযরত ওমর (রা.) আনসারদের বলেছিলেন, এই ছয় ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে তিন দিনের সময় দেবে। এই সময়ের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে তাদেরকে একটি ঘরে বসিয়ে দেবে। তিন দিনের মধ্যে যদি তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে তবে তো ভালো কথা। যদি না পারে তবে সেই ঘরে প্রবেশ করে তাদের সবার শিরশ্ছেদ করবে।

যোগ্য উপদেষ্টাদের সন্ধান

হযরত ওমর (রা.) জানতেন একজন সচেতন শাসনকর্তার উচিত দেশের যোগ্য লোকদের খুঁজে বের করে তাদের ওপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা। এ ধরনের যোগ্য লোকদের উপস্থিতিতে প্রশাসনের জবাবদিহিতার পথ প্রশস্ত হয় এবং প্রশাসনে গতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক শাসকের যোগ্যতা এবং সফলতার মূলে কাজ করে জনগণের সহযোগিতা।

যোগ্য শাসকদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষই সাফল্য অর্জন করে এবং শাসকের সুনাম বৃদ্ধি পায়। মজলিসে শূরার সদস্য মনোনয়নে হযরত ওমর (রা.) এই দৃষ্টি সামনে রাখতেন। মজলিসে শূরার সদস্যদের মাঝে-মধ্যে প্রশংসা করে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন। যেমন একবার বলেছেন, আলী যদি না থাকতেন তবে ওমরতো ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে যেতো। কখনো বলতেন, মোয়াবিয়া না থাকলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেতো। তিনি এমন কথাও বলতেন যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফয়সালাকারী হচ্ছেন আলী (রা.)।

দুনিয়াবী কোনো মকসুদ, কোনো উদ্দেশ্য হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে ছিলো না। দুনিয়ার কোনো জিনিসকেই তিনি এতো গুরুত্ব দিতেন না, যা হাতছাড়া হয়ে গেলে নিজের ধ্বংস হওয়ার কথা চিন্তা করতেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমর (রা.) আখেরাতে জবাবদিহির কথাই সব সময় চিন্তা করতেন এবং আল্লাহর ভয় ছিলো তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সাচ্চা মুসলমান। একজন ভালো মানুষই অন্য একজন ভালো মানুষের মূল্য এবং মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। একজন শাসক যখন তার অধীনস্থ কর্মকর্তার মূল্য ও মর্যাদা দেন তখন সেই কর্মকর্তা বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন এবং কর্তব্যকর্মে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। ভালো কাজে উৎসাহ দেয়া আল্লাহর শিক্ষার অংশ। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্যে আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই জান্নাতের অধিবাসী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে।' (সূরা ইউনুস, আয়াত ২৬)

যারা সৎ কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্মান করেন যাতে তারা সৎ কাজ অব্যাহত রাখতে পারে। কোরআনের এই হেদায়াত থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা আজ আমাদের জন্যে আবশ্যক। কর্তব্য পালনের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং শোকরিয়া আদায় করা আমাদের দ্বীনী শিক্ষা। সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় করো তবে আমি আমার নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।' আমরা কি দ্বীনের শিক্ষা কোনো অবস্থায়ই উপেক্ষা করতে পারি?

হযরত ওমর (রা.) যুবকদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন। এতে যুবকদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হতো এবং তাদের যোগ্যতাও বেড়ে যেতো। হযরত ওমর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তার মজলিসে বসিয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পরামর্শ নিতেন। অধিকাংশ সময়েই আব্দুল্লাহর (রা.) পরামর্শ হযরত ওমর (রা.) গ্রহণ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওতবা (রা.) বলতেন, হযরত ওমর (রা.)-এর যোগ্যতা ও প্রতিভা ছিলো অতুলনীয়, তবু তিনি অন্যদের যোগ্যতা এবং মেধা থেকে উপকার গ্রহণ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন বয়সে নবীন। হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে তার অত্যধিক গ্রহণযোগ্যতায় অনেক প্রবীণ সাহাবা বিস্মিত হতেন। তারা বলাবলি করতেন, আমীরুল মোমেনীন এই যুবক আব্দুল্লাহকে প্রায়ই তার দরবারে ডেকে আনেন, অথচ আমাদের যুবক পুত্রদের কখনো ডাকেন না। হযরত ওমর (রা.) এ ধরনের সমালোচনার জবাবে বলতেন, আব্দুল্লাহর জ্ঞানের গভীরতা, মেধা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার কারণে তাকে ডেকে আনি, অন্য কোনো কারণে নয়।

সকল বিভাগের জন্যে যোগ্য লোকের সন্ধান

হযরত ওমর (রা.) সকল ক্ষেত্রেই যোগ্য লোক সন্ধান করতেন। নিজের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতায় তিনি যোগ্য লোক পেয়ে যেতেন। একবার পথ চলার সময় আমর ইবনুল আসকে (রা.) দেখে বললেন, এই লোকটি একজন শাসনকর্তার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজন। কেউ পরামর্শদাতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ, কেউ প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ, কেউ বিচারক হিসেবে যোগ্য, কেউ হিসাব নিকাশে দক্ষ। সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। হযরত ওমর (রা.) যে কাজের জন্যে যাকে যোগ্য মনে করে দায়িত্ব দিতেন সেই ব্যক্তি সে ক্ষেত্রে দক্ষতার ও যোগ্যতার ছাপ রাখতেন।

আমর ইবনুল আস (রা.)

আমর ইবনুল আস (রা.) ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী। হযরত ওমর (রা.)-এর পুরো শাসনকাল তিনি গবর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমরের দূরদৃষ্টি এবং প্রশাসন পরিচালনার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। রসূল (স.) একাধিকবার হযরত আমর ইবনুল আসকে (রা.) সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত আবু বকরও (রা.) তাকে একই দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আসকে (রা.) ভালোভাবে জানতেন। রসূল (স.) হযরত আমরের যে প্রশংসা করেছিলেন সেই প্রশংসা হযরত ওমর (রা.) নিজ কানে শুনেছিলেন।

আলকামা ইবনে রামছা আল বানুয়ী বর্ণনা করেন যে, একবার রসূল (স.) আমর ইবনুল আস (রা.)-কে এক অভিযানে বাহরাইন প্রেরণ করেন। হযরত আমরকে বিদায় জানানোর জন্যে রসূল (স.) এবং সাহাবারা মদীনার উপকণ্ঠে সমবেত হন। হঠাৎ রসূল (স.)-এর তন্দ্রা এলো। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমরের প্রতি রহমত করুন।

একথা বলার কিছুক্ষণ পর রসূল (স.) পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তন্দ্রা থেকে জেগে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমরের প্রতি রহমত করুন। তৃতীয়বার এরূপ বলার পর আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রসূল! আপনি কোন্ আমরকে দোয়া দিচ্ছেন? রসূল (স.) বললেন, আমর ইবনুল আসকে। আমরা বললাম, এর কি বিশেষ কোনো কারণ আছে? রসূল (স.) বললেন, আমার মনে পড়ছে যে, আমি যখন দান করার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম তখন আমর ইবনুল আস প্রচুর অর্থসম্পদ নিয়ে হাযির হয়েছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম হে আমর, এই অর্থসম্পদ কোথা থেকে এনেছো? আমর বলেছিলো, হে রসূলুল্লাহ এটি আল্লাহর দ্বীন। আমর সত্যই বলেছে। নিঃসন্দেহে আমরের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।

আমর ইবনুল আস (রা.) ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য এবং বরকতসম্পন্ন সেনানায়ক। তিনি মিসর জয় করেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) আমরের (রা.) প্রশংসা করেছিলেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। ইতিহাসখ্যাত মিসর মুসলমানদের অধিকারে আসার পর মিসর ইসলামী রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয়। এখনো পর্যন্ত মিসর ইসলামী রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে টিকে রয়েছে। মিসর ইসলামের এক শক্তিশালী দুর্গ। এই দুর্গের পতন ঘটানোর সব রকম প্রচেষ্টা অতীতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমর ইবনুল আস (রা.) সম্পর্কে ইতিহাসে বহু বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মোসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে দেখা যায়, রসূল (স.) আমর ইবনুল আস (রা.) এবং তার ভাই হিশাম ইবনুল আস (রা.) এর ঈমান, সততা, নিষ্ঠার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

রসূল (স.)-এর এই প্রশংসার পর আমর ইবনুল আস-এর মর্যাদা নির্ণয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকে না। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমর ইবনুল আস

(রা.) এর বীরত্ব এবং মেধার কারণে রসূল (স.) আমরকে (রা.) তার খুব কাছে বসাতেন। আমর ইবনুল আস (রা.) তার ওফাতের সময় সব দাসদাসীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মোসনাদে আহমদে সংকলিত আমর ইবনুল আস (রা.) এর বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায় যে, হযরত আমর রসূল (স.) এর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বহু হাদীস শুনেছেন এবং কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন।

আমর ইবনুল আস (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণের আগে আমর ইবনুল আস (রা.) ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর অতীতের কথা ভেবে অনুতপ্ত হলেন। রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার হাতে বাইয়াত করার আগে আমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার অতীতের পাপগুলো ক্ষমা করিয়ে দিন। পরকালে জবাবদিহির ভয়ে হযরত আমর (রা.) ছিলেন ভীত। রসূল (স.) বললেন, ইসলাম গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে হিজরত অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়।

রসূল (স.) আমরকে (রা.) আম্মানের গভনর নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন আরবের বাহাদুর এবং তেজস্বী যুবকদের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে হযরত আমর (রা.) কাতরকণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা! তুমি যেসব আদেশ দিয়েছো সেসব আমি পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। তুমি যেসব নিষেধ করেছো সেসব আমি পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। আমার কোনো শক্তি নেই। তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন। আমি পাপ থেকে পবিত্র নই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার মনে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব চিন্তা, কোনো অহংকার নেই। এসব কথা বলতে বলতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্ক থাকলেই মানুষ এ ধরনের বিনয় এবং নম্রতার পরিচয় দিতে পারে, এভাবে নিজের ভুল স্বীকার করতে পারে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মৃত্যুকালে বলেছিলেন, আমি যদি ক্ষমা পেয়ে যাই তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।

যুদ্ধের ময়দানে আমর ইবনুল আস (রা.)

যুদ্ধের ময়দানে আমর ইবনুল আস (রা.) বহু বীরত্বব্যঞ্জক সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান করে তিনি বিজয় অর্জন করেন। সময়ের নাজুকতা তিনি ভালোই জানতেন। আজনাদাইন যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত রোমক বাহিনীকে তাড়া করে। একটি সেতু পার হয়ে রোমক বাহিনী অপর প্রান্তে চলে যায়। সেতুটি সরু হওয়ায় একজনের বেশী একত্রে অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। সেতুর প্রবেশপথে রোমক বাহিনীর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা মুসলমানদের পথরোধ করে। হযরত আমরের ভাই হেশাম ইবনুল আস (রা.) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। সেতুর প্রবেশ পথে তার লাশ পড়েছিলো। মুসলিম ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা হযরত হেশামের লাশ দেখে থেমে গেলো। আমর ইবনুল আস (রা.) তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন, হেশাম আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে। তার রূহ আল্লাহর কাছে চলে গেছে। তার দেহ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হলে যদি পরিণামে মুসলমানরা জয়লাভ করে তবে লাশ মাড়ানোতে কোনো ক্ষতি নেই। একথা বলেই আমর নিজের ঘোড়া হেশামের (রা.) লাশের ওপর দিয়ে সামনে চালিয়ে দিলেন। অন্যান্য মুসলিম ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা আমরকে অনুসরণ করলেন। রোমক বাহিনীকে পরাজিত করে ফেরার পর আমর নিজের ভাইয়ের খন্ড-বিখন্ড হাড় গোশত একত্রিত করে এক জায়গায় দাফন করলেন। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, আমর ইবনুল আস (রা.) ছিলেন পুণ্যশীল কোরায়শদের অন্যতম।

আমর ইবনুল আস (রা.) নিজে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মদীনায় শত্রুদের হামলার গুজব ছড়িয়ে পড়লো। মদীনার অধিবাসীরা ভয় পেয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আবু হোযায়ফার (রা.) ক্রীতদাস সালেম গলায় তলোয়ার বেঁধে যুদ্ধের সাজে মসজিদে নববীর দরোজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সালেমের দেখাদেখি আমিও গলায় তলোয়ার বেঁধে মসজিদে নববীতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই দৃশ্য দেখে রসূল (স.) সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর ওপর ভরসা করো এবং যেভাবে ওই দুইজন মর্দে মোমেন নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্যে তৈরি করেছে তোমরাও নিজেদের সেভাবে তৈরি করো।

মোসায়লামা কাযযাবের সাথে কথোপকথন

আমর ইবনুল আস (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বীর পুরুষ। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইসলাম পূর্বকালেও সবার সামনে উদ্ভাসিত ছিলো। মোসায়লামা কাযযাব নবুয়ত দাবী করার পর আমর (রা.) তার সাথে দেখা করলেন। হযরত আমর তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মোসায়লামা আমরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের শহরের নবীর ওপর কি কোনো কিছু নাযিল হয়েছে? আমর বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। কয়েকটি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী সূরা নাযিল হয়েছে। মোসায়লামা বললো, আমাকে দু'একটি সূরা পাঠ করে শোনাও। আমর সূরা আছর পাঠ করে শোনালেন। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।'

এই সূরা শোনার পর মোসায়লামা মাথা নীচু করে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর বললো, এ ধরনের সূরা আমার ওপরও নাযিল হয়ে থাকে। আমর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ওপর কোন্ সূরা নাযিল হয়েছে? মোসায়লামা বললো, 'হযরত ইয়া অবারো ইয়া অবারো ইন্নামা আন্তা উযনানে ওয়াছুদুরুন ওয়াছায়েরুকা হাকারুন নাকার।' অর্থাৎ, হে খরগোশ, হে খরগোশ তোর কি আছে? দুটি কান এবং বুক ছাড়াতো তোর সমগ্র দেহই তুচ্ছ এবং সাধারণ।

এই আবৃত্তির পর মোসায়লামা প্রশংসা পাওয়ার আশায় আমরের প্রতি তাকালো। সে বললো, বলো আমর কেমন লাগলো? আমর ইবনুল আস বললেন, আল্লাহর শপথ তুই ভালো করেই জানিস যে, আমি তোকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

দেখলেন তো? মিথ্যাবাদীর ঘরে বসে তাকে মুখের ওপর মিথ্যাবাদী বলে আসা একমাত্র আমর ইবনুল আস-এর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

রসূল (স.) আমর ইবনুল আস (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, উৎকৃষ্ট ঘরানা হচ্ছে আবু আব্দুল্লাহর ঘরানা। সেই ঘরানায় আবু আব্দুল্লাহ উম্মে আব্দুল্লাহ এবং আব্দুল্লাহ বসবাস করে। আবু আব্দুল্লাহ ছিলো আমর ইবনুল আস-এর কুনিয়ত। পুত্র আব্দুল্লাহর কারণে আমর ইবনুল আস আবু আব্দুল্লাহ নামে বিখ্যাত হয়েছেন। এ ধরনের প্রশংসার পর কোনো মুসলমানের জন্যে অন্য কোনো প্রশংসারই প্রয়োজন হয় না।

হযরত আলী (রা.) এবং আমীর মোয়াবিয়ার (রা.) মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। ঘটনাক্রমে আমর ইবনুল আস (রা.) ছিলেন আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের ছিলেন হযরত আলীর (রা.) পক্ষে। হযরত আম্মার (রা.) যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর লোকেরা হযরত আম্মারের মস্তক কেটে আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে রাখে। মস্তক কে কেটেছে এটা নিয়ে দু'ব্যক্তির মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হচ্ছিলো। উভয়েই মস্তক কর্তনের কৃতিত্ব দাবী করছিলো। আমর ইবনুল আস (রা.) সেখানে

উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিবাদরত উভয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা দুজনেই দোযখের আগুনের ভাগ পাওয়ার জন্যে ঝগড়া করছো। হায় আজ থেকে বিশ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো সেটাই ভালো হতো।

রসূলে করিম (স.)-এর সকল সাহাবাই শ্রদ্ধাভাজন

ঐতিহাসিকরা সাহাবাদের বিবরণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। বহু গ্রন্থকার আমর ইবনুল আস (রা.) এবং আমীর মোয়াবিয়ার (রা.) কথা উল্লেখ করে তাদের এমন তীব্র সমালোচনা করেছেন যে, সেই সমালোচনা না করাই ছিলো উত্তম। সকল সাহাবাই শ্রদ্ধাভাজন। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলতেন, সাহাবা হওয়ার কারণেই সাহাবাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত। তাদের সামান্য সময়ের আমল আমাদের সমগ্র জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম।

সাহাবাদের মধ্যে কাউকেই স্বল্প মর্যাদার অধিকারী মনে করা উচিত নয়। তাদের তুলনায় আমরা কি? আমরা তো অতি নগণ্য। সাহাবাদের তুলনায় আমাদের ঈমান ও আমল কোনো মাপে পড়ে না। তাই আমাদের মুখে তাদের সমালোচনা শোভা পায় না। ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের দরবারে আয়েজ ইবনে আমর (রা.) নামের একজন সাহাবাকে ওবায়দুল্লাহ তাচ্ছিল্য করে কিছু কথা বলেছিলো। ওবায়দুল্লাহ বলেছিলো, বসে পড়ো। তুমি তো রসূল (স.)-এর সাহাবাদের ভূষি। আয়েজ ইবনে আমর (রা.) সাথে সাথে বললেন, সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যাকে ভূষি বলা যায়? ভূষি তো সাহাবাদের পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যে অথবা রসূল (স.)-এর সমকালে বসবাসকারী সাহাবা নয় এমন লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়।

ইমাম নববী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র মানব জাতির মধ্যে নির্বাচিত এবং মনোনীত ব্যক্তিত্ব। তারা উম্মতের নেতা। তাদের পরবর্তীকালের সকল মানুষের চেয়ে তারা শ্রেষ্ঠ। তারা সবাই ন্যায়পরায়ণ এবং সবাই অনুসরণযোগ্য। তাঁদের মধ্যে কেউই মর্যাদায় খাটো নন।

ইবরাহীম নখয়ী'র সামনে একদিন সাহাবাদের প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছিল। ইবরাহীম বললেন, আলী (রা.) আমার কাছে হযরত ওসমানের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু ওসমানের কোনো মন্দ সমালোচনা শোনার চেয়ে আকাশ থেকে কেউ আমাকে নীচে ফেলে দেবে সেটা বরং আমি বেশী পছন্দ করবো। ইবনে আবদুল বার বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে তাঁর নবীর সঙ্গী-সাথীরূপে মনোনীত করেছেন তাদের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ অন্য কেউ হতে পারে না। ইবনে হাজার বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবাদের মধ্যে সকলেই ন্যায়পরায়ণ। বেদয়া'তী ছাড়া অন্য কেউ এই মতামতের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে সাহাবাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলাম। তবে সত্যের জন্যে যারা লড়াই করেছে তারা বসে থাকা লোকদের চেয়ে উত্তম এ রকম ধারণা আমি পোষণ করি।

হযরত আসান ইবনে মালেক (রা.)-কে এক ব্যক্তি বললো, একই ব্যক্তির অন্তরে হযরত আলী এবং ওসমানের প্রতি ভালো ধারণা স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। আনাস (রা.) এ কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, এটা মিথ্যা কথা। আল্লাহর শপথ, উভয়ের জন্যে ভালোবাসা একই সাথে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান।

ইবনে কাসির লিখেছেন, একদল ওলামার অভিমত হচ্ছে, সাহাবাদের যারা গালি দেয় তাদের কাফের বলা বৈধ। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে লিখেছেন, সাহাবাদের সকলেই সাহাবা হিসেবে

সমমর্যাদার অধিকারী। তবে নিজ নিজ আমল, এলেম ইত্যাদি কারণে তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও মানবকল্যাণের আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে, ন্যায়পরায়ণ হিসেবে তারা সবাই সমান।

হযরত ওরওয়া, হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনায় আয়শা (রা.) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র লোকদের বলা হয়েছে তারা যেন রসূল (স.)-এর সাহাবাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া না করে। কিন্তু লোকেরা সাহাবাদের গালি গালাজের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে। ইমাম মালেক ফতোয়া দিতেন যে, যারা সাহাবাদের গালাগাল দেয়, 'ফাই'-এর অর্থ সম্পদে তাদের কোনো অধিকার নেই।

ওপরে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তার আলোকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, একজন মুসলমান কিভাবে সাহাবাদের আদব রক্ষা করবে। সেই আদব বজায় রেখে যদি কোনো সাহাবার প্রতি মনের বিশেষ টান অনুভব করা যায় তবে এতে কোনো পাপ নেই। তবে সাহাবাদের মধ্যকার কারো নিয়মের ওপর হামলা করা পাপ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং মাগফেরাত করুন। আমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সাহাবারা যে ভূমিকাই গ্রহণ করুন না কেন তারা সেটা নিজের ব্যক্তিগত কোনো লাভের জন্যে অথবা খাহেশাতে নফসানী বা প্রবৃত্তির তাড়নায় করেননি। বরং তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তারা মোজতাহেদ ছিলেন। নবীদের মতো উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কাজেই নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। মোজতাহেদের সিদ্ধান্ত সঠিকও হয়, আবার ভুলও হয়। তবে মোজতাহেদ তার ফয়সালায় সৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে চেষ্টা করেন। এটা আমার মনগড়া কোনো কথা নয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া যার উপাধি ছিলো শায়খুল ইসলাম তিনিও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্যে তার গ্রন্থ 'আল আকিদাতুল অসিতা' দেখুন।

ইমাম নববী সাহবাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, সাহাবাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে উভয় পক্ষই নিজেদেরকে হকের ওপর মনে করেছেন। তারা নিজেরা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তারা উভয় পক্ষ অন্যের চেয়ে ভিন্নরকমের এজতেহাদ করেছেন। এ কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটন সত্ত্বেও এ বিষয়ে উম্মতের এজমা' রয়েছে যে, বিবাদমান উভয় গ্রুপের সাহাবাদের সাক্ষ্য এবং বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তাদের সকলের বিচারকার্য ন্যায়বিচার হিসেবে মেনে নিতে হবে।

ওলামায়ে দ্বীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সাহাবাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখতে হবে। তাদের মধ্যকার যুদ্ধ এবং রক্তপাত সম্পর্কে কোনো প্রকার মন্দ ধারণা পোষণ করা যাবে না। কোনো মন্দ সমালোচনা করা যাবে না। হযরত আলী (রা.) এবং মোয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে উভয় পক্ষই নিজেকে সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত বলে মনে করতেন। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর এজতেহাদ সঠিক ছিলো এবং তিনিই সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। অন্য পক্ষ এজতেহাদ ভুল করেছিলো। বহুসংখ্যক সাহাবা উক্ত বিবাদে কোনো পক্ষই অবলম্বন করেননি বরং তারা ছিলেন নিরপেক্ষ।

সাহাবাদের সম্পর্কে রসূল (স.)-এর কয়েকটি হাদীস

রসূল (স.)-এর শর্তহীন আনুগত্য সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তিনি বলেছেন, তোমাদের সামনে আমার সাহাবাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তোমরা তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে। অন্য এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, আমার সাহাবাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে আমাকে ভালোবাসার কারণেই ভালোবাসবে, যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ঘৃণা

ও শত্রুতা পোষণ করবে আমার প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতার কারণেই এরূপ করবে। যে ব্যক্তি তাদের কষ্ট দিয়েছে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন।

সাহাবাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা বড় পাপ। এটা সাহাবাদের কষ্ট দেয়ার শামিল। যারা সাহাবাদের কষ্ট দেবে আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মোহাজের এবং আনসারদের ওপর সন্তুষ্ট এবং কোরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ যাদের পছন্দ করেন নিশ্চয়ই তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তায়ালা যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের প্রতি কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি শত্রুতা পোষণ করতে পারে? আমরা কি আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখি যে, তাঁর ফয়সালার ওপর নিজেদের ফয়সালা চাপিয়ে দিচ্ছি? যে সম্প্রদায় একামতে দ্বীন এবং ইসলামের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে তাদের প্রতি অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা কিভাবে বৈধ হতে পারে? রসূল (স.) এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের মধ্যে কাউকে ভালোবেসেছে, তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার মাগফেরাতের দোয়া করেছে, কেয়ামতের দিন জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই সাহাবার সাথী করবেন।

হে আল্লাহ তায়ালা! আমরা তোমার নবীর সাহাবাদের ভালোবাসি, তাদেরকে বন্ধু মনে করি এবং তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করি। কাজেই তুমি তোমার রহমতে আমাদেরকে জান্নাতে তাদের সাথী করে দিয়ো। রসূল (স.) এক হাদীসে বলেছেন, আমার সাহাবাদের গালি দিয়ো না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ সোনাও ব্যয় করে, তবু আমার কোনো সাহাবার সমমর্যাদায় এমনকি অর্ধেক মর্যাদায়ও পৌঁছুতে পারবে না। আওয়াম ইবনে হাওশাব বলতেন, এই উম্মতের প্রথমদিকের লোকদের আমি বলতে শুনেছি রসূল (স.)-এর সাহাবাদের গুণাবলী তোমরা আলোচনা করবে, এতে মানুষের মনে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হবে। সাহাবাদের মধ্যকার পাস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করবে না। কারণ এতে অন্য মানুষেরা সমালোচনার সুযোগ পাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে (রা.) এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো যে, ওসমান এবং আলী সম্পর্কে আপনার মতামত কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন আল্লাহ তায়ালা তোমার চেহারা বিকৃত করে দিন। তুমি আমার কাছে এমন দুই ব্যক্তিত্বের তুলনা চাচ্ছো যারা উভয়ে ছিলেন আমার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। তুমি চাও যে, আমি তাদের একজনকে উপরে উঠাবো, অন্যজনকে নীচে নামাবো?

হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর যুহদ তাকওয়া ছিলো সর্বজনবিদিত। তিনি সকল কাজে রসূল (স.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। এমনকি রসূল (স.) যে পথ দিয়ে উট চালাতেন সেই পথ ধরে রসূল (স.)-এর উটের দাগ যেখানে যেখানে পড়েছে সেভাবে তিনি নিজের উট চালাতে চেষ্টা করতেন। এই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.) এর পর আমীর মোয়াবিয়ার (রা.) মতো নেতৃত্ব আমি কারো মধ্যে দেখিনি। হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর রাজনীতি ছিলো সবচেয়ে বেশী মযবুত।

হযরত মোয়াবিয়া (রা.) রসূল (স.)-কে অসাধারণ ভালোবাসতেন। মৃত্যুকালে তিনি অসিয়ত করেছিলেন তাকে যেন রসূল (স.)-এর সংগৃহীত কোর্তায় কাফন দেয়া হয় এবং রসূল (স.)-এর নখ যেন তার চোখের ওপর রাখা হয়। রসূল (স.) মোয়াবিয়া (রা.)-এর জন্যে এই বলে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করুন এবং অন্যদের হেদায়াতের মাধ্যম করুন।

হযরত মোয়াবিয়া এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের খবর শুনে হযরত মোয়াবিয়া (রা.) আফসোস করে বলেছিলেন, আলীর মৃত্যুর সাথে সাথে জ্ঞান এবং ক্ষমাশীলতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত মোয়াবিয়ার ভাই ওতবা বললেন, সিরিয়াবাসীর সামনে অমন কথা বলো না। হযরত মোয়াবিয়া (রা.) একথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি নিজের কাজ নিজে করো, আমার কাজ আমাকে করতে দাও।

ওমর ইবনে আব্দুল আযিযের আদর্শ এক্ষেত্রে আমাদের জন্যে উত্তম নমুনা। তার দরবারে কয়েকজন লোককে সাহাবাদের মতবিরোধ সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনে তিনি বললেন, যে বিষয়টিতে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় তোমাদের হাত এবং তলোয়ার রক্ষা করেছেন সে বিষয়ে তোমাদের যবানও তোমরা হেফাযত করো। ইমাম নববী আমীর মোয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, অসাধারণ জ্ঞানী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা।

হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বহু কিছু লেখা হয়েছে। এখানে আমি দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং সুবিচারক। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। আবদুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওলীদকে একবার তিনি একটি রাজ্যের গবর্নর মনোনীত করেছিলেন। নিয়োগপত্র হাতে দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, আমার আদেশপত্র পেলে তুমি কি করবে? আব্দুর রহমান বললেন, আপনার আদেশকে পথনির্দেশ মনে করবো এবং কখনো এর অবাধ্যতা করবো না। মোয়াবিয়া (রা.) এই জবাব শুনে নিয়োগপত্র ফেরত নিলেন। এরপর সুফিয়ান ইবনে আওফকে গভর্নর মনোনীত করে নিয়োগপত্র দিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার আদেশপত্র পেলে তুমি কি করবে? সুফিয়ান বললেন, আপনার আদেশ সঠিক হলে পালন করবো, ভুল হলে বিরোধিতা করবো। একথা শুনে আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বললেন, ঠিক আছে যাও, আল্লাহর বরকতের কথা ভেবে দায়িত্ব পালন করো।

হযরত মোয়াবিয়া (রা.) উন্নত চরিত্রের এবং ক্ষমাশীল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ভালো কথা তিনি শুনতেন এবং গ্রহণ করতেন। নিজের সিদ্ধান্ত প্রয়োজনে প্রত্যাহার করতেন এবং কারো প্রতি মনে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। একবার দু'জন গবর্নরকে চিঠি লিখলেন তারা যেন খুমুস অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ উত্তম দেখে তার জন্যে পাঠিয়ে দেন। মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ছালান আলজাশআমি নামের গভর্নর এই আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালেন। অন্য গবর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েস আলফাজারি সেই আদেশ যথারীতি পালন করলেন। এরপর উভয় গবর্নরকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর আদেশ পালনে যিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন মোয়াবিয়া তাকে প্রথমে সাক্ষাতের জন্যে দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং যথেষ্ট সম্মান করলেন। অন্য জনকে বাইরে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখলেন। সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে শেষোক্ত গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েস অনুযোগ করে বললেন, আপনার আদেশ যথাযথ পালন করেও আমাকে অবহেলার শিকার হতে হলো, দীর্ঘসময় বাইরে বসে অপেক্ষা করতে হলো। অথচ যিনি আপনার আদেশ পালন করেননি তাকে আপনি সম্মান করলেন।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বললেন, মালেক আমার অবাধ্যতা করে আল্লাহর আনুগত্য করেছে, অথচ তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করে আমার আনুগত্য করেছো। এরপর মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আলজাশআমিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার আদেশ পালন করলে না কি কারণে? মালেক

বললেন, আমি চাই না কাল কেয়ামতে বিচারের পর আমরা দুজন দোযখের গভীর তলদেশে পড়ে থাকি। এরপর সেখানে আপনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলবেন, তোমার কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে আর আমি আপনাকে অভিশাপ দিয়ে বলবো, আপনার কারণে আমার এই অবস্থা হয়েছে। আমীর মোয়াবিয়া এই জবাব শুনে খুব খুশী হলেন।

ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার মৌলিক নীতি

আমীর মোয়াবিয়ার মেধা, দূরদর্শিতা, জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি আমীর মোয়াবিয়াকে গবর্নর নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.) স্বভাবত ছিলেন আবেগপ্রবণ এবং স্পর্শকাতর স্বভাবের মানুষ। কিন্তু খেলাফতের দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। এই দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এমন পরিবেশ তৈরী করেন যে, ছোট বড় সবাই ছিলো আইনের গন্ডী এবং আল্লাহর সীমারেখায় আবদ্ধ। খলীফার দৃষ্টিতে সব মানুষ ছিলো সমান। প্রত্যেকের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হতো এবং প্রত্যেকের দ্বারাই তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করানো হতো। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো বিষয়ই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলো না। একথা আমরা সবাই জানি যে, আত্মীয়তোষণ তথা স্বজনপ্রীতি যেখানে প্রবল হয়ে দেখা দেয় সেখানে দুর্বলদের অধিকার নস্যাৎ হয়ে যায় এবং যুলুম অত্যাচারের পোয়াবারো হয়ে ওঠে। সেরূপ অবস্থার চেয়ে ঘৃণ্য অবস্থা আর হতেই পারে না।

কোনো দুর্বলের দুর্বলতা তাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করুক একজন সৎ শাসক তা হতে দিতে পারেন না। কোনো শক্তিশালী ব্যক্তির শক্তির দাপট তার সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে না। দুর্বলদের অধিকার যেখানে ছিনিয়ে নেয়া হতে থাকে সেখানে উম্মতের কোনো অংশই নিরাপদ থাকতে পারে না। অধিকার এবং ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে হতে মানুষের মনে ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। ভালোবাসার শিকড় কেটে যায়। তখন অধিকার আদায়ের জন্যেও ভিন্ন কৌশল এমনকি অসাধু পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর আলোর কোনো আভাস কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

দেশ কাকে বলে?

দেশের সংজ্ঞা কি? দেশ কাকে বলে? মাটি, ধুলোকণা, আকাশ, জমিনের অস্তিত্বই কি দেশ? না, দেশ এর চেয়ে বড় বিষয়। দেশ হচ্ছে এই যমীন, এর অধিবাসী, তাদের সমাজ কাঠামো, উত্তরাধিকার, পিতা, পিতামহ তথা পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃতিত্ব এবং স্মরণীয় ঘটনাবলীর সমাহার। দেশকে যারা ভালোবাসে অথবা ভালোবাসবে এ ধরনের মানুষ ছাড়া দেশের সংজ্ঞা ও পরিচয় নিরূপণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এক খন্ড ভূমিকে ভালোবাসা হবে অথচ সেই ভূমির অধিবাসীদের মানবিক মূল্যবোধ অধিকার পদদলিত করা হবে, এরূপ হতে থাকলে সংশ্লিষ্ট মানুষদের মনে শুধু ঘৃণাই তৈরী হতে থাকবে। দেশের মানুষের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদাই হচ্ছে দেশপ্রেম। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) সচেতন ছিলেন। তিনি বাস্তব প্রমাণ হিসেবে দেশপ্রেমের এই পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। মুসলমানরা নিজ চোখে সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে।

একবার কোথাও থেকে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে অর্থসম্পদ এসেছিলো। তিনি জনগণের মধ্যে সেসব বিতরণ তদারক করছিলেন। চারদিকে মানুষ গিজগিজ করছিলো। বিশিষ্ট সাহাবী, বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবার অন্যতম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ভিড় ঠেলে মানুষকে এদিক ওদিক সরিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে পৌছুলেন। হযরত ওমর (রা.) এতে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি সা'দকে বললেন, সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ধাক্কিয়ে তার কাছে এতো তাড়াহুড়ো

করে আসার কি প্রয়োজন ছিলো? খেলাফতের আদব-কায়দা নিয়ম-নীতিও তোমরা মেনে চলো না, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করো না। খলীফা আল্লাহর প্রতিনিধিও বটেন, আমি তোমাদের এমন শিক্ষা দেবো যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, যতো বড় ব্যক্তিই হোক না তার পক্ষে ইচ্ছে মতো খলীফাকে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন। ইসলামী সমাজে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো সর্বজনবিদিত। হযরত ওমর তাঁকে ভালোবাসতেন, সম্মানও করতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) ছিলেন সকল মুসলমানের অভিভাবক। ভিড় ঠেলে হযরত সা'দ-এর এগিয়ে যাওয়ার ঘটনায় হযরত ওমর (রা.) মনে করলেন যে, সা'দ সাধারণ মানুষদের ওপর প্রভাব খাটাচ্ছেন। সাধারণ মানুষদের নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। এভাবে চলতে থাকলে মানুষ আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে। প্রভাবশালী এবং শক্তিমানরা দুর্বলের ওপর এভাবে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকলে সাধারণ মানুষ হতাশায় মুষড়ে পড়বে। সকল মানুষকে একনজরে দেখা হলেই শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা বিদ্যমান থাকে। সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হলেই মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব হতে পারে।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুযোগ্য শাসক। তিনি জানতেন সব কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে হয়। অসময়ে সঠিক সিদ্ধান্তও কোনো সুফল দিতে পারে না। শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব সৃষ্টির জন্যে ভ্রান্তনীতি এবং কর্ম উদ্যোগ সম্পর্কে আগেই সচেতন হতে হবে। এর দ্বারা সঠিক নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব। সুস্থ প্রশাসন, সুস্থ শাসননীতির ওপর নির্ভরশীল। জনগণকে জানতে এবং বুঝতে হবে যে, সঠিক নীতির বাস্তবায়ন শাসকের চেয়ে তাদের স্বার্থেই বেশী প্রয়োজন। কোনো শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠলে সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন হতে পারে। একবার হযরত ওমর (রা.) গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আমীরুল মোমেনীন, অমুক ব্যক্তি আমার সাথে বাড়াবাড়ি করেছে। আমার সাথে আসুন, আমাকে সাহায্য করুন। জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত হযরত ওমর (রা.) কান্ডজ্ঞানহীন লোকটির প্রতি চাবুক তুললেন। তাকে বললেন, তুমি দেখতে পাচ্ছো না যে, আমি জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি? সময়ে অসময়ে সোজাসুজি আমার কাছে চলে আসার বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে?

প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.) প্রত্যেক স্তরে জবাবদিহিতামূলক দায়িত্বশীলদের নিযুক্ত করেছিলেন। যার যার দায়িত্ব ভাগ করা ছিলো। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশেই সরকার প্রধান বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সেসব মন্ত্রণালয়ে আলাদা আলাদা মন্ত্রী নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করেন। আমার ধারণা জনকল্যাণমূলক এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)।

যোগ্য মানুষ এবং অজ্ঞাত পরিচয় সৈনিক

হযরত ওমর (রা.) সমাজের যোগ্য মানুষদের খুঁজে বের করতেন এবং তাদেরকে উপযুক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন। কেননা মানুষের চেয়ে কাজের গুরুত্ব ছিলো তাঁর কাছে বেশী। যোগ্য মানুষ দিয়েই ভালো কাজ করা সম্ভব। উপযুক্ত ব্যক্তি অপরিচিত হলেও তিনি তাকে খুঁজে নিতেন। পরিচিত অথচ অনুপযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে অপরিচিত যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। মানুষের সাথে সম্পর্ক, পরিচয় কম হতে পারে বেশী হতে পারে কিন্তু মূল্যবোধ থাকে অপরিবর্তিত। ইসলামে এই মূল্যবোধের গুরুত্ব অসামান্য। কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্বে নিযুক্ত করার সময় তার যোগ্যতা ইসলামের প্রচার প্রসারে তার ভূমিকা বিচার করতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হলে

কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেয়া যায় এবং কোনো প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয় না। ব্যক্তিগত সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না কিন্তু বৃহত্তর কর্ম পরিসরে ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে মানুষের কাজের মেধার গুরুত্ব বিচার্য। আমরা যাদেরকে অজ্ঞাত পরিচয় মনে করি আল্লাহর কাছে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী। হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এসে একজন দূত নোমান ইবনে মাকরান জানালেন যে, অমুক অমুক শহীদ হয়েছে তবে অজ্ঞাত পরিচয় শহীদের সংখ্যাও অনেক। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওরা আল্লাহর কাছে অপরিচিত নয়। আমরা জানি বা না জানি, আল্লাহ তায়ালা তো তাদের সম্পর্কে ভালো জানেন। হযরত ওমর (রা.)-এর এই কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর পথে যারা কাজ করে দুনিয়ার মানুষের কাছে তাদের পরিচিতি তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এই অপরিচিতি তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে থাকাই যথেষ্ট। তিনি সবকিছু জানেন। মানুষের কাছে পরিচিত হলেই যে তার মূল্য বৃদ্ধি পাবে এমনতো নাও হতে পারে। মানুষের কাছে অপরিচিত থাকা ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে কমে যাবে এটা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বহু লোক এমন রয়েছে যাদের চুল এলোমোলো ও উস্কুখুস্কু, দেহ ধূলোমলিন, পরিধেয় কাপড় ছেঁড়া, তালি দেয়া ও অপরিষ্কার কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তারা যদি কোনো বিষয়ে কসম করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সেই কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন, সেই কসম মিথ্যা হতে দেন না।

যদি একথা বলা হয় যে, বিশ্ব জুড়ে অজ্ঞাত পরিচয় সৈনিকদের সম্পর্কে যে চিন্তা পাওয়া যায় সেই চিন্তার উদ্ভাবক ছিলেন হযরত ওমর (রা.) তবে কি বাড়িয়ে বলা হবে? হযরত ওমর (রা.) দেখতেন মানুষের কাজ। ব্যক্তির পরিচয় তিনি তার কাজের মাধ্যমে নির্ণয় করতেন।

রসূল (স.)-এর সাহচর্যের ওপর গুরুত্বারোপ

রসূল (স.)-এর সাথে যে কোনোভাবে সম্পর্কিতদের মর্যাদা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে ছিলো অনেক বেশী। হযরত ওমর (রা.) ওমর ইবনে আবু সালমার (রা.) জন্যে চার হাজার দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। এই খবর জেনে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) অভিযোগ করলেন যে, ওমর ইবনে আবু সালমাকে আমার চেয়ে বেশী ভাতা কেন নির্ধারণ করা হলো? আমার ওপরে তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অথচ আমার পিতা হিজরত করেছিলেন এবং জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রসূল (স.)-এর সাথে সম্পর্কের কারণে ওমর ইবনে আবু সালমাকে (রা.) অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উম্মে সালমার মতো মা কেউ নিয়ে আসুক তাহলে আমি তাকেও অগ্রাধিকার দেবো।

হযরত ওমর (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। এতে সবাই বুঝতো যে, রসূল (স.)-এর নৈকট্য এবং তাঁর সুন্নতের ওপর যারা আমল করে তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) একদিন তার চাচাতো বোন শেফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। শেফা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরের দরোজায় পৌঁছে আমি দেখলাম আতেকা বিনতে উসাইদ ইবনে আবু আইস সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা উভয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রায় এক ঘন্টা কথা হলো। এরপর হযরত ওমর (রা.) আতেকাকে (রা.) একটি ভালো জামা দিলেন। পরে আমাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের একটি জামা দিলেন। আমি অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত ওমরকে (রা.) বললাম, ওমর, আপনার হাত ধূলোয় ধূসরিত হোক। আপনি আমাকে খবর দিয়ে এনেছেন, আমি নিজে থেকে আসিনি অথচ আতেকা নিজে থেকে এসেছে। আপনি তাকে বেশী দামের জামা দিলেন অথচ আমাকে কম দামের জামা দিলেন। অথচ আমি আপনার চাচাতো বোন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, বেশী দামের জামাটি তোমাকেই দিতে চেয়েছিলাম। আতেকা এবং তুমি এক সাথে আমার কাছে এসেছো। আমি ভেবে দেখলাম, তোমার চেয়ে আতেকা রসূল (স.)-এর সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ ও রিশতাদার, এ কারণে আমি আতেকাকে তোমার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি।

রেশমী পোশাক প্রসঙ্গ

দ্বীনের সাথে সম্পর্কের বিচারে হযরত ওমর (রা.) মানুষের মূল্য ও মর্যাদা দিতেন। সুন্নত পালনে কাউকে অমনোযোগী দেখলে তিনি তাকে তিরস্কার করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিও দিতেন। ছোট ছোট বিষয়েও হযরত ওমর (রা.) ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। একবার আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এলেন। তার সাথে ছিলেন পুত্র আবু সালমা। তার পরিধানে ছিলো রেশমী পোশাক। হযরত ওমর (রা.) সেই পোশাক দেখার সাথে সাথে বললেন, এটা কি? একথা বলেই জামার আস্তিন ধরে সাথে সাথে জামাটি ছিঁড়ে ফেললেন। অপ্রস্তুত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনিতো জানেন যে, রসূলুল্লাহ (রা.) আমাকে রেশম ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ জানি। রসূল (স.) তোমাকে রেশমী পোশাক ব্যবহারের অনুমতি এ কারণেই দিয়েছিলেন যেহেতু তুমি অভিযোগ করেছিলে যে, অন্য পোশাকে উকুন এসে তোমাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু রসূলতো তোমার সন্তানদের রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি দেননি।

এটি একটি মাপকাঠি। এই মাপকাঠির কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। সকল ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশকেই মাপকাঠি হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সব শাসক যদি নিজেদের সামনে শরীয়ত নির্ধারিত মাপকাঠি রেখে দেশ শাসন করতেন তাহলে মুসলিম জাহানের বহু সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যেতো।

হজ্জ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ

হযরত ওমর (রা.) মুসলমানদের ফরজ ওয়াজিব আদায়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। কেননা ফরজ ওয়াজিব সুষ্ঠুভাবে আদায়ের ওপর মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ নির্ভর করে। যারা ফরয আদায়ে অলসতা করতো হযরত ওমর (রা.) তাদের কঠোর ভর্ৎসনা করতেন। একবার তিনি বললেন, এই শহরের যতো জায়গায় মুসলমানরা বসবাস করে আমার ইচ্ছে হয় সব জায়গায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে হজ্জ পালনে সমর্থ্য হয়েও যারা হজ্জ করে না তাদের ওপর জিযিয়াকর আরোপ করি। হজ্জ পালনে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও যারা হজ্জ পালন করে না তারা মুসলমান নয়। হজ্জ এর গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) ওয়াকিফহাল ছিলেন। এতে মুসলমানদের জন্যে অশেষ কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অকারণে হজ্জ ফরয করেননি। হযরত ওমর (রা.) চাইতেন যে, মুসলমানরা হজ্জ-এর কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত হোক। হযরত ওমর (রা.) যে আদেশ দিতে চাচ্ছিলেন পবিত্র কোরআনে তার সমর্থনসূচক আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ৯৭)

হাজীদের হযরত ওমর (রা.) ভীষণ পছন্দ করতেন। হজ্জ যাত্রীদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করার জন্যে হযরত ওমর (রা.) মক্কার অধিবাসীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তারা যেন হজ্জ এর মওসুমে ঘরের দরোজা খোলা রাখে। এতে হজ্জযাত্রীরা যেখানে সেখানে যেন সাময়িক আশ্রয় নিতে পারে। বর্তমানে সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সে ধরনের আদেশ এখন দেয়া সম্ভব নয়। মক্কাবাসীরা নিজেদের বাড়তি ঘর অনেকেই ভাড়া দেয়। সরকারীভাবে হাজীদের থাকার জন্যে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া আবশ্যক।

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার নিজস্ব মাপকাঠি রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) মুসলিম জাতির জন্যে ব্যক্তির সেবার মূল্যমানে ব্যক্তির মর্যাদা নিরূপণ করতেন। এ ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবিত মাপকাঠিতে প্রতিটি মানুষ যুক্তিসঙ্গত মূল্য ও মর্যাদা লাভ করেছে এবং মানুষের মন শান্তিতে পূর্ণ হয়েছে। একবার হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে আমর ইবনে তোফায়েল উপস্থিত হলেন। তার একখানা হাত ইয়ামামার যুদ্ধে কেটে গিয়েছিলো। মজলিসে পানাহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। খাবার পরিবেশনের পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, সম্ভবত হাতের কারণে আপনি একপাশে গিয়ে বসেছেন। আমর বললেন, জ্বী হ্যাঁ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, কিন্তু আপনি খাবার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তো খাবার মুখে তুলবো না। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আপনি ছাড়া অন্য কেউ এমন নেই যার দেহের কোনো অংশ জান্নাতে পৌঁছে গেছে।

হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে খাবার পরিবেশনের পর আমর ইবনে তোফায়েল (রা.) কেন দূরে গিয়ে বসলেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তার প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করার মতো কেউ নিশ্চয়ই সেই মজলিসে ছিলেন না। পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা আহত হতেন সেই সময়ে তাদেরকে মর্যাদা এবং আন্তরিক সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখা হতো। এ ধরনের উদাহরণ মানুষকে ত্যাগ ও কোরবানীতে উদ্বুদ্ধ করতো। যার দেহের কোনো অংশ আল্লাহর পথে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হতো তাকে অবহেলা না করে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। শত শত বছর কেটে যাওয়ার পরও হযরত ওমর (রা.)-এর এই মর্যাদাদানের আদর্শ আজো ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন। হযরত ওমর (রা.) মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন। তিনি এমন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন যাতে মানুষের ক্ষতির পরিবর্তে উপকার হতো। মানুষের মধ্যকার মন্দ স্বভাব দূর হয়ে সৎ স্বভাব জাগ্রত হতো। প্রবৃত্তির দাসত্বের মনোভাব দূর হয়ে যেতো। মোজাহেদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলো যে, কোনো ব্যক্তি নাফরমানির ইচ্ছাও পোষণ করে না, আর নাফরমানি করেও না। এ ধরনের লোককে কি বলা যাবে? জবাবে হযরত ওমর (রা.) লিখলেন, যারা নাফরমানির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না বরং আল্লাহর ভয়ে নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করে তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে মনোনীত করেন।

অধিকাংশ মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চলেছে, খুব কম লোকই সুস্থ বিবেক দ্বারা পরিচালিত পথে চলতে গিয়ে শয়তানের সাথে শত্রুতা করতে পারে। তবে কমসংখ্যক লোকই আল্লাহর সহায়তা ও তাওফিক পেয়ে সফলকাম হতে পারে। এ ধরনের লোকদের হযরত ওমর (রা.) সুসংবাদ দিয়ে বলতেন, আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে উঁচু মর্যাদা এবং পুরস্কার রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) এ ধরনের লোকদের কঠিন জীবন সাধনায় অটল, অবিচল থাকার জন্যে উৎসাহিত করতেন। ঈমান এবং পবিত্রতার পথে অটল, অবিচল থাকার জন্যে তিনি লোকদের তাকিদ দিতেন। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অবৈধ কোনো কাজ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা করে না বরং আল্লাহর ভয়ে অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বৈধ উপায়ে সেই অবৈধ জিনিসের চেয়ে ভালো জিনিস পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। উপরন্তু আখেরাতে তার জন্যে রয়েছে অঢেল পুরস্কার এবং উচ্চ মর্যাদা। হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.) এর এই হাদীসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা

রসূল (স.) এর পরেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা বিদ্যমান। হযরম ওমর (রা.) সমকালের জীবিত সাহাবাদেরই শুধু মর্যাদা দিতেন না বরং পুণ্যবান যেসব ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছিলেন তাদেরও বিশেষ মর্যাদা দিতেন। প্রায়ই তাদের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। এতে তার উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি। প্রথমতঃ সেইসব ব্যক্তির জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণে অন্যদের অনুপ্রাণিত করা। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যেন তাদের ভুলে না যায় তার ব্যবস্থা করা।

একবার আমর ইবনে হাজাকা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এলেন। তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। মদীনায় সেটাই ছিলো তার প্রথম আগমন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন।

ওহে খাত্তাবের পুত্র ওমর
তোমার চেয়ে দ্বীনদার
আমলকারী আল্লাহর কেতাবের ওপর
অন্য কাউকে আমি দেখিনি আর।
কোরআন পাওয়া নবীর পর
তোমার মর্যাদা হে ওমর।

হযরত ওমর (রা.) এই কবিতা শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, আবু বকর (রা.) যা করেছেন তুমি সেসব ভুলে গেছো? আমর ইবনে হাজাকা বললেন, আমি তো তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। হযরত ওমর (রা.) শান্ত হলেন। তারপর বললেন, আবু বকর (রা.) সম্পর্কে জানার পর তুমি যদি তার মর্যাদা ও সম্মান অস্বীকার করতে, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই শাস্তি দিতাম।

আগন্তুক আমর ইবনে হাজাকা হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশংসা করেছিলেন বটে, অন্য কারো কোনোপ্রকার সমালোচনা করেননি। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই প্রশংসায় বিগলিত হলেন না বরং সাথে সাথে প্রশংসাকারীকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা অস্বীকার করা বাস্তবতা অস্বীকার করার শামিল। হযরত ওমর (রা.) সকল প্রকার শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের প্রতি খেয়াল রাখতেন। হযরত ওমর (রা.) এই নীতি আল্লাহর কেতাব এবং তাঁর রসূল (স.)-এর সুন্নত থেকে গ্রহণ করেছিলেন। যে জাতি নিজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মূল্য ও মর্যাদা দেয় না, তাদের অধঃপতন কেউ ঠেকাতে পারে না। কোরআন সুন্নাহর আদর্শ ও শিক্ষা বহির্ভূত মানব চরিত্র উন্নয়নের কোনো গ্রন্থ কিছুতেই উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও আদর্শ উপস্থাপন করতে পারে না।

জ্ঞানার্জন এবাদতের শামিল

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আমি কোনো প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করি না। কারণ আমি মনে করি কোনো মুসলমানের মনে বিদ্বেষ থাকা শোভনীয় নয়, বরং অন্যায় এবং মিথ্যার প্রতি মুসলমানের মনে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা থাকতে পারে। মুসলমানের দ্বীন শক্তিশালী। এই দ্বীনের নীতিমালা এবং উন্নত উদাহরণ বিশ্বের যে কোনো আদর্শের মোকাবেলায় উপস্থাপন করা যায়। ইসলাম মানবতার জন্যে কল্যাণ এবং সৌভাগ্যের ঝান্ডা বহন করে এনেছে। নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং কুদরতের প্রকাশ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে ইসলাম বাধা দেয় না। মুসলমান ভালো করেই জানে যে, কোরআন জ্ঞান এবং মূর্খতার মধ্যে বিভেদ রেখা টেনে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানী এবং মূর্খ ব্যক্তি সমান হতে পারে না। মূর্খতা এবং পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে কোরআন যুদ্ধ ঘোষণা করে। কোরআন চায় মানুষ বিশ্বের সৃষ্টিকুল সম্পর্কে চিন্তা করুক, গবেষণা করুক, মানব কল্যাণে সেসব ব্যবহার করুক। আল্লাহ তায়ালা সবজান্তা, সবকিছুর খবর তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি মানুষকে চিন্তা করার, গবেষণা করার নির্দেশ দেন। তিনি চান মানুষ সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করুক। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহের চলাচলে মানুষের জন্যে কল্যাণ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করে তাতে তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৪)

হযরত মুসা (আ.) হযরত খিযির (আ.)-এর কাছে গিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার সাথে যেতে চাই যাতে তুমি আল্লাহর দেয়া জ্ঞান আমাকে শেখাতে পারো। একথার দ্বারা বোঝা যায় জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর করা সম্মানের কাজ। তাছাড়া একজন জ্ঞানী যতো জ্ঞানই অর্জন করুক না কেন, যতো উচ্চ মর্যাদায়ই অধিষ্ঠিত হোক না কেন, আরো বেশী জ্ঞানার্জনে তার অনাগ্রহ থাকতে পারে না। জ্ঞানের কোনো শেষ সীমা নেই। একজন বড় জ্ঞানীও তার চেয়ে কম মর্যাদার কাছে জ্ঞানার্জনে লজ্জিত হতে পারেন না। বরং জ্ঞান অর্জন সম্মানের কাজ। জ্ঞানীর মর্যাদা অনেক উচ্চে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞানদান করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সূরা মুজাদালা, আয়াত ১১)

অশিক্ষিত মূর্খ লোকদের শিক্ষার জন্যে তাকিদ তো প্রতিটি দেশেই দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামে শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদেরও অধিকতর জ্ঞানার্জনের তাকিদ দেয়া হয়েছে। অজানা ভাষা শিক্ষার ওপরও ইসলাম জোর দিয়েছে। বিজাতীয়দের ভাষা শিক্ষা করে মুসলমান তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক গোপনীয় তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যেও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা জরুরী। রসূল (স.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-কে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রিয়নবী (স.)-এর নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত যায়েদ (রা.) সতের দিনে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ক্রমাগত জ্ঞানার্জন করা ফরয

প্রতিটি মুসলমানের জন্যে ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরয করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরয করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান যেখানেই থাকুক সেখান থেকে তা অর্জন করতে হবে। বহুমুখী জ্ঞানার্জন করার জন্যে দূরদূরান্তে সফর করাকে পুণ্যের কাজ হিসেবে ইসলামে অভিহিত করা হয়েছে। জ্ঞানার্জনের জন্যে জীবনের বিশেষ কোনো পর্যায় যথেষ্ট নয় বরং পুরো জীবন ধরে জ্ঞানার্জন চালিয়ে যেতে হবে। মোমেন বান্দা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সময় জ্ঞানার্জনে কাটিয়ে দেয়। মুসলমানরা রসূল (স.)-এর এই বাণী সম্পর্কে সকলেই অবগত যে, জ্ঞানার্জনে বের হওয়া তালেবে এলেমের পায়ের নীচে ফেরেশতারা তাদের পবিত্র পালক বিছিয়ে দেন।

এলেম বা জ্ঞান এমনই এক অমূল্য সম্পদ যা দ্বারা মানুষ জীবদ্দশায়ই শুধু লাভবান হয় না বরং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনেও এর কল্যাণ অব্যাহত থাকে। হুযুর আকরাম (স.) বলেন, আদম সন্তানের মৃত্যুর পর তার আমল সব বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি জিনিস তাকে মৃত্যুর পরও উপকার পৌঁছাতে থাকে। প্রথমতঃ কল্যাণকর জ্ঞান। যে জ্ঞান সে কাউকে শেখায় এবং মানুষ তা দিয়ে উপকার লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ সদকায়ে জারিয়া, যে সদকা দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ লাভ হয়। তৃতীয়তঃ সৎ সন্তান যে সন্তান নেক আমল করে এবং পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে।

ইমাম শাফেয়ীর (রহ) মতে জ্ঞানার্জন নফল নামাযের চেয়ে অধিক জরুরী এবং ওয়াজিব। নবী আকরাম (স.) বলেন, জ্ঞান অর্জনের জন্যে সচেষ্ট ব্যক্তি যদি জ্ঞানার্জনে পূর্ণ সক্ষমতা লাভ করে তবে তার জন্যে পূর্ণ পুরস্কার লেখা হয়, আর যদি চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ণ সফলতা অর্জন না করে তবু তার জন্যে পুরস্কারের একটা অংশ লেখা হয়।

ওপরে উল্লেখিত একটি হাদীসে তিনটি আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রসূল (স.) সাতটি আমলের উল্লেখ করেছেন যেসব আমল মৃত্যুর পর কাজে আসে। সেগুলো হচ্ছে কাউকে জ্ঞান শেখানো। কূপ খনন। নদী বা পুকুর খনন। খেজুর গাছ বা অন্য কোনো ফলদার ছায়াদার গাছ লাগানো। মসজিদ নির্মাণ। মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকার হিসেবে কোরআন রেখে যাওয়া। পুণ্যবান ও সৎসন্তান রেখে যাওয়া, যারা পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্যে দোয়া করে।

তাবেয়ী মোজাহেদ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসে রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা 'কুন' শব্দ দ্বারা বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু চারটি জিনিস নিজের কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো হচ্ছে কলম, আরশ, জান্নাতে আদন এবং আদম আলাইহিস সালাম। কলম হচ্ছে জ্ঞানের চাবি। এর দ্বারা জ্ঞানের হেফাযত হয় এবং এই জ্ঞান বংশানুক্রমে বিস্তার লাভ করে। ইমাম ওকী হযরত ছুফিয়ান ছাওরীর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, দেহের জন্যে যেমন রুটি প্রয়োজন, তেমনি দ্বীনের জন্যে জ্ঞান প্রয়োজন। তালেবে এলেমকে মূর্খদের সাথে এভাবে তুলনা দেয়া হয়েছে ঠিক যেমন মৃত মানুষদের মধ্যে জীবিত মানুষের অবস্থান।

ইসলামের প্রথম যুগের মানুষেরা জ্ঞানের মর্যাদা দিতেন। জ্ঞানার্জনের জন্যে তারা সবকিছু উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করতেন না। হায়ছাম ইবনে জামিল জ্ঞানার্জনের জন্যে দু'বার নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলেন।

সফওয়ান ইবনে আনান আলমায়াদি (রা.) বলেন, আমি হুযুর আকরাম (স.)-এর কাছে গেলাম। তিনি মসজিদে একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর পরিধানে ছিলো লাল রং-এর ইয়েমেনী চাদর। আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ (স.) আমি জ্ঞান অর্জনের জন্যে হাযির হয়েছি। রসূল (স.) খুশী হয়ে বললেন,তালেবে এলেমকে অর্থাৎ জ্ঞান অনুসন্ধানীকে খোশ আমদেদ। যারা জ্ঞান অর্জনের জন্যে বের হয় ফেরেশতারা তাদেরকে নিজেদের পালকের নীচে ঢেকে নেয়।

আল্লাহর কেতাব, হাদীসে, রসূল, ইমাম ও ফকীহদের বক্তব্য সামনে রেখে কেউ কি এমন কথা বলতে পারে যে, ইসলাম জ্ঞানার্জনের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেছে। সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব নয়। যারা বলে যে ইসলাম জ্ঞানার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করছে এবং নিতান্ত মন্দ কাজ করছে। তাদেরকে এককথায় মিথ্যাবাদী বলা যায়। আমাদের দ্বীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ বা তওহীদ। কোরআনের বহু জায়গায় তওহীদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এক জায়গায় জ্ঞানীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর ফেরেশতারাও এই সাক্ষ্য দিচ্ছে। জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাও ন্যায়ানুগভাবে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে কোনো কিছু বাড়তি চাওয়ার জন্যে দোয়া শিখিয়েছেন এভাবে– 'ওয়াকুল রাব্বি যিদনি ইলমা।' অর্থাৎ হে নবী আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনিসের (রা.) কাছে দীর্ঘ এক মাসের পথ সফর করে একটি হাদীস শিক্ষা করেন। জ্ঞানের গুরুত্ব ও মর্যাদা এঘটনা থেকেও আন্দাজ করা যায়। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্যে বের হয়েছে তার সফর তার পূর্বেকার পাপসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

রসূল (স.)-এর দোয়াসমূহ অত্যন্ত অর্থব্যঞ্জক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর একটি দোয়া হচ্ছে, হে আল্লাহ তায়ালা! তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছো তা দ্বারা আমার কল্যাণ করো। আমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দাও যে জ্ঞান আমার জন্যে কল্যাণকর হবে এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে নিবেদিত।

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে লেখাপড়া না জানা মুসলমান শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর কাজ রসূল (স.) নির্ধারণ করেছিলেন। এ ঘটনা সকল মুসলমানেরই জানা রয়েছে। রসূল

(স.) লেখাপড়া জানা মুসলমানদের নির্দেশ দিতেন তারা যেন লেখাপড়া না জানা নিজেদের ভাই-বন্ধুদের লেখাপড়া শিক্ষা দেয়। হাকাম ইবনে আসকে রসূল (স.) মদীনার লোকদের লেখা-পড়া শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্য চায় তার জন্যে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আখেরাতের সাফল্য চায় তার জন্যেও জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দুনিয়াও আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য চায় তারও জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। রসূল (স.)-এর এই হাদীস সকল মুসলমানের সব সময় মনে রাখা আবশ্যক।

শহীদের রক্ত এবং জ্ঞানীর কলমের কালি

হাক্কানী আলেমের কলমের কালির মর্যাদা অসাধারণ। রসূল (স.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং জ্ঞানীদের কলমের কালি পরস্পর সমান মর্যাদা লাভ করবে। একটি অন্যটির চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হবে না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার দোয়াত এবং কলমের শপথ করেছেন। দোয়াত এবং কলম জ্ঞান অর্জন, জ্ঞানের বিকাশ এবং সংরক্ষণের উপায় হিসেবে চিহ্নিত। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-কে একথা বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা কলম সৃষ্টি করেছেন এবং নূন। নূন মানে হচ্ছে দোয়াত। এরপর আল্লাহ তায়ালা কলমকে বললেন, লেখো। কলম জিজ্ঞেস করলো, কি লিখবো? আল্লাহ তায়ালা বললেন, লেখো যা হয়েছে এবং যা হবে। আমল, রেযেক এবং মৃত্যুর কথা লেখো। তারপর কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব লেখা হয়ে গেলো।' নূন ওয়াল কলমে ওয়ামা ইয়াসতুরুন' আয়াতের সারমর্ম এটাই। এরপর আল্লাহ তায়ালা কলমের ওপর সীলমোহর লাগিয়ে দেন। কেয়ামত পর্যন্ত কলম আর কিছু বলবে না। এরপর আকল সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আকলকে বলেছেন, আমার ইযযতের শপথ, যাকে আমি ভালোবাসবো তার মধ্যে তোমাকে পূর্ণভাবে দান করবো। আর যাকে আমি ঘৃণা করবো তার মধ্যে অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ আকল দান করবো। এটি আমাদের দ্বীন। অথচ এই দ্বীন সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এই দ্বীন জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করেন না। এই দ্বীন মূর্খতা এবং পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি করে। ইসলামের শত্রুদের এসব প্রচারণা তাদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক

মুসলমানরা শুধু আলেম ফাজেলই ছিলেন না বরং তারা শিক্ষাদান পদ্ধতিরও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাকে কি জ্ঞান শেখাতে হবে, কোন সময়ে কি ধরনের বিষয় শিক্ষা দিতে হবে এসব কিছু চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। শিক্ষানীতি স্পষ্ট না করা পর্যন্ত জ্ঞানার্জনে শিক্ষা কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। হযরত আলী (রা.) বলতেন, কোনো জাতির সামনে যখন তোমরা এমন বিষয় পেশ করবে যা তাদের কাছে বোধগম্য নয়- তখন তাদের মধ্যকার কিছু লোককে তোমরা ফেতনায় জড়িত করবে।

ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্কও শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমাদের বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের পুংখানুপুংখ তারা আলোচনা করেছেন। শিক্ষাদান পেশা একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন পেশা। পার্থিব লাভ এবং ফায়দা এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা এবং ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহই আসল জিনিস। শিক্ষক তার মেধা এবং জ্ঞান দিয়ে ছাত্রের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাকে তৃপ্ত করবেন। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের আচরণ হতে হবে নম্র ভদ্র। শিক্ষকের রূঢ় কথাও ছাত্রের জন্যে কল্যাণকর এটা ছাত্র বা শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইসলামী বিশেষজ্ঞরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রাণশক্তি সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বর্তমানে বহু কিছু বলা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে। কিন্তু সবকিছু যেন প্রাণহীন দেহের মতো।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানের দাওয়াই

'আল আহরাম' নামক পত্রিকায় ১৯৭৩ সালের ১৮ আগস্ট সংখ্যায় ৬-এর পাতায় আমি বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পড়েছি। হঠাৎ করেই প্রবন্ধটি পড়লাম। মিসরের আণবিক শক্তি কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানী ডক্টর আলী আলসিকরি প্রবন্ধটি লিখেছেন। লেখাটি পড়ার মতো। তিনি লিখেছেন উদ্ভিদ বিদ্যায় মুসলিম বিশেষজ্ঞদের সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বর্তমানকালে ইউরোপ ও পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন। উক্ত গবেষক তথা বিজ্ঞানী তার প্রবন্ধে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দুই শতাব্দীর মুসলিম বিশেষজ্ঞের প্রচেষ্টা ও গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ লেখা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং সেসবের পরিণাম তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও শ্রমের সকল ফসল নিজেরা আত্মস্থ করেছেন অথচ কোনো রেফারেন্স দেননি, কোনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেননি। এটা মস্তবড় জালিয়াতি এবং বিশ্বাসঘাতকতা। এবার আপনারাই বলুন, ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ায় নাকি পাশ্চাত্যের তথাকথিত বিজ্ঞানী ও গবেষকরা ছড়ায়? সংকীর্ণ মন কাদের? মুসলমানদের নাকি ওদের?

মুসলমানরা জ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধে যেতেই পারে না। মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানী। জ্ঞানের সন্ধানে তাকে বিশ্বব্যাপী ঘুরে বেড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা সে সম্পর্কে উদাসীন। সেটা অবশ্য ভিন্নকথা। তারা নিজেদের ঘরে খাবার রেখে ক্ষুধা নিবারণের জন্যে অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়। এটা হচ্ছে চূড়ান্ত অধঃপতন। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো অভিভাবক যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে জাতির কিসের অভাব? আমাদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা প্রয়োজন এবং তার হেফাযত করা প্রয়োজন।

অশ্রুসজল হযরত ওমর (রা.)

মানুষের জীবনে এখলাছ এবং পারস্পরিক ভালোবাসার গুরুত্ব অসামান্য। অনুভূতিশীল, দরদী মন যাদের রয়েছে তারাই মানুষের মূল্য দিতে জানে, মর্যাদা দিতে জানে এবং মানুষের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে জানে। হযরত ওমর (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী নোমান ইবনে মাকরানের (রা.) শাহাদাতের খবর পেয়ে শোকে কাতর হলেন। ইসলামের জন্যে নোমানের আত্মত্যাগ, শত্রুদের মোকাবেলায় প্রশংসনীয় ভূমিকা হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে ছিলো। হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে মলিন মুখে দাঁড়ালেন। তার দু'চোখ অশ্রুসজল। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। চেহারায় বিষণ্নতা। যারা দেখছিলেন তাদের চোখেও অশ্রু। খলীফা নোমান ইবনে মাকরানের (রা.) প্রশংসা করছিলেন। দৃশতঃ এটি একটি সাধারণ ঘটনা এবং হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনী লেখকরা এই ঘটনাটিকে সাধারণভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে লুকিয়ে আছে এক বিস্ময়কর সত্য। হযরত ওমর (রা.) সেদিন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ধর্মবিশ্বাস, দেশ এবং জাতির জন্যে যারা আত্মত্যাগ করেন তাদের পুরস্কার, উপঢৌকন, খেতাব, তমঘা দেয়াই যথেষ্ট নয়। এসব কিছুতে তাদের সেবার যথার্থ মূল্য নিরূপিত হয় না। বরং তাদের জন্যে মনের গভীর ভালোবাসার ফল্গুধারা থাকতে হয়। কবরের মাটির নীচে তারা চলে গেলেও তাদের কথা অন্তরে জাগরুক রাখতে হয়। এ ধরনের শাসকদের জনগণ অন্তর থেকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সম্মান

হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে 'ছাবেকুনাল আউয়ালুন' অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহাবাদের বিশেষ মর্যাদা ছিলো। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্মান আমাদের ইতিহাসে অসামান্য। হযরত ওমর (রা.) তাদের বিশেষ সম্মান করতেন। এখলাছসম্পন্ন আমল এবং

অসাধারণ আত্মত্যাগের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছিলেন যে, তারা দ্বীনের সত্যিকার সৈনিক। সংখ্যায় তারা ছিলেন কম, অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে ছিলেন দুর্বল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বিরাট শক্তির সাথে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। তারা প্রমাণ করেছিলেন যে, ঈমানের অস্ত্র অধিক শক্তিশালী এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা বস্তুগত অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে অধিক সিদ্ধান্তমূলক বিষয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরা পর্যন্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তারা বাতিলের দম্ভ গর্ব চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। তাদের এই সাফল্য ইসলামের সাফল্য এবং বিজয়ের চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) এই কথাটি সব সময় মনে রেখেছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী যদি কেউ থেকে থাকেন তারা ছিলেন উম্মাহাতুল মোমেনীন। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর বিবিরা।

উম্মাহাতুল মোমেনীন

উম্মতের মাতৃকুল উম্মাহাতুল মোমেনীন দুনিয়ার পার্থিব ধনসম্পদ, বিলাসিতা, আরামের উপকরণ ছেড়ে রসূল (স.)-এর জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন। কোরআনে তাদেরকে সকল উম্মতের মা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং রসূল (স.)-এর পর অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমগ্র উম্মত ছিলো তাঁদের কাছে সন্তান সমতুল্য। দান সম্মানের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতেন।

জাফর তাইয়ারের প্রতি সম্মান

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। উন্নত কাজে নিয়োজিত থাকা লোকদের সম্মানের পাশাপাশি তাদের অধীনস্তদেরও সম্মান দিয়েছিলেন। এর কারণ ছিলো এটাই যে, মানুষ বুঝতে পারবে ভালো কাজে, মহৎ কাজে জীবন দান করা হলে সেই আত্মত্যাগের দ্বারা তার বংশধররাও উপকার লাভ করে। এর ফলে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ আগ্রহ বেড়ে যায় এবং মন্দ কাজের আগ্রহে ভাটা পড়ে।

হযরত ওমর (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালেবকে যতোবার দেখতেন ততোবারই বলতেন 'আসসালামু আলাইকা ইয়া জিল জানাহাইন।' অর্থাৎ হে দুই পাখা বিশিষ্টের পুত্র তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত জাফর (রা.) মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং তার উভয় বাহু কেটে গিয়েছিলো। রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুটি পাখা দান করেছিলেন এবং সেই পাখায় ভর দিয়ে তিনি জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছেন। এ কারণেই হযরত জাফরকে বলা হতো জাফর তাইয়ার। প্রকৃত এই উপাধি ছিলো হযরত জাফরের (রা.) মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ।

উঠতি বয়সীদেরকে সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধান যখন সাধারণ মানুষের সামনে এভাবে সম্বোধন করে সম্মানিত করেন তখন পূর্ব পুরুষের কৃতিত্বে সেই নবীন গর্ব বোধ করে। তাদের মন ভরে যায় আনন্দে। তারা অনুভব করে যে, অন্য লোকদের চেয়ে তাদের সম্মান অনেক উঁচুতে। হযরত ওমর (রা.) মানুষের মনের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। তাঁর শাসনামলে মুসলিম মিল্লাত গৌরব ও সাফল্যের উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলো। তার শাসনামলে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের কোনো এলাকায় বিদ্রোহ বিপ্লব বা বিশৃংখলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। শাসকরা ছিলেন শাসিতদের কাছাকাছি। শাসকদের আহ্বানে শাসিতরা 'লাব্বায়েক' বলে হাযির হতেন। শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ব্যবস্থা সম্বলিত সৌভাগ্যপূর্ণ সেই যুগ ছিলো কতো মহান, কতো শ্রেষ্ঠ।

মোফাস্সেরে কোরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)

যে কোনো শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে আবশ্যক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের ন্যায্য পাওনা, সুষ্ঠু বন্টন এবং ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। ইসলামের রাষ্ট্রদর্শন এই মূলনীতির ওপর

প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার নিশ্চিত তো করা হয়ই, ওপরন্তু জ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদেরও বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়। অজ্ঞ অনভিজ্ঞ লোকরেদকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। বিশেষ বিষয়ে ফয়সালা করার জন্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতে হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, এক ব্যক্তি এমনভাবে তার তহবন্দ পরিধান করেছে যে, তার তহবন্দ মাটি স্পর্শ করে। তিনি লোকটিকে তার তহবন্দ উঁচু করে পরিধান করতে বললেন। লোকটি পাল্টা বললো হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আপনি নিজের তহবন্দ ঠিক করে পরিধান করুন। আপনিও তো নিজোর তহবন্দ টাখনু গিরার নীচে পরিধান করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, ভাই, আমার একটি সমস্যা আছে। আমার পায়ের গোড়ালি খুব সরু। হাঁটার সময়ে মানুষের নজরে পড়ে হাস্যকর দেখায়। কিন্তু তোমার তো এ রকম অবস্থা নেই। রসূল (স.) সম্ভবত এ কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) গোড়ালির নীচে পোশাক পরিধানের বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.) এবং লোকটির মধ্যকার কথার খবর জেনে লোকটিকে ডেকে আনালেন এবং কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে বললেন, ওই ব্যাটা, তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথা অবজ্ঞা করো আর তার সামনে যুক্তি খাড়া করো?

ওলামায়ে কেরাম এবং শরীয়ত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা মানব কল্যাণ চিন্তায় উপদেশ দেন, নসিহত করেন, পক্ষান্তরে নির্বোধ লোকেরা অহংকার এবং গর্বের প্রকাশ ঘটায়। এ ধরনের অবস্থায় সমকালীন শাসক যদি ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা গ্রহণ করেন, সঠিক ফয়সালা দেন তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং শাসক সফলতা অর্জনে সক্ষম হন।

হযরত বেলালের (রা.) আযান

হযরত ওমর (রা.) তার শাসনাধীন বিশাল সাম্রাজ্যের কোনো এলাকা সফরকালে জনগণকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আলোকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। রসূল (স.)-এর যুগ ছিলো সকল যুগের সেরা। সেই সময় ওহী নাযিল হতো এবং রসূল (স.) সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ের স্মৃতি ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে খুব প্রিয়। সিরিয়া সফরের সময় দীর্ঘদিন পর তিনি হযরত বেলালের (রা.) আযান শুনতে পান। রসূল (স.)-এর মুয়াযযিন বেলালের আযান শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর মন আবেগে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। রসূল (স.)-এর পবিত্র যুগের কথা স্মরণে আসে। দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নিজে কাঁদলেন, অন্যদেরও কাঁদালেন।

রসূল (স.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রমাণ এই ঘটনায়ও দিয়েছেন হযরত ওমর (রা.)। শুধু আযান শুনে কান্নায় কাতর হওয়া সহজ কথা নয়। এক সময় মদীনায় বেলালের আযান শুনতেন। মদীনা থেকে দূরে সিরিয়ায় সেই আযান শুনে চোখের সামনে অতীতের দৃশ্য ভেসে ওঠে। এটা মনের ব্যাপার, যাদের ওরকম মন আছে তারাই শুধু এই ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে। ওহী নাযিলের সময় ছিলো বরকতময় এবং শান্তি, সমৃদ্ধি এবং আযাব থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সময়। আল্লাহর এই নির্দেশ তাদের সামনে ছিলো যে, নবী তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদের আযাব দেবেন না। এই স্মরণ ছিলো কতো মাধুর্যমন্ডিত সেই সময়ের আলোচনা ছিলো কতো মধুময়।

এরপর সেই শান্তি ও নিরাপত্তা তুলে নেয়া হয়েছে। সেই পবিত্র পরিচ্ছন্ন সময়ের স্মৃতি মনের গভীর মূল্যবান মূলধনের মতো সঞ্চিত ছিলো, সেই সময়ের স্মরণ কল্যাণ ও মঙ্গলের পথনির্দেশ করেছিলো। কল্যাণের পথ প্রদর্শকদের মানুষ যতোদিন মনে রাখে ততোদিন মানুষের মধ্যে কল্যাণ

বিদ্যমান থাকে। সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে বা দুর্বল হয়ে গেলে পরিণামে দেখা দেয় বিশৃংখলা এবং নানারকম অশান্তি।

আল্লাহ তায়ালাই ইসলামের রক্ষক

ইসলামের শত্রুরা সবসময়েই সচেষ্ট থেকেছে যে, তারা ইসলামের পূর্ববর্তী পুণ্যশীলদের সাথে সমকালের লোকদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে। তারা ভালোভাবেই জানতো যে, এই ষড়যন্ত্র সফল হলে তারা মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন এবং ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের এই ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। পবিত্র কোরআন আমাদের দ্বীনের বুনিয়াদ এবং রসূল (স.) এই কোরআনের জীবন্ত মোজেযা। এই কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এই নসিহত নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযতকারী।'

রসূল (স.) বলেন, এই দ্বীন সব সময় টিকে থাকবে। মুসলমানদের একটি দল এই দ্বীনের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করবে। রসূল (স.) আরো বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যকার একটি দল সত্যের জন্যে রোজ হাশর সংঘটিত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং তারা শত্রুর ওপর জয়যুক্ত হবে।

জয়যুক্ত হবে বলতে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের জয় বোঝানো হয়নি, বরং যুক্তি প্রমাণে জয় এবং যুদ্ধে জয় দুটোই বোঝানো হয়েছে। আমরা সব মুসলমান এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে যা বলেছেন সবই সত্য। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, রসূল (স.)-এর সকল বাণীই সত্য। মুসলমানরা এখলাছের সাথে দ্বীনের পথে অগ্রসর হলে তারা এই সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আগামী দিনেও এই নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

আযানের গুরুত্ব ও মর্যাদা

কথায় কথা আসে। আযানের কথা আলোচিত হওয়ার পর পাঠকদের দৃষ্টি আযানের প্রতি আমি ফেরাতে চাই। আমি চাই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক খোলাখুলি ব্যক্ত করতে। আমার মূল উদ্দেশ্য এটাই। সাইয়েদেনা ওমর (রা.)-এর ওপর আমি লিখতে বসেছি ঠিকই কিন্তু আমি ঐতিহাসিক হিসেবে তার জীবনী লিখতে চাই না। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের চেয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি আমার সকল লেখায় এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে, একজন মুসলমানকে কি হতে হবে, ইসলাম কি চায়? আমি মনে করি এই বিষয়টি এতো ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে, এ সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। বর্তমানকালে দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ইসলাম চায় একরকম, মুসলমানদের আমল হচ্ছে অন্যরকম।

আযান হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর প্রতি বান্দাকে ডেকে নেয়ার আহ্বান। আযান মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাকে তোমার আসল মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে। তাঁর সামনে যাওয়ার পরও তোমাকে এরকম নম্রতার সাথে দাঁড়াতে হবে। তোমার মন, চিন্তা, দৃষ্টি, পোশাক হতে হবে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অন্য সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফেরাতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণা মনে জাগরুক রেখে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর এই ভঙ্গি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মাধ্যম। নামায কিছু আনুষ্ঠানিকতা এবং কিছু তৎপরতার নাম নয়। বরং নামায হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমরা জানি যে, নামাযের ওজন কতো, মূল্য কতো, মর্যাদা কতো। এর মাপকাঠিও আমাদের জানা আছে। যিনি নামায আদায়ের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারবেন তিনি বিনিময়ও পাবেন পুরোপুরি। যিনি কম করবেন, নামায অসম্পূর্ণভাবে আদায় করবেন, তিনি বিনিময়ও সে রকম পাবেন।

শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে আযান হচ্ছে আল্লাহর আদেশ। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হজ্জের জন্যে লোকদের আহ্বান করো।' কাজেই আমরা বুঝতে পারলাম যে,আযান শুধু মোয়াজ্জিনের আহ্বানই নয় বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াত। মোয়াজ্জিন আল্লাহর প্রতি ডাকেন। কোরআনের এই আয়াত মনে পড়ে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেই ব্যক্তির চেয়ে ভালো কথা কার হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়।'

রসূল (স.) আযান শোনার পর দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতে ওয়াচ্ছালাতিল কায়েমাতে।' অর্থাৎ হে আল্লাহ তায়ালা! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই এই নামাযের তুমিই প্রভু। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ওসিলা এবং ফযিলত দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করো, তুমি যার অংগীকার করেছো।

রসূল (স.) আযানকে পরিপূর্ণ দওয়াত অর্থাৎ দাওয়াতে তাম্মা বলেছেন। এ কারণে আযানের সময় পূর্ণ নীরবতা ওয়াজিব। আযানের সময় মুয়াজ্জিনকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, কেবলামুখী হয়ে আযান দিতে হবে। আযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায। মুয়াজ্জিনকে বিনিময় দেয়া যেতে পারে। এটা অবৈধ নয়।

ওপরে 'হা-মীম আস সাজদাহ' নামের সূরার যে আয়াতের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা.) বলেন, এই আয়াত মুয়াজ্জিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আযান দেয়ার ফযিলত অনেক। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, যদি খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমি আযান দেয়ার সময় পেতাম তবে অবশ্যই আযান দিতাম। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের সাহাবা। তারা উভয়ে বলেছেন, আযান দেয়া সম্ভব হলে আমরা তাকে ওমরাহ এবং নফল হজ্জ-এর চেয়ে বেশী প্রিয় মনে করতাম।

রসূল (স.) বলেন, আযানের আওয়ায যতো মানুষ, জ্বীন এবং অন্যান্য জিনিস শুনেছে তারা কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে। এই আযান বহু মানুষের কানে পৌঁছুতে পারে না, তারা শুনেও শোনে না, যেন তারা বধির। খেলতামাশায় তারা মশগুল থাকে, তারা গাফেল অমনোযোগী হয়ে থাকে। তারা নিজেদের দুনিয়াবী কাজে থাকে ব্যস্ত। তারা আযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে না। নামায আদায়ের সুযোগও তাদের হয়ে ওঠে না।

আযান শোনামাত্র আমরা নামাযের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকবো, এটাই আযানের দাবী। আমার সারাদেহ, দেহের প্রতিটি লোমকূপ আযানের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠবে, আযানের আওয়াজের প্রতি মনোযোগী হবে। আদব এবং ভয় জাগবে আমাদের মনে। রসূল (স.) আযান শোনার সাথে সাথে আশেপাশের সবকিছু থেকে বেখবর হয়ে যেতেন। শবে মেরাজে আযানের আওয়ায রসূল (স.) আকাশের ওপরে শুনেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারীকে স্বপ্নে আযান দেখানো এবং শোনানো হয়েছে।

হযরত ইমাম মালেক এবং তার সঙ্গীদের মতে মসজিদে এবং মিম্বরের কাছে আযান দেয়া ওয়াজিব। তাঁর কোনো কোনো সঙ্গীর মতে বড় বড় শহর এবং বড় গ্রামে আযান দেয়া ফরজে কেফায়া। কোনো কোনো ফেকাহবিদ আযানকে বলেছেন ফরয, কেউ কেউ বলেছেন সুন্নত। কোনো কেন আলেম বলেছেন মোসাফের যদি ইচ্ছে করে বা ভুল করে আযান ছাড়াই নামায আদায় করে তবে নামায হয়ে যাবে। মোটকথা আযানের ফযিলত ও মর্যাদা অসামান্য।

মোয়াযযিনের পুরস্কার

রসূল (স.) বলেছেন, তিন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন উন্নত মানের কস্তুরীর স্তূপের মধ্যে থাকবে এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে অবস্থান করবে। এর মধ্যে একজন হচ্ছে সেই

ব্যক্তি যিনি বিনা পারিশ্রমিকে নামাযে ইমামতি করেছেন। শুধু সওয়াব পাওয়াই ছিলো তার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি বিনা বেতনে শুধু সওয়াবের আশায় আযান দিয়েছে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি ক্রীতদাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়নি।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে করুণা করার মতো। আযানের আওয়ায শুনে আমরা মনে করি মুয়াযযিন আমাকে নয় অন্য কাউকে ডাকছে। আমরা শুনেও শুনি না। আযানের আওয়ায শুনে নামাযের জন্যে গেলেও মন থাকে অন্যমনস্ক ও আবেগশূন্য। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মন থাকে উদাসীন। আমরা শুধু একটা রসম-রেওয়ায আদায়ের জন্যে রওয়ানা হই। নামাযের সময় আমাদের মন মগজ নামাযের প্রতি মনোযোগী থাকে না। নামায শেষে নামাযের কোনো প্রভাব আমাদের জীবনে প্রকাশ পায় না। আল্লাহর নৈকট্য লাভেও আমরা সক্ষম হই না এবং যেসব কাজ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে সেসব কাজ থেকেও আমরা বিরত থাকি না।

হে মুসলিম সমাজ। নামাযের প্রতি যদি আমরা এ ধরনের আচরণ অব্যাহত রাখি তবে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। যারা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তারাই পায় এবং তারাই পাবে। তারা কারা? তারা হচ্ছে সেইসব লোক যারা পরম করুণাময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে এবং তাঁর কাছে সুস্থ পরিচ্ছন্ন মনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। আমরা অনেক নীচে নেমে গেছি। নামাযের প্রাণশক্তি, নামাযের রূহ না থাকায় নামায আদায় করেও আমরা কিছু পাই না। হযরত আবুযর গেফারী (রা.) বলেছিলেন, আমি যদি নিশ্চিত বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এক ওয়াক্তের নামায কবুল করেছেন তবে সেটা আমার কাছে এই দুনিয়া এবং এর যাবতীয় কিছু পাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা শুধু মুত্তাকি লোকদের এবাদাত এবং সদকা কবুল করে থাকেন।

আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমরা যেন আযানের আওয়ায শোনার সাথে সাথে সব কাজ ছেড়ে আমাদের মওলার সামনে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। বান্দা এবং তার মনের মাঝখানে সেই পরম প্রভু আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান। আযান শোনার আগেই আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তাবেঈদের নেতা হযরত সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব (রহ) বলেছেন, গত ত্রিশ বছর যাবত আমি কোনো আযান আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থানরত অবস্থায় শুনিনি। অর্থাৎ প্রত্যেক আযানের আগেই আমি মসজিদে চলে যেতাম। সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব একটি ভালো সময়ে জীবন কাটিয়েছেন। বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যুগেও আমরা ওই রকমের মানুষই চাই। কারণ আমরা জানি মুক্তি এবং শান্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া।

হযরত ওমর (রা.) আযানের গুরুত্ব এবং আযান শোনার ওয়াজিব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জুমার দিনের জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার আগে বাজারে এই ঘোষণা প্রচার করতে হবে যে, আযানের সময় হয়ে গেছে। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিলো মানুষ যেন কাজকর্ম বন্ধ রেখে মসজিদে ছুটে যায়। তারপর সবাই মসজিদে এলে যেন আযান দেয়া হয়। হযরত ওসমান (রা.) তার খেলাফতকালে জুমার দুটি আযানই মসজিদের ভেতরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমাদের পূর্ববর্তীকালের পুণ্যবানেরা আযানের মূল্য ও মর্যাদা জানতেন। সাঈদ ইবনে মোসাইয়েবকে বলা হয়েছিলো যে, তারেক আপনাকে হত্যা করতে চায় কাজেই আপনি আত্মগোপন করুন। তিনি বললেন, এমন কোনো জায়গা কি আছে যেখানে আল্লাহর ফয়সালা এবং তকদীরের লিখনের বাইরে আমি আত্মগোপন করতে পারি? তাকে বলা হলো যে, আপনি নিজের গৃহে অবস্থান

করুন। তিনি বললেন, আমি 'হাইয়াআলাল ফালাহ' অর্থাৎ সাফল্যের পথে এসো এই আহ্বান শুনেও চুপচাপ ঘরে বসে থাকবো? আযান শুনে নামাযের জন্যে ছুটে যাওয়া সাঈদ ইবনে মোসাইয়েবের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিলো, বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

রাবী ইবনে হায়সাম ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী। তার প্যারালাইসিস হয়েছিলো। হাত পা ছিলো শক্তিহীন। তিনি বারবার বলতেন, আমাকে তুলে নিয়ে মসজিদে তোমরা রেখে আসো আমি যেন জামায়াতে নামায আদায় করতে পারি। তাকে বলা হলো যে, আপনি মাজুর মানুষ। এরূপ অবস্থায় আপনার জামায়াতে না গেলেও গুনাহ হবে না। তিনি বললেন, আমিতো সেটা জানি। কিন্তু সাফল্যের পথে এসো বলে মুয়াজ্জিন যখন ডাকে সেই ডাক শুনে কি করে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি?

কয়েকজন মোফাসসের সূরা ইনশিরাহ-এর এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি- এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এর দ্বারা আযানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীন আযানের মাধ্যমে রসূল (স.) এর নাম জীবন্ত এবং সমুন্নত করে দিয়েছেন। এতে আযানের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সূরা ফাতের-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ।' (সূরা ফাতের, আয়াত ৩২)

মোফাসসেরদের মতে কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা জামায়াত শুরু হওয়ার পর মসজিদে আসে। মধ্যপন্থী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা আযান হওয়ার পরে মসজিদে আসে। আর কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা আযানের আগে মসজিদে পৌঁছে যায়।

বর্তমানে তো আমাদের অবস্থা বলার মতো নয়। আমরা আমাদের মালিকের কাছ থেকে বহু দূরে চলে গেছি। ফলে তার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া আমাদের ভাগ্য লিখনে পরিণত হয়েছে। এই গাফেলতির ঘুম যদি আমাদের না ভাঙ্গে তবে আমাদের নিজস্ব পরিচয়ই ধীরে ধীরে মুছে যাবে। কোরআনের সেইসব আয়াত আমরা পাঠকরি যেসব আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সেইসব হাদীস পাঠ করি যেসব হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে অথচ সেসব পাঠ করেও আমরা থাকি নির্বিকার। মনে হয় আমরা এই খেয়াল করে রেখেছি যে, এসব আয়াত এবং হাদীসে অন্য কাউকে সম্বোধন করা হয়েছে, আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি।

হযরত ওমর (রা.) কোরআনের আয়াত এবং হাদীস পাঠ করে ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন। প্রতিটি আয়াত এবং হাদীস পাঠ করে তিনি মনে করতেন যে, এখানে আমাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আমার সাহাবাদের মধ্যে একজন রয়েছে, আমার ওফাতের পর সে আমাকে দেখবে না আমিও তাকে দেখব না। এই হাদীস শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) উম্মে সালমার কাছে যান এবং জানতে চান যে আপনার বর্ণনা করা একটি হাদীস আমি শুনেছি। আমার ধারণা এই হাদীসে আমাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আপনি কি বলেন? উম্মে সালমা (রা.) বললেন, না এই হাদীস তোমার সম্পর্কে নয়। এই হাদীস সম্পর্কে তোমার পরে আর কাউকে আমি কোনো প্রশ্নের জবাব দেবো না।

হযরত ওমর (রা.) একটি হাদীস শুনেছিলেন সেই হাদীস ছিলো একজন ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সেই হাদীসে কারো নাম নেয়া হয়নি। হযরত ওমর (রা.) ভয়ে কেঁপে উঠলেন। অথচ তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার হাতে পাথরের টুকরো পর্যন্ত তসবীহ পাঠ করতো। আযান হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ দাওয়াত। এই দাওয়াত আমরা শুনি অথচ আমাদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। যদি নামায আদায় করি তবে দেখা যায় হুযুরী কলব অনুপস্থিত, শুধু রসম বা নিয়ম পালন

করা হচ্ছে। এমন গুরুতর রোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা যে রোগে আক্রান্ত এই অনুভূতি পর্যন্ত আমাদের নেই।

ইসলামী সমাজে মসজিদের মর্যাদা ও ভূমিকা

হযরত ওমর (রা.) মনে প্রাণে কামনা করতেন যে, মানুষ মসজিদের প্রতি মনোযোগী হোক এবং মসজিদে দিনরাত যেকের-ফেকের, তেলাওয়াত, এবাদাত চলতে থাকুক। তিনি মসজিদে আলোর ব্যবস্থা করেন। রমযাস মাসে মসজিদে বেশী আলোর ব্যবস্থা করা হতো কারণ মসজিদ সেই সময় মাদ্রাসা হিসেবেও বিবেচিত হতো। হযরত ওমর (রা.)-এর এই উদ্যোগ এবং ব্যবস্থা সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) তার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-এর কবরকে সেই রকম আলোয় আলোকিত করে দিন যে রকমভাবে তিনি আমাদের মসজিদগুলোকে আলোকিত করেছেন।

মসজিদকে আলোকিত করা আসল উদ্দেশ্য হতে পারে না। বর্তমানে আমরা মসজিদকে চমৎকার আলোয় আলোকিত করে রেখে নিজেরা মসজিদের বাইরে থাকি। বেশী বেশী সময় মসজিদে থাকার জন্যে হযরত ওমর (রা.) লোকদের তাকিদ দিতেন। তিনি চাইতেন যে, লোকদের মসজিদে বসে যেকের-ফেকের, তেলাওয়াত, এবাদাত করতে থাকবে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোমর সোজা করার জন্যে, কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে মসজিদেই শুয়ে পড়বে। এতে কোনো দোষ হবে না।

বর্তমানকালে মুসলমানরা যদি মসজিদের প্রতি মনোযোগী হয় তবে তাদেরই ভালো হবে। মসজিদ শুধু এবাদতের জায়গাই নয় বরং জ্ঞান চর্চারও পীঠস্থান। মোসাফেরদের থাকার জায়গা এবং শিক্ষাদান ও গ্রহণের কেন্দ্র। মনের খোরাক ও রূহানী উন্নতির জায়গাও এই মসজিদ। মোটকথা, মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার সব রকমের কল্যাণ মসজিদের সাথে সম্পর্কিত।

মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদের খেদমত উচ্চাঙ্গের কাজ। এই কাজ করে কোনোপ্রকার সুখ্যাতি বা প্রশংসা পাওয়ার আশা করা যাবে না। বরং এই কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় করতে হবে। মানুষের কাছে কি আছে যা পাওয়ার আশা করা যায়? যা কিছু আছে সবই আছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যধারণ করে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।' (সূরা নাহল, আয়াত ৯২)

দ্বীনে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি নেই

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন খলীফা রাশেদ। আল্লাহর আইনের শাসন প্রবর্তনে বাস্তবায়নে তিনি কোনোপ্রকার শিথিলতা বরদাশত করতেন না। তবে সাধারণত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে তিনি কোনোকাজে বাধ্য করতেন না। তিনি জবরদস্তির পরিবর্তে নসিহত এবং উপদেশ দিতেন। এভাবে কাজ করাতেন। ক্রীতদাসদের ওপরও কোনোপ্রকার জোরজবরদস্তি করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য এবং কুদরত সত্ত্বেও মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'দ্বীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই, সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে পৃথক হয়েছে।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো বলেন, 'তবে কি তুমি মোমেন হবার জন্যে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?' (সূরা ইউনুস, আয়াত ৯৯)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এবাদাত এবং আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল তাদের সামনে পূর্ণভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তবে সত্য কিংবা মিথ্যা, হক কিংবা বাতিল গ্রহণে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বলো, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের

কাছ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' (সূরা কাহাফ, আয়াত ২৯)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সত্যিকার মালিক। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বীনের ব্যাপারে কোনো প্রকার জোর জবরদস্তির পরিবর্তে মানুষকে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় মানুষ কেন অন্যের ওপর দ্বীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করবে? হযরত ওমর (রা.)-এর একজন ক্রীতদাস ছিলো। তার নাম ছিলো আশেক। সেই ক্রীতদাস নিজে বর্ণনা করেছে যে, হযরত ওমর (রা.) আমাকে বলেন, হে আশেক! মুসলমান হয়ে যাও। যদি তুমি মুসলমান হও তবে তোমার কিছু কিছু দক্ষতা এবং যোগ্যতা দ্বারা আমরা মুসলমানরা উপকৃত হতে পারবো। অর্থাৎ আমাকে কোনো সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু আমি রাযি হইনি। আমার রাযি না হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) কখনো আমার প্রতি বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। তিনি কখনো আমার সমালোচনা করেননি।

ইসলামের বিশালতার এটাই প্রমাণ। কথায়, কাজে, চিন্তায় ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন তার সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম তাঁকে সংযম শিখিয়েছে। তিনি কোনো অসহায় মানুষকে এভাবে বাধ্য করেননি যে, সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। একজন ক্রীতদাস পর্যন্ত আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর অনুরোধ রক্ষা করেননি। অথচ তিনি কিছুই মনে করেননি। এটাই হচ্ছে সত্যিকার স্বাধীনতা এবং সত্যিকার ন্যায়নীতি ও ইনসাফ।

হযরত ওমর (রা.)-এর দূরদৃষ্টি

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার জীবন্ত প্রমাণ। এই তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন যোগ্যতা দিয়েছিলেন যে, তিনি কোনো কাজেই ব্যর্থ হতেন না। তিনি আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতেন। তাঁর ধারণা সঠিক এবং তার ফয়সালা সত্যভিত্তিক হতো। তিনি মানুষের চেহারা এবং কপাল দেখে তাদের বৈশিষ্ট্য ভালো কি মন্দ, দোষী কি নির্দোষ সেটা বলে দিতে পারতেন। আবু সাফরা নামক এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে হাযির হলেন। আগন্তুকের দশটি সন্তানও ছিলো তার সাথে। আবু সাফরার সন্তানদের হযরত ওমর (রা.) মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটি সম্পর্কে বললেন, আবু সাফরা তোমার এই ছেলেটি কওমের সর্দার হবে। এর মধ্যে অসাধারণ গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে। মাহলাব নামের সেই ছেলেটি ছিলো খুবই ছোট। পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা.)-এর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। মাহলাব ইবনে আবু সাফরা ইসলামের ইতিহাসে নেতৃত্বে প্রতিভায় যোগ্য আসন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ ধরনের দূরদৃষ্টির কারণে হযরত ওমর (রা.) সবসময় মানুষের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকতেন। খুব কম সময়ের মধ্যে মানুষের সমস্যা সমাধান করে দিতেন। যারা কোনোপ্রকার অভিযোগ নিয়ে আসতো বা বিপদগ্রস্ত হয়ে আসতো তাদের কারো সাথেই খারাপ ব্যবহার করা হতো না। নম্র ভদ্র ব্যবহার করা হতো। আগন্তুকদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা ছিলো তার দরবারে স্বাভাবিক নিয়ম।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে মোজার ওপর মসেহ করা জায়েয কি না এটা জানার জন্যে গিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) এই প্রশ্ন শুনে কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গেলেন। এরপর এস্তেঞ্জা করে ওযু করলেন। ওযুর সময়ে মোজার ওপর মসেহ করলেন। প্রশ্নকারী বললেন, আমি তো শুধু মৌখিক জবাব

জানতে চেয়েছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমার প্রশ্নের প্রামাণিক জবাব দিয়েছি এবং তখন আমি তোমার কারণেই উঠে গিয়েছিলাম।

অনেক লোক এমন রয়েছে যারা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করে। অথচ সঠিক তথ্য জানেও না। এটা ভালো কথা নয়। প্রশ্ন করলে মানুষের মান কমে না। প্রশ্ন করার সাথে সাথে যারা মানুষের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয় এবং চাওয়ার সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে তারা কতোই যে মহৎ।

হযরত ওমর (রা.)-এর মোমেনসুলভ দূরদৃষ্টি রাষ্ট্রশাসনেও তাকে সহায়তা করতো। নিজের মনোনীত গবর্নরদের প্রতি তীক্ষ্ণ নযর রাখতেন। একবার হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমার গবর্নরদের মধ্যে কেউ কি মোনাফেক আছে? হযরত হোযায়ফাকে (রা.) রসূল (স.) মোনাফেকদের সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ কারণে তিনি মোনাফেকদের পরিচয় জানতেন। তিনি খলীফাকে বললেন, হ্যাঁ একজন আছে। খলীফা ওমর (রা.) জানতে চাইলে হযরত হোযায়ফা (রা.) বললেন, আমি কিছুতেই তার নাম উচ্চারণ করবো না রসূল (স.) যেহেতু মোনাফেকদের চিহ্নিত করতে হযরত হোযায়ফাকে (রা.) নিষেধ করেছিলেন এজন্যে হযরত হোযায়ফা (রা.) মোনাফেকদের চিহ্নিত করেননি। হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) সেই গবর্নরকে বরখাস্ত করেন। তিনি যেন বুঝেই ফেলছিলেন যে, তার গভর্নরদের মধ্যে কে মোনাফেক রয়েছে। বিষয়টি বিস্ময়কর ছিলো না। কেননা রসূল (স.) বলেছেন মোমেনের দূরদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করো, নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর দেয়া নূরের সাহায্যে দেখতে পায়। রব্বুল আলামীন বলেন, 'অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে।' (সূরা হেজর, আয়াত ৭৫)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেন, আল্লাহর কিছু বান্দা এমন রয়েছে যারা নিজেদের দূরদৃষ্টি এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব জানতে পারে।

জন্মের পরপরই পরিত্যক্ত নবজাতক এবং পরিচয়হীন বা লাওয়ারিস শিশুদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) চিন্তিত হন। তিনি বলেন যে, এরা তো নিষ্পাপ এবং এরাও আমার শাসিত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত। এসব শিশুদের ভরণ-পোষণের জন্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ দেয়া হতো এবং তাদের ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হতো। এসব শিশুদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং এদের দেখাশোনার জন্যে তিনি সব সময় নসিহত করতেন।

এ ধরনের উন্নত মানবীয় চরিত্র বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এতিম, মুহাযির, অসহায়, মেসকিন, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিধবা দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। এদের দেখার কেউ নেই। সাহায্য করার কেউ নেই। কোথায় হযরত ওমর (রা.)-এর আদর্শ আর কোথায় আজকের সমাজ! বহু মুসলমানই আজ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে অন্যের প্রতি তাকায় না। এটা বড়ই পরিতাপের কথা।

মেহেরবান হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) মুসলমানদের ওপর ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান। দ্বীনী এবং দুনিয়াবী সকল বিষয়ে মুসলমানদের সমস্যা নিরসনে, কষ্ট নিবারণে তিনি থাকতেন সদা সচেষ্ট। মানুষ নিজের জন্যে কঠিন পথ বেছে নিলে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সহজ পথ দেখিয়ে দিতেন। বশর ইবনে ফাখিফ বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, আমি আপনার কাছে বাইয়াত করছি। সব বিষয়েই অর্থাৎ যা আমি পছন্দ করি না আর যা আমি পছন্দ করি সব বিষয়ে আপনার আনুগত্য করবো। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে শুধরে দিয়ে বললেন, এভাবে বলো না। বরং বলো যে, আমি যথাসাধ্য আপনার আনুগত্য করবো।

হযরত ওমর (রা.) নিজে কঠোর অনুশীলনের জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তিনি অন্য মানুষদের জন্যে জীবনকে সহজ করতে সচেষ্ট থাকতেন। কঠোরতার ঢোল অন্যদের জন্যে বাজাতেন না। সস্তা জনপ্রিয়তার আশায় যারা বড় বড় দাবী করে সময়ে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তখন বোঝা যায় তারা কতো নিরর্থক এবং অন্তঃসারশূন্য।

দৃষ্টান্তমূলক শাসন ব্যবস্থা

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত ছিলো সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্তমূলক। সব বিষয়েই খলীফা নিজেকে মনে করতেন জবাবদিহিতার মুখাপেক্ষী। প্রজাদের শাসন ব্যবস্থা মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। প্রশাসনিক সকল প্রতিষ্ঠান ছিলো সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থায় হযরত ওমর (রা.) উন্নতি সাধন করেন। সড়ক পথসমূহ ছিলো নিরাপদ ও নিষ্কন্টক। সড়ক নির্মাণে কোনো কারচুপি হতো না, একারণে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও কোনো সড়কে ভাঙ্গন বা ফাটল দেখা যেতো না। মিসর থেকে মদীনার দূরত্ব ছিলো অনেক। একারণে মিসর থেকে খাদ্যশস্য মদীনায় পরিবহনে হযরত ওমর (রা.) জাহাজের ব্যবস্থা করেন। সামুদ্রিক জাহাজে জার বন্দর পর্যন্ত খাদ্যশস্য পৌঁছাতো। তারপর উটের পিঠে একদিন একরাত সময়ে সেই খাদ্যশস্য মদীনায় পৌঁছাতো। জার ছিলো লোহিত সাগরের সমুদ্রবন্দর।

হযরত ওমর (রা.)-এর এই ব্যবস্থার আগে মিসর মদীনার যোগাযোগ সড়কপথে সম্পন্ন হতো। এতে প্রচুর কষ্ট হতো এবং বহু সময় ব্যয় হতো।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে তার দ্বার সকলের জন্যে থাকতো উন্মুক্ত। যে কোনো অভিযোগ কেউ নিয়ে এলে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হতো এবং তার প্রয়োজনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে প্রতিকার করা হতো। কোনো ব্যক্তিকে অন্য কারো ওপর প্রাধান্য দেয়া হতো না। সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হতো। সবাই একটা সাধারণ বিষয়ে অবহিত ছিলো যে, মোত্তাকী এবং পরহেজগার ব্যক্তিকে অধিক সম্মান করা হতো। পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া ব্যক্তি এবং জেহাদে অংশ গ্রহণকারী মোজাহেদদের বিশেষ সম্মান দেয়া হতো। এছাড়া খলীফার দরবারে প্রাধান্য পাওয়ার অন্য কোনো মাপকাঠি ছিলো না বরং সবাইকে সমান নজরে দেখা হতো।

অধিকার বঞ্চিত লোকের মনে ক্ষোভ জমে থাকে এ কারণে নানা অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দেয়। উম্মতের সেবায় যার ভূমিকা প্রশংসনীয় তাকে অধিক প্রাধান্য দেয়া হলে এর একটা ইতিবাচক ফল দেখা দেয়। মানুষ পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। অন্যায়ের ওপর ন্যায়, মিথ্যার ওপর সত্য প্রাধান্য পেতে থাকে। জুরাইদ ইবনে হাযেম ইবনে হাসান থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে কয়েকজন লোক এসে হাযির হলো। তাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা এবং প্রবীণ কোরায়শরাও ছিলেন। তারা ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সোহায়েব, খাব্বাব, আম্মার এবং বেলালকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান, হারেস ইবনে হেশাম এবং সোহায়েল ইবনে আমর বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, শেষোক্ত তিনজন মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, আজকের দিনের আগে আমি আমার অমর্যাদা আর কখনো দেখিনি। কোরায়শ নেতারা বাইরে বসেছিলেন অথচ এক সময়ের ক্রীতদাসদের ভেতরে ডাকা হলো। আবু সুফিয়ানের কথা শুনে বুদ্ধিমান এবং মোত্তাকি সোহায়েল ইবনে আমর বললেন, তোমাদের চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু রাগ যদি করতে হয় তবে নিজের ওপর করো। সকল মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। ওরা এগিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো অথচ তোমরা তখন পিছিয়ে গিয়েছিলে।

তোমাদের আগে খলীফার দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে। এতেই তোমরা অসন্তুষ্ট হয়েছো। কিন্তু ওরা তোমাদের চেয়ে এতো বেশী এগিয়ে গেছে যে, যদি তোমরা সেই আগে যাওয়ার এবং তোমাদের অবস্থানের পার্থক্য দেখতে পেতে তবে তোমাদের অনুশোচনার সীমা থাকতো না। ওরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রাধিকার এবং আল্লাহর পথে জেহাদে অংশ নিয়ে তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এখন তোমাদের সামনে একটাই পথ আছে। তোমরা জেহাদে অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারো। হয়তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শাহাদাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

এই ঘটনার পর হযরত সোহায়েল (রা.) সিরিয়ায় গিয়ে ইসলামী বাহিনীর সাথে শামিল হন এবং যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। বর্ণনাকারী জুরাইদ ইবনে হাযেম ইবনে হাসান উক্ত ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, আল্লাহর শপথ, সোহায়েল সত্য কথাই বলেছিলেন। যে বান্দা আল্লাহর পথে দ্রুত এগিয়ে যায় ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে অনেক দেরিতে ইসলাম গ্রহণকারী কিভাবে তার সমমর্যাদায় উন্নীত হতে পারে?

মর্যাদার মাপকাঠি যদি নৌকা এবং পুণ্যশীলতা নির্ধারণ করা হয় তবে সমাজ ঠিকভাবে চলতে পারে। পক্ষান্তরে যদি দাপট, প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে মর্যাদার কম বেশী করার মাপকাঠিরূপে নির্ধারণ করা হয় তবে পথ বিগড়ে যায়। আসল বিষয় হচ্ছে নেক আমল এবং পুণ্যশীলতা। অন্য কোনো বৈষয়িক বস্তু এর বিকল্প হতে পারে না। সূরা যিলযালে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে সে তাও দেখবে।' সূরা যিলযাল, আয়াত ৭, ৮)

কর্তব্য পালনে পরিতৃপ্তি

শাসক হিসেবে হযরত ওমর (রা.) তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে সদা ব্যস্ত থাকতেন। অনেক পুণ্যবান শাসকই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। এখনো অনেকে সেই নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) ব্যতিক্রম এ কারণেই যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি তৃপ্তি অনুভব করতেন। তার কাছে এই দায়িত্ব পালন ছিলো এবাদতের অংশ। প্রজাদের জন্যে ভালোবাসা এবং সৎকাজে পুণ্য অর্জনে সব সময় আগ্রহী থাকা ছিলো তার স্বভাবধর্ম। তিনি খেলাফতের ভারি বোঝা বহন করছিলেন। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তিনি এতোটা তৎপর থাকতেন যে, নিজের বোঝা ভারি হওয়া সত্ত্বেও অন্যের বোঝা বহনে তৈরি থাকতেন। হকদারকে তার হক যথাযথভাবে তিনি পৌঁছে দিতেন। রাত্রিকালে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন এবং মানুষের অবস্থা জেনে তার প্রতিকার করতেন। এ জন্যে নিজের কাঁধে বোঝা বহন করতেন।

একবার হযরত ওমর (রা.) নিজে রেজিস্ট্রার নিয়ে বনু খাজাআ গোত্রের লোকদের কাছে কাদির নামক জায়গায় গেলেন। সেখানে তাদের ভাতা পরিশোধ করে বলেন, এটা তাদের হক, আমি তো সেই হক আদায় করেছি। তারা ভাতা পেয়ে যতোটা খুশী হয়েছে, আমি পরিশোধ করে তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছি। তোমরা আমার প্রশংসা করো না, আমি তো আমার কর্তব্য পালন করেছি।

হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসৃত আদর্শের তুলনা কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যাবে? রাষ্ট্রপ্রধান নিজে খাদ্যশস্য অভাবগ্রস্তদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন অথচ এই ঘটনার কোনো সরকারী ঘোষণা নেই, কোনো প্রচার নেই, কোনো প্রশংসা নেই, কোনো মানপত্র নেই। আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে তিনি ছিলেন ভীত। তিনি জানতেন, বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর কি কি দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

অথচ আজ আমরা কি দেখতে পাই? শোষিত বঞ্চিত মানুষ জুতোর তলায় করেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। কেউ কেউ কিছু অধিকার পেলেও অধিকাংশই থাকছে বঞ্চিত। প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মনে যদি আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে তবে হকদার তাদের হক পেতে পারে। কিন্তু যদি শাসনকাজে নিযুক্তদের মনে আল্লাহর ভয় না থাকে তবে কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব একদিকে সহজ, অন্যদিকে কঠিন। শাসকদের মনে মগজে আল্লাহর ভয় নেই, কিন্তু সেকথা বলার বা তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মতো সাহসও কারো নেই।

কখনো কঠোর কখনো কোমল

হযরত ওমর (রা.) কঠোর স্বভাবের মানুষ ছিলেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি কোমলতাও ছিলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনে তিনি এতো কঠোর ছিলেন যে, সে সময় মনে হতো তার চেয়ে কঠোর আর কেউ নেই। আবার প্রয়োজনে তিনি এতো কোমল ছিলেন যে, তখন মনে হতো তার চেয়ে কোমল অন্য কেউ হতে পারে না। একবার ব্যভিচারের অভিযোগে দুই অবিবাহিত যুবক যুবতীকে আটক করা হলো। উভয়কে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হলো। শাস্তি দেয়ার পর হযরত ওমর (রা.) যুবককে বললেন, মেয়েটিকে বিয়ে করে নাও। যুবক রাযি হলো না। হযরত ওমর (রা.) যুবককে কিছুই বললেন না। কারণ আল্লাহর আইন অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি দেয়ার পর সর্বোচ্চ শাসক হয়েও তিনি যুবকের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

বর্তমান যুগে অপরাধের শাস্তি দেবার মতো কেউ নেই। কাজেই সতীত্ব রক্ষার জন্যে মুসলিম তরুণীদের সতর্ক থাকতে হবে। জীন শয়তান, আর মানুষ শয়তানে চারদিক ছেয়ে আছে। নারীর ইযযত-সম্মান আজ নিরাপদ নেই। তারা জানে না যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সবাইকে করতেই হবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তিনি সব দেখেন, সবার সব কাজের খবর রাখেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে কঠিন এক দিনে হাযির হয়ে সবাইকে সব কাজের জবাব দিতে হবে।

সময় বড়োই মূল্যবান

হযরত ওমর (রা.) প্রজাদের সকল ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। পিতামাতা এবং অভিভাবকরা যেভাবে সন্তানদের প্রতি নযর রাখেন হযরত ওমর (রা.) জনগণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তেমনি নযর রাখতেন। জনগণ কিভাবে সময় কাটাবে সে বিষয়েও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। কখনো তিনি স্নেহের স্বরে জনগণকে বোঝাতেন, কখনো চাবুক দেখিয়ে শাসনের সুরে বোঝাতেন। বেশী রাত পর্যন্ত জেগে থাকা তার পছন্দনীয় ছিলো না। তিনি লোকদের বলতেন এশার পর পরই ঘুমোবার অভ্যাস করে সকালে জেগে উঠতে। সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তুলতে। তার শাসন এলাকায় বাহুল্য কাজ এবং বাহুল্য কথার কোনো স্থান ছিলো না। তিনি জানতেন সময় এক অমূল্য সম্পদ এবং নেয়ামত। এই সময় অহেতুক কাজে নষ্ট করা উচিত নয়। এশার নামাযের পর গল্প বলা এবং গল্প শোনার আসর বসানো হযরত ওমর (রা.) পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন প্রথম রাত কিসসা কাহনীতে সময় কাটিয়ে শেষ রাতে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকো। এশার নামাযের পর কেরামান কাতেবিনকে কিছু আরাম করার সুযোগ দিয়ো।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতকে বিশেষ হেকমত এবং কৌশলের সাথে সৃষ্টি করেছেন। বান্দাদের কল্যাণ সাধনে তিনি ছিলেন তৎপর। তিনি তাঁর বান্দাদের লাভ-ক্ষতি ভালোই জানেন। দিবসকে কাজের জন্যে, রাতকে আরাম এবং বিশ্রামের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন। সন্ধ্যারাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া ব্যক্তি সকালে ফ্রেশ হয়ে কাজে বের হতে পারে। ক্লান্তি, তন্দ্রা তাদের কাহিল করে না। গভীর রাত পর্যন্ত আসর জমিয়ে সময় কাটানো লোকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রসূল (স.) এশার আগে ঘুমানো এবং এশার পর জেগে থাকা পছন্দ করতেন না।

হযরত ওমর (রা.) বেশী রাত করে না ঘুমানোর নির্দেশ দেয়ার সময় কোরআনের এই আয়াতের কথা মনে রেখেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অবশ্য রাত্রিকালে প্রবৃত্তিকে দমিত করে উত্থান প্রবলতর এবং বাক্যস্ফূরণে সঠিক।' (সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত ৬)

রাতের নীরবতায় এবাদতে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অখন্ড মনোযোগ দেয়া যায়। সে সময়ের মানসিক প্রশান্তি অবর্ণনীয়। মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, চোখ, কান, হৃদস্পন্দন সবকিছু আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে। রুকু, সেজদা, কিয়াম তেলাওয়াতে, দোয়ায়, মোনাজাতে অপার্থিব প্রশান্তি পাওয়া যায়।

যুব সমাজের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) সুস্থ জীবনবোধ দেখতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি চাইতেন যুব সমাজ ভেতরে বাইরে সবদিক থেকেই ইসলামের বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত হোক। এক যুবককে ময়ুরের চলার ঢং-এ পথ চলতে দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, কিহে, তুমি অসুস্থ নাকি? সে বললো, না আমীরুল মোমেনীন আমি সুস্থ। হযরত ওমর (রা.) তাহলে ওভাবে হাঁটো কেন? পুরুষ মানুষের মতো পৌরুষদীপ্তভাবে হাঁটতে পারো না?

হযরত ওমর (রা.) জনগণের মধ্যে সাধারণ এবং বিশেষ লোকদের নসিহত করতেন, উপদেশ দিতেন। উম্মাহাতুল মোমেনীনদের মর্যাদা কারো অজানা নয়। হযরত ওমর (রা.) একদিন নামাযে ইমামতির সময়ে সূরা আহযাব পাঠ করেন। নবী সহধর্মিনীদেরকে 'হে নবীর স্ত্রীরা' বলে যেখানে সম্বোধন করা হয়েছে সেই আয়াত থেকে তিনি জোরে তেলাওয়াত করেন। নামায শেষে মুসল্লিরা জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, উম্মাহাতুল মোমেনীনদের সেই কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়া আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে কথাগুলো আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্বোধন করে বলেছেন। মোমেন পুরুষ এবং নারীদেরকে ভালোকথা বেশী বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এতে তাদের যথেষ্ট উপকার হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কারণ উপদেশ মোমেনদেরই উপকারে আসে।' (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া

একবার হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে দাম্পত্য কলহে লিপ্ত এক দম্পতি উপস্থিত হলো। স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির অভিযোগ করছিলো এবং মীমাংসার চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামীর সাথে কিছুতেই তার ঘরে যেতে চাচ্ছিলো না। সে তালাক চাচ্ছিলো। হযরত ওমর (রা.) স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন জনবিরল ভয়াবহ স্থানে একটি ঘরে একা রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন সকালে উভয়কে উপস্থিত হতে বললেন। উপস্থিত হওয়ার পর তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন রাত কাটালে? মহিলা বললো, ওই ব্যক্তির ঘরে যাওয়ার পর থেকে গতরাতের মতো শান্তিপূর্ণ রাত আমার জীবনে একটিও আসেনি। মহিলার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) পুরুষটিকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে তুমি তালাক দিয়ে দাও। কানের একটা রিংও যদি সে দেয় তবু তুমি মেনে নাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খোলা তালাক অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দেয় সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মোহরানার দাবী মাফ করে দিতে হয় এবং যৎসামান্য অর্থ বা অন্য কিছু জিনিস স্বামীর হাতে দিতে হয়।

হযরত ওমর (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এমন প্রচন্ড ঘৃণাবোধ নিয়ে স্বামী স্ত্রী একত্রে সংসার করা অসম্ভব। ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক কোনো দিক থেকেই এটা সমীচীন নয়। ইসলাম তালাককে অপছন্দনীয় বৈধ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছে, কিন্তু যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই সেখানে শেষ উপায় হিসেবে তালাকের ব্যবস্থা দিয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) মসজিদে এলে চারদিকে তাকাতেন। নামাযীদেরও দেখতেন, মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও নযর দিতেন। মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং লোকদের প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করতেন। একদিন মসজিদে এসে দেখলেন হাজ্জাজ ইবনে আইমান নামায আদায় করছে। নামায শেষ হলে হযরত ওমর (রা.) তাকে পুনরায় নামায আদায় করতে বলেছিলেন। দ্বিতীয়বার নামায আদায়ের পর হযরত ওমর (রা.) হাজ্জাজকে নামায আদায়ের পদ্ধতি শেখালেন। তিনি বোঝালেন যে, নামায হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। এই খুঁটি যদি ঠিক না থাকে তবে দ্বীনের ইমারত কিভাবে টিকে থাকবে?

জনসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত

সারাদিন কর্মব্যস্ততায় অতিবাহিত করার পর হযরত ওমর (রা.) রাতের প্রথমভাগে কিছু সময় বিশ্রাম করতেন। এরপর ঘুম থেকে উঠে মদীনার অলিতে গলিতে এবং মদীনার বাইরে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার খবর নিতেন। একবার ব্যবসায়ীদের একটি দল মসজিদে নববীর বাইরে এসে অবস্থান করছিলো। রাতে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আওফকে (রা.) বললেন, এসো আমরা দু'জন সারারাত এই ব্যবসায়ীদের মালামাল পাহারা দেই। দুই বিশিষ্ট সাহাবী সারারাত নফল নামায যেকের কোরআন তেলাওয়াতে কাটিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষেত্রে পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বরং দুনিয়ার শাসকদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ব্যবসায়ীরা জানতেও পারেনি স্বয়ং খলীফা ওমর (রা.) তাদের ব্যবসায়িক মালামাল পাহারা দিচ্ছেন।

আল্লাহ ও রসূল (স.)-এর আদেশের পাবন্দি

হযরত ওমর (রা.) মানুষের অধিকার এবং আরাম আয়েশের এতো বেশী ব্যবস্থা রাখতেন যে, ভাবলে বিবেক থমকে যায়। কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি ছিলেন কঠোর। একবার এক মহিলা আইয়ামে জাহেলিয়াতের রীতিতে বিলাপ করছিলো। হযরত ওমর (রা.) তাকে নিষেধ করলেন। মহিলা শুনলো না। হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে প্রহার করলেন। আবু বকর (রা.)-এর এক পুত্রের মৃত্যুতে আবু বকর (রা.)-এর এক কন্যা করুণ বিলাপ শুরু করলো। হযরত ওমর (রা.) আবু বকর (রা.)-এর পরিবারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোক্রমেই শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি দিতে তিনি রাযি ছিলেন না। হযরত ওমর (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কন্যাকে বললেন, ওকে বিলাপ বন্ধ করতে বলো, তা না হলে তাকে বাইরে বের করে দেয়া হবে।

কোরআনের হুকুম-আহকাম এবং রসুলের (স.) হাদীসের আদেশ-নিষেধকে হযরত ওমর (রা.) অগ্রাধিকার দিতেন। এতে কখনো তাঁর অলসতার পরিচয় পাওয়া যেতো না। গায়লান ইবনে আবু ছালাম নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীদের তালাক দিলেন এবং ধনসম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এ খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) গায়লানের কাছে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, আমার ধারণা, তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। আর তোমাকে শয়তান পুরোপুরি কবজা করে নিয়েছে। তুমি যা করেছো সেটা একান্তই শয়তানী কাজ। তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকে পরিবর্তন করতে হবে। স্ত্রীদের ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসলাম বিরোধী মনগড়া পদ্ধতিতে নিজের ধনসম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। যদি না করো তবে শরীয়ত অনুযায়ী আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তোমার সম্পদ বন্টন করা হবে। তোমার মৃত্যুর পর তোমার কবরে আবু রিগালের মতো পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করবো।

আবু রিগালকে বনু ছকিফ আবরাহা বাহিনীর মক্কা অভিযানের জন্যে রাস্তা তৈরি করতে মক্কায় পাঠিয়েছিলো। আরবের লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো। মুসলমান নামধারী কিছু লোক এমন রয়েছে যারা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ধনসম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে মনগড়া রীতি অনুসরণ করে। শরীয়তের বিধানকে মর্যাদা দেয় না। এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে তারা বহু

লোকের সাথে শক্রতা তৈরি করে। উত্তরাধিকারের বিধান ঘোষণার পর আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন 'যারা এই বিধান বাস্তবায়ন করবে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে, আর যারা এই বিধান লংঘন করবে তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এইসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা হচ্ছে মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ তায়ালা ও রসুলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (সূরা নেসা, আয়াত ১৩, ১৪)

কোনো মুসলমান আল্লাহর সীমা লংঘন করতে চাইলে হযরত ওমর (রা.) তাকে অনুমতি দিতেন না। আসমানী বিধানে পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই।

জামায়াতে তারাবীহ নামায আদায়ের ব্যবস্থা

হযরত ওমর (রা.) উম্মতের ঐক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। ইসলাম হচ্ছে মিল্লাতে মুসলিমের ঐক্যের ফসল। যে জাতি নিজেদের জাতিগত ঐক্য বজায় রাখতে পারে না তাদের অস্তি ত্ব টিকে থাকে না। নওফেল ইবনে আয়াস হাজলি বলেন, আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত কালে রাতে মসজিদে নববীতে একত্রিত হয়ে এবাদাত করতাম। কোরআন তেলাওয়াতে যে ক্বারীর কণ্ঠের লালিত্য মাধুর্য বেশী এবং তিনি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হতেন, তাকে ঘিরে থাকতো বহু লোকের ভিড়। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওরা কোরআনকেও সঙ্গীতের রাগরাগিনীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তিনদিন পর হযরত ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'বকে (রা.) আদেশ দিলেন তিনি যেন তারাবীহর নামাযে ইমামতি করেন। আদেশ বাস্তবায়িত হলো। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তারাবীহর নামায পড়াচ্ছিলেন। শেষের কাতারে হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়েছিলেন। চারদিকে যেন নূরের নদী প্রবাহিত হচ্ছিলো। আসমানী বরকত রহমত নাযিল হচ্ছিলো। সুমধুর কণ্ঠে তারতিল মতো কোরআন তেলাওয়াত চলছিলো। হযরত ওমর (রা.) মন্তব্য করলেন কাজটা নতুন বটে কিন্তু এই নতুন কাজ বেশ চমৎকার।

বিশিষ্ট সাহাবারা উম্মতে মোহাম্মদীর ঐক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো তারাও চাইতেন যে, উম্মতের মধ্যে বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি না হোক। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মিনায় নামাযে কসরের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মিনায় যোহরের নামায তিনিই চার রাকাত পড়ালেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, মতবিরোধ খুব খারাপ। হযরত ওসমান (রা.) মিনায় নামাযে কসর করতেন না এ কারণে আমি পুরো নামাযই আদায় করেছি। আমি মনে করি মিনায় নামাযে কসর করা উত্তম। কিন্তু উম্মতের ঐক্য এর চেয়ে বেশী জরুরী।

ত্বরিত পদক্ষেপ

হযরত ওমর (রা.) জনগণের সকল কাজে আগ্রহ দেখাতেন। তাদের কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকতেন। মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করা হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে ছিলো খলীফার প্রধান দায়িত্ব। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখলেই হযরত ওমর (রা.) তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার পরপরই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হলে ওরকম ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। রোগের প্রথমদিকে চিকিৎসা করা হলে রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে না।

একজন ক্রীতদাস কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলো। এতে একটি কুমারী কন্যার ওপর অপবাদের সম্ভাবনা বোঝা যাচ্ছিল। ঘটনা সত্য হলে অপবাদের জন্যে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি

যুবককে পেতে হবে। হযরত ওমর (রা.) ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণে তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। কমিটি কবিতা আবৃত্তির সময়ে উপস্থিত শ্রোতাদের বক্তব্য সংগ্রহ করলো। তদন্তে প্রমাণিত হলো যে, যুবক নির্দোষ। ফলে হযরত ওমর (রা.) যুবককে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন, তাকে কোনো সাজা দেয়া হলো না। তবে কবিতা আবৃত্তিতে সতর্ক হওয়ার জন্যে যুবককে বলে দেয়া হলো।

কাব্য চর্চার সীমারেখা

কবিতা ও কাব্যচর্চা শিল্প সাহিত্যের এক উন্নত মাধ্যম। হযরত ওমর (রা.) কাব্যচর্চা নিষিদ্ধ করেননি; কিন্তু কাব্যচর্চাকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন। মুক্তভাবে কাব্যচর্চার ঢালাও অনুমতি দেয়া হলে অশ্লীলতা, কদর্যতায় এই অংগন ভরে যাওয়ার আশংকা থাকে। ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টির কোনো সুযোগই থাকে না। একটি জাতির কাব্য সাহিত্য সেই জাতির চারিত্রিক অবস্থার দর্পণরূপে কাজ করে। দায়িত্বশীল শাসনকর্তারা কিছুতেই ঢালাও কাব্যচর্চার অনুমতি দিতে পারেন না।

বড়োই পরিতাপ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমানে আমাদের কবি সাহিত্যিকরা অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনাকেই তাদের সাহিত্য চর্চার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের মানসিকতার লোকদের হাতেই সংবাদপত্রসহ সকল প্রচারমাধ্যম রয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, থিয়েটার সব জায়গায় তাদের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ। সভ্যতার নামে অসভ্যতা, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি, চরিত্রের নামে চরিত্রহীনতা প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের শাসকবর্গের কি হয়েছে? চারদিকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা দেখেও তারা নীরব। পুণ্যের প্রবাহ যেখানে বইতে পারে, সেখানে বসেছে পাপের হাট। যারা তাকওয়ার কথা প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা পাপের পসরার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করছে।

জনসেবক হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) জনগণের সাথে এবং অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে কখনোই শাসকসুলভ ব্যবহার করতেন না। শারীরিকভাবেই তিনি শুধু জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন না বরং মানসিকভাবে সব সময় মানুষের চিন্তায় সেবায় লিপ্ত থাকতেন। জনগণের কল্যাণ এবং মঙ্গল চিন্তাই ছিলো তাঁর ব্রত। জনগণের সুখে-দুঃখে, বিপদে, আনন্দে, বেদনায়, তিনি তাদের সঙ্গী থাকতেন। জনগণের দুঃখে-কষ্টে তিনি তাদের সান্ত্বনা দিতেন। রোগাক্রান্ত লোকদের শুশ্রূষা করতেন। আর্থিক ও মানসিক সকল প্রকারে সাহায্য করতেন। কারো কোনো দুর্ঘটনার খবর পেলে সর্বাগ্রে হযরত ওমর (রা.) দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতেন। তাকে সমবেদনা জানাতেন।

সাঈদ ইবনে ইয়ারবুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সমবেদনা জানালেন। সমবেদনা জানানোর পর হযরত ওমর (রা.) ভালোবাসার সুরে বললেন, জুমার নামায, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে মসজিদে নববীতে আদায় করার চেষ্টা করবেন। ইয়ারবু বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমারও সেটাই ইচ্ছা। কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা-নেয়ার মতো কোনো লোক নেই। একথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) হযরত ইয়ারবুকে মসজিদে আনা-নেয়ার জন্যে একজন লোক ঠিক করে দিলেন।

পথে চলার সময়ে হযরত ইয়ারবু আশেপাশের সবদিকে নযর রাখতেন। কোথাও কোনো ঝগড়া-বিবাদ হতে দেখলে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে মীমাংসা করে দিতেন। তার আরাম বিশ্রামের সময় ছিলো খুবই কম। দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যয়িত হতো। বিনাকাজে চুপচাপ বসে থেকে তিনি কখনো সময় নষ্ট করতেন না। একবার এক পথ দিয়ে যাওয়ার

সময় কয়েকজন যুবককে তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ নিতে দেখলেন। এক যুবকের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় যুবক বললো, আসিউত। প্রকৃতপক্ষে সে বলতে চাচ্ছিল আসাত। হযরত ওমর (রা.) সাথে সাথে যুবককে বললেন, তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার চেয়ে মুখের কথার ভুল বেশী ক্ষতিকর। তারপর যুবকটিকে সঠিক উচ্চারণ শিখিয়ে দিলেন।

আরবী ভাষার গুরুত্ব

হযরত ওমর (রা.) অনুভব করেছিলেন যে, আরবী ভাষার দুর্বলতা নানা কারণে মারাত্মক হতে বাধ্য। হযরত ওমর (রা.) জানতেন আরবী ভাষার জীবন্তভাব মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের জন্যে অত্যাবশ্যক। এছাড়া এই ভাষা ইসলামী প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকায় উম্মতের জন্যে জরুরী। আরবী ভাষার হেফাযতের জন্যে হযরত ওমর (রা.) এই ভাষার বিশুদ্ধ চর্চার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। আরব দেশসমূহে বহু লোক এ ধরনের প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, আরবী ভাষার বিশুদ্ধ চর্চার চেয়ে এ ভাষার বৈচিত্রের জন্যে আঞ্চলিক শব্দচয়ন ও ব্যবহার অধিক জরুরী। এ ধরনের প্রচারণা অনেকের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ, আবার অনেকের সরলতার প্রমাণ। যারা সরলভাবে এ ধরনের প্রচারণায় অংশ নেয় তারা গভীরভাবে ভেবে দেখে না যে, ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের ওপর এর কি প্রভাব পড়বে। মুসলিম অমুসলিম, আরব অনারব, সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আরবী ভাষার বিশুদ্ধতার বিকৃতি এ ভাষার প্রাণপ্রবাহকে রুদ্ধ করে দেবে।

ইসলামের শত্রুর শেষ নেই। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দ্বীনের বিরুদ্ধে শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন উপায়ে মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে নিতে তৎপর। মুসলমানদের আরবী ভাষা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া তাদের প্রোপাগান্ডা এবং ষড়যন্ত্রেরই অংশ। তারা চায় মুসলমানরা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে পরিত্যাগ করুক। কথা বলায়, লেখায়, বিশুদ্ধ আরবী চর্চা থেকে মুসলমানরা দূরে সরে গেলে ইসলাম থেকেও তাদের দূরে সরানো সহজ হবে। কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান এবং তিনি দ্বীনের মোহাফেয। রসূল (স.) আরবীয় ছিলেন। কোরআনের ভাষা আরবী। জান্নাতের ভাষা হবে আরবী যারা আরবী ভাষাকে ঘৃণা করে তারা কিসের মুসলমান?

আমরা মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করি যে, সাহিত্যের ভাষা হিসেবেই আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নয় বরং এই ভাষায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শহরে মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) এ সব কিছুই জানতেন। এ কারণে তিনি দেশব্যাপী ফরমান জারি করেন যে, আরবী ভাষা শেখো, কারণ এই ভাষা তোমাদের দ্বীনের অংশ।

হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে আরবী ভাষার হেফাযত এবং দ্বীনের আকীদা বিশ্বাসের হেফাযত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তিনি আরবী ভাষাকে দ্বীনের বাহক হিসেবে এর গুরুত্ব নির্ণয় করেন। বর্তমানে নানা ধরনের লোক নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে আধুনিক প্রগতিশীলদের মতামত গ্রহণ করতে রাযি নই।

রসূল (স.) বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন এবং এজন্যে গৌরববোধ করতেন। তিনি আঞ্চলিক আরবী ভাষার কোনো শব্দ কখনো ব্যবহার করেননি। রসূল (স.)-এর জীবনী সব ক্ষেত্রেই আমাদের জন্যে আদর্শ এবং উসওয়ায়ে হাসানা। রসূল (স.)-এর আদর্শ উপেক্ষা করে কিভাবে আমরা আঞ্চলিক ভাষার ক্রীড়নক হয়ে দ্বীন ও ঈমানকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারি?

সংস্কারবাদীরা দাবী করে যে, আরবী ভাষায় তাদের ব্যুৎপত্তি প্রবল। তারা নিজেদেরকে আরবী ভাষার কল্যাণকামী বলেও দাবী করে। কিন্তু এসব দাবীর সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে না। তাই তাদের উদ্দেশ্যে শায়খুল ইসলাম ইমাম আহম্মদ ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আল্লাহর কেতাব

এবং রসূল (স.)-এর সুন্নাহ জানা ও বোঝা ফরয। আরবী ভাষা না জেনে কোনো মুসলমানের পক্ষে কোরআন সুন্নাহ জানা এবং বোঝা কি সম্ভব? এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় আরবী ভাষা শেখা কতো জরুরী। ওয়াযিব আদায়ের জন্যে যে জিনিস প্রয়োজন সেই জিনিস অর্জনও কি ওয়াযিবের অন্তর্ভুক্ত নয়?

ইমাম আবু জাফর তিবরি বলেন, ইমাম জারমির কাছে আমি শুনেছি তিনি বলেছেন, তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ আল্লামা সিরোয়াইহ-এর কেতাব থেকে লোকদেরকে ফেকাহ বিষয়ক ফতোয়া দিচ্ছেন। মোহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ এই কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, জারমি হাদীস বিশারদ ছিলেন কিন্তু তিনি যখন আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ পাঠ করতে গিয়ে সিরোয়াইহর কেতাব পড়েছেন তখন হাদীস ও ফেকাহর সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছেন।

আরবী ভাষা, আরবী বর্ণমালা ও ইসলাম

আরবী ভাষার উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ভাব, ছন্দ, ব্যাকরণ কেউ যদি বুঝতে পারে তবে তিনি উচ্চমানের ভাষাবিদ এবং আলেম হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হন। আরবী ভাষার মূল স্রোত থেকে আলাদা হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় সবাই যদি পারদর্শী হয়ে ওঠে তবে তারা একে অন্যের কাছে কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করবে? কোরআন সুন্নাহর ভাষা এক হওয়ার কারণে এবং আরবী বর্ণমালায় গ্রন্থাবলী, সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রকাশনার কারণে আরব অনারব সবাই সবকিছু বুঝতে পারে, কিন্তু আঞ্চলিক আরবীর চর্চার মাধ্যমে এই বোধগম্যতা কিভাবে সম্ভব হবে? এক এলাকার মানুষই তো অন্য এলাকার মানুষের মুখের ভাষা বুঝতে হিমশিম খাবে। সেরূপ অবস্থায় কোরআন হাদীসের ভাষা কি তাদের কাছে অপরিচিত মনে হবে না?

আরবী ভাষার গুরুত্ব জানতেন বলেই আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এ ভাষার হেফাযত করেছেন। এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তার শাসনামলে আইন করেছিলেন যে, সব লেখা আরবী ভাষায় লিখতে হবে। যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি এবং নতুন বর্ণমালার আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। ইসলামী শরীয়ত আমাদের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। এই শরীয়ত আরবী ভাষায় বিদ্যমান। বিশুদ্ধ আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

হযরত ওমর (রা.) এবং যুদ্ধবিদ্যা

হযরত ওমর (রা.) শরীর চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে যুবকদের শরীর চর্চা এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো। তিনি নিজে ছিলেন একজন ভালো যোদ্ধা। তলোয়ার চালনা, তীর চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড় সওয়ারীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। এসব বিষয়ে নিজের মেধাকে বিকশিত তো তিনি আগেই করেছিলেন কিন্তু চর্চার মাধ্যমে সব সময় নিজেকে চাঙ্গাও রাখতেন। ঘোড়ায় আরোহণের তিনি একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ঘোড়ায় আরোহণের জন্যে ঘোড়ার একটি কান নিজের হাতে ধরে অন্য হাতে নিজের কান ধরতেন তারপর লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার পিঠে বসতেন।

হযরত ওমর (রা.) নিজের বহুমুখী ব্যস্ততা সত্ত্বেও কিছু সময় বের করে যুব সমস্যা, শরীর চর্চা, অনুশীলন মাঝে মধ্যে পরিদর্শন করতেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ খাত্তাব বলেন, একবার আমি এবং আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব সমুদ্রে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম। আমরা তখন একজন অন্যজনকে পানিতে ডুবাতে চেষ্টা করছিলাম। হযরত ওমর (রা.) তীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধচোখে আমাদের কসরত প্রত্যক্ষ করছিলেন। সে সময় আমরা এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম।

হযরত ওমর (রা.) নিজেও কয়েকবার অন্য সাহাবাদের সাথে শরীর চর্চার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। একবার এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় মদীনা থেকে মক্কায় যাচ্ছিলেন। সমুদ্রের কাছে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা.) বললেন, এসো আবদুল্লাহ আমরা সমুদ্রে ডুব দেই। দেখি কে বেশীক্ষণ ডুব দিয়ে পানির নীচে থাকতে পারে। এটা কোনো অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো না। রসূল (স.) একবার আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় তারা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। কোরায়শ বংশের বিখ্যাত পাহলোয়ান রোকানার সাথে রসূল (স.) মল্লযুদ্ধে অংশ নেন এবং রোকানাকে তিনবার মাটিতে আছড়িয়ে ফেলেন। এটা তো বিখ্যাত ঘটনা।

সাইয়েদেনা আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) ছিলেন ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি। তিনি একদিন তার অধীনস্থ সৈন্যদের বললেন, কেউ কি আমার সাথে ঘোড় সওয়ারীর প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাযি আছো? এক যুবক এগিয়ে এসে বললো, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি রাযি আছি। আবু ওবায়দা বললেন, ঠিক আছে, এসো। প্রতিযোগতা শুরু হলে আবু ওবায়দার ঘোড়া অনেক আগে চলে গেলো কিন্তু যুবকের ঘোড়া পেছনে পড়ে রইলো। যুবকের বেনী করা চুল দুই কানের পাশে ভেড়ার শিং এর মতো দোল খাচ্ছিল। যুবকটি ঘোড়ার নগ্ন পিঠে আরোহণ করেছিলো।

সাহাবারা যুদ্ধের ময়দানেও শরীর চর্চা অব্যাহত রাখতেন। রসূল (স.) মুসলমানদের বিশেষভাবে তাকিদ দিয়ে বলেছিলেন, শত্রুর মোকাবেলায় নিজেদেরকে সব সময় প্রস্তুত রাখবে। তিনি বলেন, তোমরা শিশুদের সাঁতার এবং তীর চালনা শিক্ষা দাও। অন্য এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা বহু দেশ তোমাদের শাসনাধীনে দেবেন। শত্রুদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তবু তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নিজ নিজ তীর এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপারে অমনোযোগী না থাকে।

মোমেন যখন শরীর চর্চার সাধনা করে এর বিনিময়ে সে সওয়াব পায়। রসূল (স.) যে কাজেরই আদেশ দিয়েছেন এতে মোমেন বান্দাদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। দ্বীনী কল্যাণ এবং দুনিয়ার কল্যাণ। তিনি বলেন, শক্তিশালী মোমেন দুর্বল মোমেনের চেয়ে উত্তম। তবে শক্তিশালী মোমেন এবং দুর্বল মোমেন উভয়ের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে।

ইমাম হাসান হোসেন (রা.)-এর শরীর চর্চা

রসূল (স.) তাঁর নাতি হযরত হাসান (রা.) এবং হোসেনকে (রা.) শরীর চর্চার তাকিদ দিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) হাসান হোসেনকে পরস্পর কুস্তি লড়াতেন। একবার তার সামনে দু'ভাই কুস্তি করছিলো। রসূল (স.) সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলছিলেন, বাহ হাসান, বাহ! হযরত ফাতেমা (রা.) পাশে ছিলেন। তিনি বলেন আব্বাজান আপনি কেন বাহ্ হাসান বাহ্ বলছেন? রসূল (স.) বলেন আমি এ কারণেই বলছি কারণ জিবরাইল বলছে বাহ্ হাসান বাহ্। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং কাছির ইবনে আব্বাসকে (রা.) পাশাপাশি দাঁড় করাতেন। তারপর একটা নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, ওই জায়গা পর্যন্ত দৌড়ে যাবে তারপর আমার কাছে ফিরে আসবে। দেখি কে জিততে পারে। যে বিজয়ী হবে তাকে এটা এবং এটা পুরস্কার দোবো। উভয় বালক দৌড়ে এসে একজন তাঁর বুকে, একজন পিঠের সাথে লেগে যেতো। রসূল (স.) তাদের চুম্বন করতেন এবং নিজের গায়ের সাথে চেপে ধরতেন। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো দৌড়বিদ ছিলেন। বিখ্যাত কবি হারাশ হাজলি খুব জোরে দৌড়াতে পারতেন। অনেক সময় দৌড়ে তিনি ছুটন্ত ঘোড়ার আগে চলে যেতেন।

হযরত ওমর (রা.) তার প্রজাদের মূল্য ও মর্যাদা খুব ভালোভাবে জানতেন। দ্বীনের কাছাকাছি ব্যক্তির মর্যাদা ছিলো বেশী। স্বাধীন ব্যক্তি এবং ক্রীতদাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের মাপকাঠি ছিলো দ্বীনদারী। হযরত হোযায়ফার (রা.) ক্রীতদাস সালেমকে (রা.) হযরত ওমর (রা.) বড় স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। মৃত্যুর আগে খলীফা মনোনয়নের প্রসঙ্গ এলে বললেন, সারেম যদি আজ বেঁচে থাকতো তবে আমি তাকেই খলীফা মনোনীত করতাম। একইভাবে আবু ওবায়দা (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, আজ যদি আবু ওবায়দা বেঁচে থাকতেন তবে আমি পরবর্তী খলীফা হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করে যেতাম।

নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া

একবার মদীনার বেশকিছু গনিমতের মাল এলো। ওর মধ্যে বেশ কয়েকখানি দামী চাদরও ছিলো। বিতরণের পর একটি চাদর অবশিষ্ট থাকলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এমন একজন যুবকের নাম তোমরা বলো যার পিতা হিজরত করেছে এবং যে নিজে হিজরত করছে। এই চাদর আমি তাকেই দেব। সবাই একবাক্যে বললো, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কিন্তু হযরত ওমর (রা.) খুশী হলেন না। তিনি বললেন, আবদুল্লাহতো কিছুতেই এ চাদর পেতে পারে না। এরপর খলীফা ওমর (রা.) সালিত ইবনে সীতকে চাদরখানি দান করেন। সাহাবারা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নাম যুক্তিযুক্তভাবেই দিয়েছিলেন। কেননা হযরত ওমর (রা.) নিজে হিজরত করেছিলেন, আব্দুল্লাহও হিজরত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইতিহাসে অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি চৌদ্দবছর বয়সে ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। হযরত ওমর (রা.) যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ সেই মাপকাঠিতে ছিলেন পুরোপুরি উত্তীর্ণ। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, ন্যায়পরায়ণ। মুসলমানদেরকে তিনি নিজের চেয়ে এবং নিজের পরিবার পরিজনের চেয়ে বেশী গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতেন। এ ধরনের মানুষ কি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যাবে?

ইসলামের প্রসারিত দৃষ্টি

দ্বীন ইসলাম একটি সহজ স্বাভাবিক ধর্ম। সংকীর্ণতা, কঠোরতা থেকে এই ধর্ম মুক্ত। একবার হযরত ওমর (রা.) ওযু করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিল না । এক ঈসায়ী মহিলার কাছে পানি ছিলো। হযরত ওমর (রা.) তার কাছ থেকে পানি চেয়ে নিয়ে ওযু করলেন। মহিলা ভীষণ প্রভাবিত হলো। সে ভাবলো, আমীরুল মোমেনীন আমাকে ঘৃণা করেননি, অবজ্ঞা করেননি, আমাকে অপবিত্র মনে করেননি। মুসলমান অফিসারদের পাশাপাশি হযরত ওমর (রা.) বহু ক্ষেত্রে খৃষ্টান ও ইহুদী অফিসারও নিয়োগ করেন। বিশেষত দক্ষ মুসলমান পাওয়া না গেলে অন্য ধর্মের দক্ষ লোকদের নিয়োগ দেয়া হতো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণত অমুসলিমদের নিয়োগ দেয়া হতো। যেমন হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার প্রভৃতি। প্রশাসনিক অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানরাই নিযুক্ত হতেন। সহীহ মুসলিমে সংকলিত একটি হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের অনুসারীদের দিয়ে সরকারী দায়িত্ব পালন করানো যায়। হযরত ওমর (রা.) আবু ইয়াযিদ তাঈ নামের একজন খৃষ্টানকে সদকা যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

জিযিয়ার আসল উদ্দেশ্য

জিযিয়া সম্পর্কে বহু উদ্দেশ্যমূলক প্রচার প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। জিযিয়া হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর আরোপিত একটি ট্যাক্স বা কর। এই কর নরম ব্যবহারের মাধ্যমে আদায়ের নির্দেশ রয়েছে এবং এই কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নানা যৌক্তিকতা বিবেচনায় রাখা হয়। অমুসলিম জিম্মিদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র পালন করে। জিম্মিরা

দুঃস্থ, মেসকিন, নিঃস্ব হলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের প্রতিপালন করে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হয়। জিম্মিদেরকে নানারকম সুবিধা দেয়া হয়। যেমন তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয় না। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যদি তারা কোনো সরকারী কাজে নিয়োজিত হয় তবে জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হয়। তাদের জীবন, অর্থসম্পদ, ইযযত আব্রু, সম্পত্তি, ধর্মীয় উপাসনালয় হেফাযত করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র পালন করে। হযরত ওমর (রা.) মুসলমানদের অধিকার দানের নিশ্চয়তার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার প্রদানেও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি জিম্মিদের মৌলিক মানবিক অধিকার দানে কোনো অবহেলা বা অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেননি। দুঃস্থদের জিযিয়া মওকুফই করা হতো না, বরং বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে ভাতা দেয়া হতো। ইতিহাসে এই ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে জিম্মিদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর রাষ্ট্র নীতি পুরো অনুসরণ করেন। আবদুল মালেক ইবনে ওমর বলেন, বনু ছাকিফ গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন যে, সেই ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে একটি এলাকায় পাঠানো হয়। জিযিয়া কর আদায়ের জন্যে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিলো। যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা.) সেই কর্মচারীকে বলে দিলেন, কোনো জিম্মিকে এক দেরহাম আদায়ের জন্যে চাবুক মারবে না। তাদের খাদ্যশস্য বা ফসল বিক্রি করবে না। তাদের শীত গ্রীষ্মের পোশাক নিলামে বিক্রি করবে না। তাদের কোনো পশু ক্রোক করবে না। এমনকি জিযিয়া হিসেবে পাওনা দেরহাম আদায় করার জন্যে শাস্তি স্বরূপ কাউকে খাড়া করে রাখবে না। জিযিয়া আদায়ের জন্যে নিযুক্ত কর্মচারী বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন তাহলে তো আপনার কাছ থেকে যেভাবে খালি হাতে যাচ্ছি এভাবে খালি হাতেই আমাকে মদীনায় ফিরে আসতে হবে। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার মঙ্গল করুন। সংখ্যালঘুদের ওপর আমরা কোনো অত্যাচার করতে পারি না। জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না করে আমরা ওদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতে পারি না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ যদি তাদের কাছে থাকে তবেই আমরা জিযিয়া আদায় করতে পারি। তুমি খালি হাতে ফিরে আসো অসুবিধা নেই, কিন্তু যুলুম-অত্যাচার করে জিযিয়া কর আদায়ের জন্যে কিছুতেই তোমাকে অনুমতি দেয়া যাবে না। বর্তমানে বহুদেশে মুসলমানরা বিধর্মী শাসকদের কাছ থেকে কি পাচ্ছে? বরং দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের ওপর অহেতুক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কথায় কথায় মুসলামনদের হত্যা করা হচ্ছে। তাদের অভিযোগ শোনার পরিবর্তে তাদেরকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো হচ্ছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে মনে মনে শুধু আশা করলেই হবে না বরং মুসলমানদের শক্তি অর্জন করতে হবে। এ বিশ্ব শক্তিকে সম্মান করে। বিশ্বের কোনো এলাকার অমুসলিমরা যদি সমস্যায় পড়ে, তাদের ওপর কোনো বিপদ যদি নেমে আসে তবে উন্নত বিশ্বের অমুসলিমরা তার প্রতিকারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু নির্যাতিত বিপদগ্রস্ত মানুষেরা যদি মুসলমান হয় তবে ওসব উদারনৈতিক ক্ষমতাসীনদের মুখে কথা থাকে না, মুসলমানরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মারা গেলেও ওরা এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না। এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি। ছুটির দিনে পেট্রোলের অভাব দেখা দিলে পাশ্চাত্যের সংবাদপত্র দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু করে অথচ মুসলমানরা নির্যাতনে নিষ্পেষণে ধুঁকে ধুঁকে মরতে থাকলেও সেদিকে নযর দেয় না। বড়জোর সংবাদ পত্রের ভেতরের পাতায় সিঙ্গেল কলামে একটুখানি খবর ছেপে দেয়।

শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) শরীয়ত নির্ধারিত সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শিথিল মনোভাবের পরিচয় দিতেন না। কিন্তু শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়বিচার

এবং নমনীয়তার পরিচয় দিতেন। বিভিন্ন লোকের মন-মেযাজ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কেউ নরম মনের অধিকারী, আবার কেউ কঠোর মনের অধিকারী। শাস্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন তারা যেন বাড়াবাড়ি না করে। তিনি ওদের বোঝাতেন, শরীয়তের অনুমোদিত শাস্তি হচ্ছে রহমত কিন্তু প্রায়োগিক কারণে যেন এই রহমত আযাবে পরিণত না হয় এবং পরকালে আযাবের কারণ না হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন শোনেন ও তিনি কেয়ামতের কঠিন দিনে সবকিছু চুলচেরা হিসাব নেবেন। আওফ ইবনে কাবের ইয়াজদি বলেন, আমরা মসজিদে বসেছিলাম। হযরত ওমর (রা.) এলেন এবং এক ভাষণে বললেন, শরীয়তের সাজা বাস্তবায়নকারী এমনভাবে চাবুকের আঘাত করবে যাতে তার বগল দেখা না যায়।

কঠোরতা এবং যুলুম-অত্যাচারের মূলোৎপাটন দ্বীনের প্রথম উদ্দেশ্য। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নম্রতা এবং নমনীয়তা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। দাসীকে হযরত সাফিয়া (রা.) শুধু ক্ষমাই করেননি বরং তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার যে নির্দেশ দিয়েছে সেটা মুসলমান আত্মীয় স্বজনই নয় বরং অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অমুসলিমদের রীতি হচ্ছে তাদের সমাজের কেউ যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা সেই নওমুসলিমকে সর্বাত্মকভাবে বয়কট করে এবং তার জানের দুশমন হয়ে যায়। কিন্তু জবাবে ইসলাম গ্রহণকারী তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। হযরত সাফিয়াও তার অমুসলিম আত্মীয়স্বজনের সাথে শরীয়ত অনুমোদিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন।

শিশু শিক্ষা ঃ একটি নাযুক দায়িত্ব

আমরা চাই যে, আমাদের কালের মুসলিম শাসকরা জীবনের এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। শিশুর শিক্ষা মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্নেহের পরশ দিয়ে শিশুদেরকে কাছে আনতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে যে, বয়স্কদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে। এতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা আমাদের সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে। শিশুদের সাথে কথা বলা রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের জন্যে অবমাননাকর মনে করেন। তারা বুঝতে চান না যে, তাদের এই ধারণা ঠিক নয়।

শিশুরা পথে-ঘাটে অলিগলিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এবং সব রকমের খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। খেলাধূলা শিশুদের জন্যে জরুরী, কিন্তু এর জায়গা পথঘাট বা অলিগলি নয়। শিশুরা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তারা সব সময়েই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে। তাদের রূহ তাদের চেয়ে অনেক বড়ো এবং শক্তিশালী। এই রূহ তাদের দেহে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটোছুটি করে। তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলে তারা হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণহীন। সীমার মধ্যে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তাদের রাখা আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণ কঠোর শাসন, হৃদয়হীন আচরণের দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্যে শিশুদের কাছে তাদের বন্ধুর মতো নিজেকে গ্রহণযোগ্য করা আবশ্যক। স্নেহপূর্ণ নরম ব্যবহারের পাশাপাশি মাঝে মাঝে কঠোর ব্যবহার করা হলেও শিশুরা সেটা মেনে নেয়। হযরত ওমর (রা.) তার উচ্চ মর্যাদা এবং ক্ষুরধার ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও শিশুদের সাথে মাঝে মধ্যে হাসি তামাশা, ঠাট্টা মশকরা, রসিকতা করতেন। তাদের খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ দেখাতেন।

শিশুদের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার

সেনান ইবনে মোসলেম আর হক হাজলি ছিলেন একজন তাবেয়ী। তিনি বলেন, আমি মদীনার বাগানে মদীনার বালকদের সাথে খেজুর কুড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, হযরত ওমর (রা.) আমাদের মাঝে এসে হাযির। তাকে দেখে শিশুরা এদিক ওদিক ছুটে পালালো। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার জামার আঁচলে ছিলো খেজুর। ভালোভাবে পাকার আগে কোনো কারণে নীচে ঝরে পড়া এসব খেজুরকে বলা হয় খিলাল। হযরত ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি খেজুর চুরি করেছিলে? আমি বললাম জ্বী না। হে আমীরুল মোমেনীন! দমকা হওয়ায় নিচে ঝরে পড়া এসব খেজুর আমরা কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা আমাকে দেখাও। আমি খেজুর দেখালাম। তিনি দেখে বললেন, তুমি সত্য কথা বলেছো। অন্য বালকেরা তাদের কুড়ানো খেজুর এদিক সেদিক ফেলে ছুটে পালিয়েছিলো। আমি বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি যদি এখন এখান থেকে বের হই তাহলে বাইরে অপেক্ষমান বালকেরা আমার সাথে ঝাপটাঝাপটি করে আমার খেজুর ছিনিয়ে নেবে। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আমার সাথে আমার বাড়ীতে গেলেন এবং আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

ঈমান উজ্জীবনকারী এই ঘটনা শুনে আমরা ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে, হযরত ওমর (রা.)-এর সীরাত কতো উন্নত শিক্ষার আধার ছিলো। পালিয়ে যাওয়া বালকরা তাদের সাথীর কাছে হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যবহারের কথা অবশ্যই শুনেছিলো। তারা তখন বুঝতে পেরেছিলো যে, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) কতো মধুর ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের এ ধরনের ঘটনা সর্বজনবিদিত। বর্তমানকালের শাসকদের কাছে এসব ঘটনার বিবরণ দেয়া হলে তারা খোঁড়া যুক্তি দেখাবেন যে, হযরত ওমর (রা.) একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে বসবাস করতেন। বর্তমান কালে তার সুযোগ কোথায়? কিন্তু তারা এটা ভুলে যান যে, বর্তমান কালের শাসকরা যতোরকম উপায় উপকরণ এবং সুযোগ সুবিধার মধ্যে জীবন যাপন করছেন এবং সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালনা করছেন হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে তার কিছুই কি বিদ্যমান ছিলো?

হযরত ওমর (রা.) এবং বৃদ্ধ পাদ্রী

হযরত ওমর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে আমি সালাম জানাই। দয়ামায়া, স্নেহ ভালোবাসা ছিলো তার স্বভাবজাত ব্যাপার। এসব ছিলো তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি মুসলমান জনগণের কল্যাণই সব সময় চিন্তা করতেন না বরং অমুসলিম জনগণের জন্যেও তার মন ছটফট করতো। হযরত ওমর (রা.) অমুসলিমদের পার্থিব জগতের কল্যাণের পাশাপাশি তাদের পারলৌকিক মুক্তি এবং কল্যাণের কথাও চিন্তা করতেন।

হযরত ওমর (রা.) একবার সিরিয়া সফরে গেলেন। এক বৃদ্ধ পাদ্রী তার সাথে দেখা করতে এলেন। জীবনের পুরো সময়ই তিনি গীর্জার ভেতর কাটিয়েছেন। বার্ধক্যের ভারে তিনি ছিলেন ন্যুব্জ। তার অবস্থা ছিলো করুণ। পৌঢ় পাদ্রীকে দেখে হযরত ওমর (রা.)-এর চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। একজন সাথী কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলো, হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই মেসকিন লোকটি জীবনভর নাজাতের আশায় ছটফট করছে। কিন্তু হেদায়াত না পাওয়ার কারণে তার জীবনতো নাজাত থেকে বঞ্চিত। কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে হাযির হওয়ার পর সেখানে তার জন্যে অনুশোচনা এবং হতাশা ছাড়া কিছুই থাকবে না। এটা কতো যে আফসোস এবং অনুশোচনার কথা।

হযরত ওমর (রা.) এরপর সূরা গাশিয়ার দ্বিতীয় আয়াত থেকে চতুর্থ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেদিন অনেক মুখমন্ডল ক্লিষ্ট ক্লান্ত হবে, ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।' (সূরা গাশিয়া, আয়াত ২-৪)

দয়াশীলতা এক বড় নেয়ামত

দয়ালু মনমানসিকতা এক বড় নেয়ামত। সেই অন্তর ভাগ্যবান যে অন্তরে দয়া ও করুণা বিদ্যমান। শাসকবর্গ এবং জনগণের মনে যদি সেই করুণার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় তবে আমাদের

জীবনধারায় বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হবে এবং মুসলিম বিশ্বের সৌভাগ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। যারা রহম করে, দয়া করে, আসমানে অবস্থানকারী আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দয়া করেন। যে মনে দয়া মায়া নেই সেই মন কদর্য এবং পাপাচারপূর্ণ। মন যদি পাথরের মতো শক্ত হয় তখন চোখে পানি থাকে না, চোখ শুকিয়ে যায়। অনুভূতির মৃত্যু ঘটে।

রসূল (স.) বলেছেন, দুর্ভাগ্যের চারটি চিহ্ন বিদ্যমান। চোখ অশ্রু থেকে বঞ্চিত হওয়া, মন পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকা, দুনিয়ার লোভ লালসায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া।

দুরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দুরদৃষ্টিসম্পন্ন, মেধাবী শাসক। তিনি শুধু নিজের সময়কালের জন্যেই চিন্তা করতেন না বরং ভবিষ্যতের জন্যেও সর্বদা চিন্তা করতেন। তিনি তার শাসনামলে লক্ষ্য করেছেন যে, আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সমগ্র এলাকা শুষ্ক এবং অনুর্বর। ফসল উৎপাদন খুব কম। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্যে অন্য এলাকা থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। নানা প্রতিকূলতার কারণে সময়মতো খাদ্যশস্য মক্কায় পৌঁছুতে পারে না। মৌসুমী অবস্থার কারণে কৃষি উৎপাদনের চেষ্টা লাভজনক হয় না। একবার তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি ছাড়া অন্য বিদ্যা লোকদের আয়ত্ত করা আবশ্যক।

হযরত ওমর (রা.) বহু শত বছর আগে মুসলিম মিল্লাতকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা যেন হাত এবং মেধা কাজে লাগায়। যেন তারা শিল্পোৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়। শিল্প এবং বাণিজ্যের মাধ্যমেই মানুষের উন্নতি হতে পারে। অল্পকথায় হযরত ওমর (রা.) সেই কথাই বলে দিয়েছিলেন। আমাদের পুণ্যবান পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে যে পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন আমরা যদি তার প্রতি গুরুত্ব দিতে পারি তবে আমাদের ভাগ্য বদলে যাবে। অথচ আমাদের শত্রুরা সেসব আদর্শ গ্রহণ করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষা এবং চিন্তাধারা নিজেদের উদ্ভাবন বলে চালিয়ে দিয়েছে। আমরা শুনতে পাই মুসলমান যুবকরাই গর্বিত কণ্ঠে বলছে 'এটা মিস্টার অমুকের আবিষ্কার। অমুক ফর্মুলা অমুকের উদ্ভাবন'। আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভুলে গেছি এ কারণে সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। অথচ আমাদের নির্ভর করা উচিত ছিলো তাঁর ওপর যিনি আমাদের প্রতিপালক এবং যিনি সর্বশক্তিমান।

হযরত ওমর (রা.) এবং ইমারত নির্মাণ শিল্প

ইমারত বা অট্টালিকা নির্মাণ বর্তমানকালের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। হযরত ওমর (রা.) এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেন। শহর বা নগর পরিকল্পনার যে ধারণা হযরত ওমর (রা.) দিয়েছিলেন এখনো তা তুলনাহীন। নগর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নগরবাসীদের নাগরিক সুবিধা প্রদান করা। স্বাস্থ্য রক্ষা, হাওয়া বাতাস, রোদ সকল জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা নগর পরিকল্পনাকারীর দায়িত্ব। হযরত ওমর (রা.) সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে তার সকল গবর্নরকে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমাদের শাসনাধীন এলাকার অট্টালিকাসমূহ একতলার ওপর আরো তলা বাড়িওনা। উঁচু অট্টালিকা যখন তোমরা তৈরি করবে সেটাই হবে তোমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যের দিন। ওসব উঁচু উঁচু অট্টালিকার কারণে মানুষ আলো বাতাস এবং রোদ থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত ওমর (রা.) কোনো মেডিকেল কলেজে পড়েননি। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা তার ছিলো না। তিনি তার আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং ঈমানের নূর দ্বারা দেখেছিলেন যে, আকাশচুম্বী অট্টালিকা এবং ঘিঞ্জি জনবসতির কারণে মানুষ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হবে। আজকের

দিনের অবস্থা দেখুন। একদিকে আকাশচুম্বী অট্টালিকা অন্যদিকে কারখানার ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির কারণে পরিবেশ দূষিত। এসব কিছুই মানব স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিস্বরূপ। ছোট ছোট শহর এবং অনুচ্চ অট্টালিকা, ঘরবাড়ী, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত।

অর্থহীন কথা ও কাজ পরিহার

হযরত ওমর (রা.) নিরর্থক কথা ও কাজ মোটেই পছন্দ করতেন না। কল্যাণকর এবং পরিণামে সুফলদায়ক কাজে তিনি উৎসাহ দিতেন, কিন্তু নিরর্থক কাজের সমালোচনা করতেন। একজন মুসলমানের জীবন উদ্দেশ্যমূলক। সেই জীবন অর্থহীন বা তাৎপর্যহীন নয়। কাজেই জীবনের সামান্য সময়ও বিনা কাজে ব্যয় করা উচিত নয়।

একবার হযরত ওমর (রা.) খবর পেলেন যে, ইরাক থেকে একজন লোক এসে বিভিন্নস্থানে কোরআনের মোতাশাবেহাত অর্থাৎ প্রতীকী আয়াতসমূহের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এ সম্পর্কিত বিতর্ক মানুষের মন বিক্ষিপ্ত এবং সন্দেহপরায়ণ করে দিচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে প্রতিনিধি মারফত এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সে নির্দেশ মানলো না বরং নিজের অর্থহীন কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। হযরত ওমর (রা.) তাকে নিজ দরবারে ডেকে আনলেন। খেজুর গাছের দুটি কাঁচা শাখা আগেই সামনে তৈরি করে রাখলেন। লোকটিকে হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? এ কথা বলেই তিনি খেজুর গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে তাকে পিটাতে লাগলেন। মার খেতে খেতে একপর্যায়ে লোকটি বললো হে আমীরুল মোমেনীন, এবার দয়া করে থামুন। আমার মাথায় যে খান্নাস ঢুকেছিলো সেটা বেরিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কোরআনের মোতাশাবেহাত আয়াত নিয়ে ওরকম বিতর্ক অনুষ্ঠান আর করবো না। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে মদীনা থেকে বের করে বসরায় পঠিয়ে দিলেন।

প্রগতিশীল নাকি ঈমানের ডাকাত

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখুন। চিন্তার স্বাধীনতার নামে কিছুসংখ্যক তথাকথিত নাস্তি কেরা মানুষের ঈমান আকীদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা এসব দার্শনিক এবং সাহিত্যিক আমাদের ঈমানের ভিত্তিও নড়বড়ে করে দিচ্ছে। তারা এমন সব বিষয়ে যুব সমাজকে ফুসলাচ্ছে যাতে তাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি তো আল্লাহর আযাবকে আহ্বান করার শামিল।

কিছুসংখ্যক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিবাদী ব্যক্তি সাহাবাদের নামে অপবাদ দিচ্ছে। তারা বলছে, অমুক সাহাবা ছিলেন মৃগী রোগী। অমুক সাহাবা ছিলেন বুদ্ধিভ্রষ্ট। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং বস্তুবাদের এসব ক্রীতদাসের স্পর্ধা এতো বেড়েছে যে, তারা সাহাবাদের নামে পর্যন্ত অপবাদ দিতে দুঃসাহস করছে। প্রকৃতপক্ষে ওরা নিজেরাই নির্বোধ এবং বেকুফ। ওদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নেই। মুসলিম শাসকরা আজ অনুভূতিহীন। রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী নির্বোধ বেকুফদের তোমরা খোলামেলা ছেড়ে দিয়ো না, ওদেরকে হাত ধরে পাকড়াও। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকরা রসূল (স.)-এর এ হাদীসের প্রতি কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না? ভাবতে অবাক লাগে, ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের নামে অপবাদ ওরা দেয় কি করে? ওসব পন্ডিতরূপী মূর্খের চেয়ে বড় নির্বোধ আর কে হতে পারে? ইসলাম চায় তার অনুসারীদের সকলের কাজ হোক প্রশংসনীয়। মন্দ থেকে নিজের দূরে থাকাই যথেষ্ট নয় বরং মন্দকে প্রতিরোধ করা এবং ভালোকে প্রসারিত করাই হচ্ছে মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। সমাজের অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচারের ব্যাপারে চিন্তা না করে যে ব্যক্তি শুধু নিজে পূণ্য অর্জনে মনোযোগী থাকে, অত্যাচারীদের অনিবার্য পরিণতি থেকে সেও রক্ষা পাবে না। বরং অত্যাচারীদের সাথে সাথে

সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। রসূল (স.) একবার একজন আনসার মহিলা সাহাবীকে বলেছিলেন, আল্লাহর যমীনে যখন অন্যায় অত্যাচার বেড়ে যায় এবং সেসব প্রতিরোধ করার কেউ থাকে না, আল্লাহ্ তায়ালা তখন যমীনে আযাব নাযিল করেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, সেই সমাজে যদি নেককার লোক থাকে তাহলে? রসূল (স.) বললেন, নেককার লোক যদি বিদ্যমান থাকে তবুও। অন্যান্য পাপাচারী লোকদের সাথে সেই নেককার লোকও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা নেককারদের ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু দুনিয়ায় তাদের পরিণাম পাপীদের পরিণামের মতোই হবে।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

আরবের লোকেরা স্বভাবতই উদ্ধত স্বভাবের এবং বেপরোয়া। এর প্রতিকার সহজসাধ্য নয়। হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে পরম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সাথে রুক্ষ, উদ্ধত স্বভাবের লোকদের চিকিৎসা করেন। তিনি মন্দের জবাব ভালো দ্বারা দিতেন এবং কঠোরতার মোকাবেলায় নম্রতার পরিচয় দিতেন। হারেস ইবনে অজরাহ উমুবী নামের লম্বা টিঙটিঙে একজন লোকের মেযাজ ছিলো খুবই রুক্ষ। একবার সে হযরত ওমর (রা.)-এর পেছনে নামায আদায় করেছিলো। হযরত ওমর (রা.) নামাযে সূরা মোনাফেকূন তেলাওয়াত করেছিলেন। কোরআনের এই সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উপমা দিয়ে বলেছেন, 'তুমি আগ্রহে ওদের কথা শ্রবণ করো, যদিও ওরা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের মতো, ওরা যে কোনো শোরগোলকে মনে করে ওদেরই বিরুদ্ধে।'

কোরআনের এই আয়াত হারেসের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নামায শেষে সে হযরত ওমরকে (রা.) সরাসরি বলে ফেলে, ওহে খাত্তাবের পুত্র, নামাযের মধ্যে আপনি আমাকে উপহাস করেছেন। আজ থেকে আমি আপনার পেছনে আর কখনো নামায আদায় করবো না।

হযরত ওমর (রা.) কোনো জবাব না দিয়ে নীরব থাকলেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে নীরবতাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট জবাব। হযরত ওমর (রা.) মাঝে-মধ্যে রাগও করতেন, তবে সেই রাগ হতো সময়োচিত। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ অথবা আল্লাহর আইন সম্পর্কে কেউ সমালোচনা করলে হযরত ওমর (রা.) সহ্য করতেন না। উয়াইনা ইবনে হাসান ছিলো একজন বেদুইন সর্দার। তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র হোর ইবনে কায়েস ইবনে হাসানকে বললো, তাকে যেন সে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে নিয়ে যায়। চাচার অনুরোধ অনুযায়ী হোর চাচাকে খলীফার সামনে হাযির করলো। খলীফার সামনে যাওয়ার সাথে সাথে সেই বেদুইন সর্দার হযরত ওমরকে লক্ষ্য করে বলতে শুরু করলো, আপনি বখিল, আপনি বায়তুলমালের ধন-সম্পদ নিয়ে যা খুশী তাই করেন। আপনি গনিমতের মাল বন্টনে অনিয়ম করেন, বে-ইনসাফী করেন। সবগুলো কথাই ছিলো মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। হযরত ওমর (রা.) কৃপণ ছিলেন না। বায়তুলমাল এবং গনিমতের মাল নিয়ে তিনি কোনো প্রকার অনিয়ম করেছেন এটা তার শত্রুরাও বলতে পারবে না। হযরত ওমর (রা.) স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হলেন। উয়াইনা ইবনে হাসানকে মিথ্যা অপবাদের জন্যে শাস্তি দেয়াই ছিলো সমীচীন।

এই ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে উয়াইনার হোর কোরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন। 'ওয়া আ'রিয আনিল জাহেলিন।' অর্থাৎ মূর্খদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করো না। কোরআনের এই আয়াত শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) শান্ত হয়ে গেলেন। এতে বোঝা যায় হযরত ওমর (রা.)-এর জীবন ছিলো কোরআনের আলোয় আলোকিত। কোরআনের আদর্শে তিনি ছিলেন উজ্জীবিত। কোরআন অনুযায়ী গঠিত ছিলো তার চরিত্র। আহা আমরাও যদি ওরকম চরিত্র গঠনে সক্ষম হতাম!

উত্তম আলোচনার মজলিস

উত্তম উপদেশ দানে এবং গ্রহণে হযরত ওমর (র) কখনো অলসতার পরিচয় দিতেন না। তার দরবারে প্রায়ই সদুপদেশ সম্পর্কিত উত্তম আলোচনার মজলিস বসতো। সেই মজলিসে সবাই

স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারতো। কাউকে বিব্রত বা সংকুচিত হতে হতো না। এ ধরনের এক মজলিসে একদিন হঠাৎ হযরত ওমর (রা.) দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। সাথে সাথে তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যার অযু করা দরকার তিনি যেন অযু করে আসেন। একথা শোনার সাথে সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে জরীর (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমরা সবাই অযু করে এসে বসলেই ভালো হতো। আপনি যদি আদেশ দিতেন। হযরত ওমর (রা.) খুশীমনে সবাইকে নতুন করে অযু করার আদেশ দিলেন এবং আব্দুল্লাহকে বললেন, ওহে ইবনে জরীর তুমি আইয়ামে জাহেলিয়াতে সর্দার ছিলে, এখনো তুমি সর্দার।

হযরত ওমর (রা.) মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন

হযরত ওমর (রা.) মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গুণী লোকদের তিনি কদর করতেন। ইসলাম মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মূল্যায়নে উৎসাহিত করার তাকিদ দিয়েছে। যাতে করে মানুষ সত্যিকার পুণ্যবান মানুষে পরিণত হতে পারে। হযরত ওমর (রা.) একবার এক হজ্জ কাফেলার সাথে মক্কায় হজ্জ পালনের জন্যে যাচ্ছিলেন। কাফেলায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা ছিলেন। হযরত খাওয়াত ইবনে যোবায়ের আনসারীও সেই কাফেলায় ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিলো খুব মিষ্টি, খুব শ্রুতিমধুর। হযরত খাওয়াতকে কয়েকজন সাহাবা কবি জেরারের কবিতা শোনাতে বললেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, না এর চেয়ে আবু আব্দুল্লাহকে অর্থাৎ খাওয়াতকে তার স্বরচিত কবিতা শোনাতে দাও।

হযরত খাওয়াত (রা.) গভীর রাত পর্যন্ত নিজের রচিত কবিতা শোনালেন। সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে সে কবিতা শুনছিলো। শেষ রাতে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ব্যাস আর নয়। সবাই এবার নফল এবাদতের প্রস্তুতি গ্রহণ করুক।

একজন কবির নিজের কবিতা অন্যদের শোনানোর তৃপ্তিই আলাদা। এই তৃপ্তির কথা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। হযরত খাওয়াত (রা.)-কে তার নিজের রচিত কবিতা শোনানোর সুযোগ করে দিয়ে হযরত ওমর (রা.) গুরুত্বপূর্ণ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন।

বৈরাগ্যের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হজ্জ-এর সফরে কি করে রাতভর কবিতা আবৃত্তি শোনা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এ ধরনের ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইসলাম মানুষের আত্মিক উন্নতির পথ নির্দেশ করে। ইসলাম বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় না, দুনিয়া এবং পার্থিব জগতের উপায় উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বলে না। জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রসূল (স.) এর মজলিসে একশত বারেরও বেশী উপস্থিত থাকার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মসজিদে নববীর ভেতর সাহাবারা মাঝে মাঝে নীচু স্বরে কবিতা আবৃত্তি করতেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষামূলক কথাও আলোচনা করতেন। রসূল (স.) কখনো সাহাবাদের নিষেধ করেননি। মাঝে মাঝে কবিতা শুনে তিনি মৃদু হাসতেন।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, রসূল (স.) সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কোমল প্রাণের অধিকারী এবং সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মানুষ। তিনি হাসতেন। ইসলাম যদি সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে উদারতা প্রদর্শন করে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় না দিতো তবে ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে বহুমুখী বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতো। ইসলাম হচ্ছে ফেতরাত বা স্বভাবধর্ম। এ কারণে খুব অল্প সময়ে এই দ্বীন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

রসূল (স.)-এর উন্নত চরিত্র সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা.) আরো বলেন, রসূল (স.) ছিলেন উত্তম স্বভাবের উজ্জ্বল নমুনা। তিনি সকলের সাথে নম্র নত ব্যবহার করতেন। পরিবার-পরিজনের সাথে ঠাট্টা মস্করাও করতেন। নিজে হাসতেন, তাদেরও হাসাতেন। রসূল (স.) প্রায়ই এশার নামাযের পর সকল স্ত্রীকে একজন স্ত্রীর ঘরে একত্রিত করতেন। পালা অনুযায়ী সেই রাতে যে স্ত্রীর ঘরে তাঁর অবস্থানের কথা সেই ঘরে সবাই একত্রিত হতেন। সেখানে রাতের খাবার সবাই একত্রে খেতেন। আহারের সময় হাসি-তামাশা, রসিকতা বিনিময় হতো। আহারের পর সকল স্ত্রী নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন। রসূল (স.) শুয়ে পড়তেন। তিনি চাটাইয়ে শয়ন করতেন, তাঁর স্ত্রীও তাঁর পাশে চাটাইয়ে শয়ন করতেন। শোয়ার আগে পরিবারের লোকদের সাথে টুকটাক কিছু কথা বলতেন। কখনো কখনো তাদের নসিহত করতেন।

রসূল (স.)-এর পবিত্র মজলিসের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, রসূল (স.) সবাইকে আখেরাতের কথা বেশী বেশী স্মরণ করিয়ে দিতেন। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে দুনিয়ার কথাও আলোচনায় এসে যেতো। পানাহার প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা হলে রসূল (স.) সেই আলোচনায়ও অংশ নিতেন। রসূল (স.)-এর মজলিসে জীবন এবং জীবন্তাবস্থা পরিলক্ষিত হতো। সেখানে কারো চেহারায় ভীত বা বিব্রত অবস্থার ছাপ থাকতো না। চরিত্রহীনতা ও পাপাচার সম্পর্কিত কোনো আলোচনা সেই মজলিসে হতো না। এছাড়া পরিচ্ছন্ন মজলিসে সকল প্রকার হাসিখুশী এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকতো।

গীত ও সঙ্গীত

কবিতা, সঙ্গীত, গীত ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়। চরিত্রহীনতার প্রকাশ এবং অশালীনতা ও বেহায়াপনার প্রকাশ না থাকলে ইসলাম উপরোক্ত বিষয়সমূহের মাধ্যমে চিত্তবিনোদনে বাধা দেয় না। হযরত ওমর (রা.) হজ্জ সফরের সময় প্রায় সারারাত কবিতা আবৃত্তি শুনেছিলেন। এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) এশার নামাযের পর বেশী রাত জেগে থাকতে নিষেধ করতেন এবং সেই নিষেধ কেউ অমান্য করলে শাস্তিও দিতেন। উপরোক্ত দু'টি বিষয় বিপরীত মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু তা নয়। কারণ হযরত ওমর (রা.) কবিতা শুনেছিলেন সফরের সময়। গৃহে থাকার সময়ের অবস্থা এবং সফরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গৃহে থাকার সময় মানুষ রাতে ঘুমায়, দিনে কাজ করে। অথচ সফরের সময় রাতে সফর করে, দিনে ছায়াঘন স্থানে বিশ্রাম নেয়।

আমের ইবনে সা'দা বর্ণনা করেন, আমি কারজা ইবনে কা'ব (রা.), ছাবেত ইবনে যায়েদ (রা.) এবং আবু সাঈদ আনসারীর (রা.) মজলিসে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তারা নিজেদের দাসীদের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শুনছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমরা রসূল (স.)-এর সাহ-াবা অথচ তোমরা কী করছো? তারা বললেন, ভাই, যদি শুনতে চাও তবে বসে পড়ো, আর যদি শুনতে না চাও তবে যাও। রসূল (স.) খুশীর সময়ে আনন্দ প্রকাশ করার এবং দুঃখের সময় দুঃখ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আমের ইবনে সা'দ একথা শুনে অন্য কোনো সমালোচনামূলক মন্তব্যও করেননি অথবা এ বিষয়টি আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে অভিযোগ হিসেবেও পেশ করেননি।

রসূল (স.) একবার হযরত হাসান ইবনে সাবেত (রা.)-এর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রসূল (স.) হাসানের ঘরে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, বেশ কিছু লোক সেখানে উপস্থিত। শিরিন নামে একজন দাসী সবাইকে কবিতা শোনাচ্ছে। রসূল (স.) তাদেরকে নিষেধও করেননি। তাদের প্রশংসাও করেননি।

রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় হযরত আয়শা (রা.)-এর এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ে একজন আনসার সাহাবীর সাথে হয়েছিলো। হযরত আয়শা (রা.) বিয়ের পর মেয়েটিকে তুলে দিয়েছিলেন।

রসূল (স.) হযরত আয়শা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটির রুখসাত কি হয়ে গেছে? আয়শা (রা.) বললেন, জী হাঁ। রসূল (স.) বললেন, আনসাররা বিয়ের সময় বিয়ের গীত গাইতে পছন্দ করে। তুমি কি দুলহিনের সাথে কোনো গায়িকা পাঠিয়েছো? আয়শা (রা.) বললেন, জ্বী না। তিনি তখন বললেন, যয়নবকে পাঠিয়ে দাও। ওদের মনে আনন্দ দেবে। উল্লেখ্য, যয়নব মদীনার এক গায়িকা মেয়ে। বিয়ে শাদীর আসরে মেয়েদের মধ্যে বসে সে বিয়ের গান গায়। রসূল (স.)-এর কথামতো হযরত আয়শা (রা.) যয়নবকে কোবা পল্লীতে পাঠিয়ে দেন।

সালফে সালেহীনদের অর্থাৎ প্রথম যুগের আলেমদের অভিমত হচ্ছে, বিশেষ সময়ে গীত-সঙ্গীত অবৈধ নয়। মনে রাখতে হবে যে, সে সময়ের উম্মতে মুসলিমাহ গান-বাজনা নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকতেন না। বরং বিশেষ সময়ে যেমন আনন্দের কোনো ঘটনা উপলক্ষে, ঈদের সময়, বিজয়ের সময়, কষ্টকর কোনো কাজ সমাধা হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সেইসব অনুষ্ঠানে শালীন হালকা কিছু গান-এর আয়োজন করা হতো। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় এ ধরনের একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা জানা যায়। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় আনজাশা এবং সালমা ইবনে আকোয়া নামের দুই যুবক শ্রুতিমধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করেছিলো।

রসূল (স.) যেদিন মদীনায় হিজরত করে গিয়েছিলেন সেদিন মদীনাবাসীরা দফ বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলো এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রসূল (স.)-কে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা সঙ্গীত গেয়েছিলো। হযরত আবু বকর (র) তাদের নিষেধ করতে চাইলেন কিন্তু রসূল (স.) বললেন, হে আবু বকর ওদের ছেড়ে দাও। ওরা খুশী হবে আর মদীনার ইহুদীরা বুঝতে পারবে যে, ইসলাম কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ধর্ম নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট উদার।

পুরুষদের জন্যে নারীকণ্ঠে গান শোনা

পুরুষদের জন্যে নারীকণ্ঠে গান শোনা জায়েয নয়। তবে পুরুষ তার দাসীর কণ্ঠের গান শুনতে পারে। গানের মধ্যে কোনো ইসলাম পরিপন্থী এবং সচ্চরিত্র পরিপন্থী বিষয় থাকতে পারবে না। ওরকম বিষয় সব সময় হারাম বা নিষিদ্ধ। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান আল আমবারি, আবু বকর আল খালাল এবং তার সাথী আবদুল আযিয, আবু বকর ইবনুল আরাবী, আবুল ফারাজ আল জওযি শর্ত সাপেক্ষে গান শোনা জায়েয বলেছেন। আল জওযি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে এ বিষয়ে তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এসব বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, গান শোনা মোবাহ।

তাজবীদুল কোরআন

কবিতার কথা তো বলা হয়েছে। কোরআন পাঠ সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কি? কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারতিল, তাজবিদ, শ্রুতিমাধুর্য বা মিষ্টি সুরে পাঠ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মতামত রয়েছে। তবে কোরআন তেলাওয়াতে গানের মতো সুর করা মাকরূহ। তবে তারতিলের সাথে অর্থাৎ ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে, শ্রুতিমাধুর্যপূর্ণভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে। রসূল (স.) বলেছেন, কোরআনকে সুন্দর লাহানে শোভিত করো। অন্য এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, তোমার কণ্ঠের আওয়াযকে কোরআন দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করো।

হায়সাম আবু ফারসী একজন ভালো ক্বারী এবং মোজাদ্দেদ ছিলেন। তিনি স্বপ্নযোগে রসূল (স.)-এর সাক্ষাৎ পান। রসূল (স.) তাকে বলেন, তোমার নাম হায়সাম? তুমি কি খোশ এলহানে অর্থাৎ মিষ্টি সুরে কোরআন তেলাওয়াত করো? আল্লাহ তায়ালা যেন তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম অনুপ্রেরণামূলক কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। দুই লাইন কবিতা বারবার আবৃত্তি করা হচ্ছিল। সেই প্রথম লাইনের শেষ শব্দে ছিলো 'ওমরা' আর দ্বিতীয়

লাইনের শেষ শব্দ ছিলো 'জোহরা'। রসূল (স.) এবং সাহাবায়ে কেরাম ওমরা এবং জোহরা শব্দ দুটি বারবার আবৃত্তি করছিলেন। রসূল (স.) একজন আনসারী সাহাবার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তিনি সেখানে দোয়া করেন যে, কল্যাণ, বরকত, ভালোবাসা, রেযেক, স্বচ্ছলতা এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করুক। এরপর তিনি বলেন, ফুলহারে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দফ বাজাও। এরপর দফ বাজানো হলো। বিয়ের মজলিসে সুবাসিত শরবত এবং ফিরনি বিতরণের জন্যে বড় বড় থালা আনা হয়েছিলো। আনসারদের মধ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠানে সুবাসিত শরবত পরস্পরের প্রতি ছিটানোর রেওয়ায ছিলো। রসূল (স.)-এর উপস্থিতির কারণে সবাই শরবত ছিটানো থেকে বিরত ছিলো। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন শরবত ছিটানো হচ্ছে না কেন? সাহাবারা বললেন, আপনিতো নিষেধ করেছেন। রসূল (স.) বললেন, আমি তো নিষেধ করেছিলাম গনিমতের মালের ক্ষেত্রে যেন ছিটানো ছড়ানো না হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে সুগন্ধি যুক্ত শরবত ছিটাতে আমি তো নিষেধ করিনি। এরপর রসূল (স.) সুবাসিত শরবত সাহাবাদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং সাহাবারা তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করেন।

হযরত উম্মে নাবিত বর্ণনা করেছেন, বনি নাজ্জারের একটি মেয়ের বিয়ের পর তাকে স্বামীর ঘরে পাঠানো হলো। সেই অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমার কাছে দফ ছিলো। আমি দফ বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছিলাম। কবিতার কথায় বলা হচ্ছিল-

তোমাদের কাছে এসেছি মোরা
তোমাদের কাছে এসেছি,
তোমরা আমাদের সালাম করো
আমরা তোমাদের সালাম করছি,
মোহরানা যদি না দিতে সুবর্ণ সেনা
এই বধু যেতো না তোমাদের আঙ্গিনা।

রসূল (স.) আমাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, উম্মে নাবিত এখানে কি হচ্ছে? উম্মে নাবিত বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার ওপর কোরবান হোন, বনি নাজ্জারে আমাদের গোত্রের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আমরা তাকে স্বামীর ঘরে নেয়ার জন্যে বিদায় জানাচ্ছি। রসূল (স.) বললেন, তোমরা কি গাইতেছিলে? আমি উপরোক্ত কবিতা পুনরাবৃত্তি করলাম। রসূল (স.) বললেন, কথার সাথে এটাও যোগ করো—

লাওলাল খাত্তাতুহ ছামরাউ
মা ছামানা ওজরাইকুম
অর্থাৎ সমতল পথ আর গমের ক্ষেত
যদি না থাকতো তবে (ক্ষুধা তৃষ্ণায়)
তোমাদের কুমারী মেয়েরা
সবাই কাহিল হয়ে যেতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, দানশীল, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন চরিত্রের একজন মানুষ। দানশীলতার কারণে তাকে বলা হতো 'বাহারে ছাখাওয়াত' বা 'দান সাগর।' বলা হয়ে থাকে যে, তার জীবদ্দশায় তার চেয়ে অধিক দানশীল কেউ ছিলো না। তিনি গান শুনতে ইতস্তত করতেন না। যায়েদ ইবনে সাবেতকে (রা.) হযরত ওসমান (রা.) বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। একদিন হযরত ওসমান (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে গিয়ে গানের আওয়ায শুনতে পেলেন। হযরত ওসমান (রা.) জিজ্ঞেস

করলেন, কে গান গাইছে? হযরত যায়েদ (রা.) জবাব দিলেন আমার ক্রীতদাস ওহীব কবিতা আবৃত্তি করছে। ওহিবের আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে হযরত ওসমান (রা.) তাকে এক হাজার দেরহাম পুরস্কার দিলেন।

সুন্দর চেহারা একটি নেয়ামত

চেহারার সৌন্দর্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। সূরা ফাতের-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।' একদল মোফাসসের লিখেছেন, এই বৃদ্ধি করা দ্বারা কণ্ঠ মাধুর্য বা সুললিত কণ্ঠ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা লোকমানে কণ্ঠস্বর সম্পর্কে বলেন, 'স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর'। সুন্দর চেহারা একটি সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য মহান আল্লাহর বিশেষ দান। কর্কশ বা শ্রুতিমধুর নয় এমন কণ্ঠস্বর এক্ষেত্রে অন্তত আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রমাণ।

রসূল (স.) একবার একজন মোয়াযযনকে বললেন, বেলালের কণ্ঠের আওয়ায তোমার কণ্ঠের আওয়ায়ের চেয়ে উচ্চ এবং সুন্দর। সুললিত কণ্ঠ, মাধুর্যের অধিকারী, মোয়াযযেনের আযানের আওয়ায কানে মধু বর্ষণ করে। মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং নিজের অজান্তেই পা যেন মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়।

কিছু লোক একবার হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে হাযির হয়ে তাদের মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, তিনি নামাযের পর কি যেন সুর করে গাইতে থাকেন। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ইমাম সাহেবের কাছে গেলেন। ইমাম মসজিদেই ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উল্লেখ করে অভিযোগের বিষয় ইমামের কাছে জানতে চাইলেন। ইমাম বললেন, আমি নামায শেষে এই কবিতা আবৃত্তি করি–

নাফসি লা কুনতা ওয়ালা কানাল হাওয়া
রাক্বোবিল মাওলা অখাফা আরহাবি।
অর্থাৎ ওরে আমার নফস, ওরে আমার প্রবৃত্তি
তোর তো কোনো অস্তিত্বই ছিলোনারে।
আশা-আকাংখা বলতে তো কিছুই ছিলো না।
অস্তিত্বহীন থেকে তোর অস্তিত্ব দেয়া হয়েছে।
কাজেই তোর দয়ালু প্রতিপালকের হুকুম মেনে চলো,
তাকে ভয় কর, ভয়ে তুই কাঁপতে থাক।

হযরত ওমর (রা.) নিজেও কয়েকবার এই কবিতা আবৃত্তি করলেন। তারপর উপস্থিত লোকদের বললেন, যারা গুণগুণ করে গানের সুরে কবিতা আবৃত্তি করতে চায় তারা এই ধরনের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে।

উম্মে আবান বিনতে ওতবা নামের একজন মহিলা সাহাবীকে চারজন সাহাবী বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রস্তাব দানকারীরা হলেন, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত যোবায়ের এবং হযরত তালহা (রা.)। উম্মে আবান হযরত তালহা (রা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সাথে তার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। উম্মে আবান যে সময় হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে সময় তিনি ছিলেন আমীরুল মোমেনীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মে আবানের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

সাইয়্যেদেনা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফতকালে নারীর অধিকার ও মর্যাদা পূর্ণ সংরক্ষণ করা হতো। ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) নারীর মতামতের মূল্য দিতেন। নারী জাতি তাদের অধিকার সম্পর্কে সেই আমলেও সচেতন ছিলো।

মোজাহেদদের প্রতি নির্দেশ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বিশেষ হেকমত এবং কৌশলের সাথে নারী পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন। এরা উভয়েই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। মানব জাতির বংশধারা নারী পুরুষ উভয়ের ওপর নির্ভর করে। মোজাহেদরা জেহাদের জন্যে ঘর থেকে বের হন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বাড়ী যেতে পারেন না। তাদের বাড়ীতে স্ত্রীরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটায়। এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি নিজ কন্যা রসূল (র)-এর সহধর্মিনী হযরত হাফসাকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো মা, একজন বিবাহিতা নারী স্বামী ছাড়া কতোদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারে? হযরত হাফসা (রা.) বললেন, চার মাস থেকে বড় জোর ছয় মাস। একথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, কোনো মোজাহেদকে ছয় মাসের বেশী বাইরে কর্তব্যরত অবস্থায় রাখা যাবে না। তাদেরকে স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনের কাছে যাওয়ার জন্যে ছুটির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, হযরত ওমর (রা.) কতো দূরদর্শী এবং জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা অনেকেই দোষনীয় এবং লজ্জাশরমের বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই বিষয়টিও সঠিক যাচাই করে নারীর অধিকার সংরক্ষণ করে গেছেন। কিছু বিভ্রান্ত লোক এ মর্মে প্রচার প্রোপাগান্ডা চালায় যে, ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ওদের বিবেক বুদ্ধি তালাবদ্ধ। ওদের কোনো লজ্জা-শরম নেই, ওরা বেহায়া বেলাজ। অথবা তাদের উদ্দেশ্য অসৎ।

হযরত ওমর (রা.) একজন স্নেহশীল পিতার মতো, দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো শাসনাধীন মহিলাদের উত্তম উপদেশ দিতেন। তিনি মহিলাদেরকে ঘর সাজানোর এবং শিশু লালন পালনের শিক্ষা দিতেন। স্বামীদের খুশী রাখার শিক্ষা দিতেন। ভালো রান্না করার, ময়দা মাখানোর উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। ইতিহাস এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। তবাকাতে ইবনে সা'দ-এ এ সম্পর্কিত মজার মজার ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) বহু রকমের পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি খাবার তৈরিতেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সুস্বাদু খাবার রান্না করা একটি বিশেষ শিল্প। হযরত ওমর (রা.) তার বহুমুখী ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করতেন। কিন্তু তিনি খুব সাদাসিধে খাবার খেতেন। তিনি এতো সাধারণ খাবার খেতেন যে, কাউকে তার সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলে সেই লোক পালাতে পারলেই বেঁচে যেতো। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বহুবার আহারের সময় ওমর

(রা.)-এর কাছে এসেছিলেন, কিন্তু কখনো হযরত ওমর (রা.) কাছে বসে খাননি। একদিন হযরত ওমর (রা.) তার সাথে না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, আমি নরম সুস্বাদু খাবার খেতে অভ্যস্ত। আপনার শক্ত শুকনো খাবার আমি খেতে পারি না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মনে করো আমি উত্তম খাবার ব্যবস্থা করতে পারি না অথবা নিজেই ওরকম খাবার তৈরি করতে পারি না? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে সর্বোৎকৃষ্ট কোরমা কাবাব এবং মিহি আটার গরম গরম রুটি খেতে পারি। এরপর হযরত ওমর (রা.) কয়েকটি উত্তম খাবার তৈরীর ফর্মূলা বর্ণনা করলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার কথা শুনে বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, আপনি খাবার তৈরিতেও উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ তা ঠিকই বলেছো। শোনো সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি যদি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হতাম এবং অল্প অল্প করে নিজের নেকী সঞ্চয়ের কথা চিন্তা না করতাম তবে তোমাদের মতো আমিও জীবনের মজা লুটতে পারতাম।

হযরত ওমর (রা.)-এর নির্বিলাস জীবন যাপনের তাৎপর্য

হযরত ওমর (রা.) ভালো করেই জানতেন যে, জীবনে সাধ-আহলাদ পূরণ করা এবং বৈধ উপায়ে পানাহার, আরাম-আয়েশ শরীয়ত নিষেধ করেনি। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও তিনি যে সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন এর পেছনে বড় রকমের উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো। তিনি জানতেন, জনগণের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা দুঃখ-কষ্টে, অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। তিনি এ কারণেই দরিদ্রাবস্থায় জীবন কাটাতেন যাতে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণে হীনমন্যতার সৃষ্টি না হয় এবং তারা আত্মবিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়। তারা যখন লক্ষ্য করে যে, তাদের শাসকও তাদের মতোই দরিদ্রাবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন তখন তাদের মধ্যে এক অবর্ণনীয় আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য এবং গর্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমর (রা.) তার আমলী জীবনের মাধ্যমে জনগণের মনে এমন এক সম্মানজনক আসন তৈরী করেছিলেন যার উদাহরণ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজে সাদাসিধে নির্বিলাস জীবন যাপন করলেও সচ্ছল সক্ষম লোকদের তিনি কখনো তিরস্কার করতেন না। তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ছিলেন তাকওয়ার উত্তম আদর্শ। কিন্তু তিনি হালাল পন্থায় বিলাসিতাপূর্ণ আরামদায়ক জীবন যাপন করতেন। বকরির গোশত, ডিম, মুরগি ইত্যাদি উপাদেয় খাবার তিনি নিয়মিত খেতেন। অন্যান্য সচ্ছল পরিবারেও সবাই ভালো ভালো খাদ্য গ্রহণ করতো।

ইসলামে তাসাউফের এমন কোনো ধারণা পাওয়া যায় না যে, মানুষ দুনিয়া ত্যাগ করে নির্জনবাসে চলে যাবে অথবা গুহার মধ্যে বসে থাকবে। হালাল নেয়ামত ভোগ করা এবং সৌন্দর্যশোভিত জীবন যাপন করা ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। রসূল (স.)-এর কাছে চামড়ার খুব সুন্দর একটি তাঁবু ছিলো। তিনি এটি তায়েফ থেকে আনিয়েছিলেন। এটি ছিলো শিল্পসৌন্দর্যে অনন্য। রসূল (স.) একজন মোসাফেরের মতো দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। কিন্তু কখনো অপচয় অপব্যয় করেননি, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্টও হননি। এতদসত্ত্বেও তিনি বৈরাগ্য থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, আমি রোযাও রাখি, ইফতারও করি। ঘুমিয়েও পড়ি, রাতে জাগ্রতও হই। আমি খাবারও খাই, নারীদের সাথে বিবাহও করি। এসব হচ্ছে আমার সুন্নত। আমার সুন্নত থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তায়ালা সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন

দেহকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে ইসলামে কোনো নেকী নেই। রসূল (স.) মিষ্টি জিনিস আগ্রহের সাথে খেতেন। তিনি মধুর শরবত পান করতেন। ভুনা গোশত খেতেন। গরমের মধ্যে ঠান্ডা পানি পান করতেন। মাঝে মধ্যে পরিবার-পরিজনের জন্যে তিনি খাদ্যশস্য জমাও করতেন। বোখারী এবং মুসলিম শরীফ উভয় হাদীস গ্রন্থেই এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আয়েম্মায়ে ইসলাম, সালেহীন মোত্তাকিনরাও পুরো এক বছরের খাদ্যশস্য ক্রয় করে রেখে দিতেন। আসাদুল গাবা গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস, কাতাদা এবং হুমাম। তারা বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) একটি পোশাক সাতাশটি উটনীর পরিবর্তে ক্রয় করেন এবং সেটি তিনি পরিধান করতেন। হযরত মাকহুল হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.)-এর বর্ণনায় একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রসূল (স.)-এর অপেক্ষায় সাহাবারা দরোজার বাইরে এসে বসে থাকতেন।

রসূল (স.) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময়ে একটি পরিষ্কার বরতনে পানি নিয়ে ঘরের বাইরে এসে নিজের মাথা এবং চেহারা দেখে নিতেন। তারপর চেহারা, চুল পরিপাটি করে বাইরে বের হতেন। একদিন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর পয়গাম্বর, তা সত্ত্বেও আপনি এসব করেন? রসূল (স.) বললেন হ্যাঁ। কোনো ব্যক্তি যখন তার বন্ধু এবং ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে তখন সে যেন তার চেহারা-ছুরত পরিপাটি করে নেয়। আল্লাহ তায়ালা খুব সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।

রসূল (স.) বলেছেন, দুনিয়ায় সালুন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গোশত সর্বাগ্রগণ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রসূল (স.) সমগ্র জীবনে কোনো খাবারের মধ্যে দোষত্রুটি খুঁজে বের করেননি। আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিস হালাল করেছেন সেসব অকারণে বাদ দেয়ার মধ্যে কোনো নেকী নেই। ইমাম মালেক (র.) হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শীতের মৌসুমে চাদর ব্যবহার করতেন। সেই চাদরের মূল্য পঞ্চাশ দীনার। গ্রীষ্মকালে সেই চাদর কাউকে দান করে দিতেন। অথবা চাদর বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান করে দিতেন। তামিম দায়ী একখানি চাদর এক হাজার দীনারে ক্রয় করেছিলেন। সেই চাদর পরিধান করে তিনি নামাযের জন্যে মসজিদে আসতেন। মালেক ইবনে দীনার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সব সময় দামী পোশাক পরিধান করতেন। আদন বন্দরে তৈরী পোশাক পরিধান করতেন।

মানুষের দেহ তার বাহন। মানুষ তার রুহ এবং মনমগজের সাহায্যে সেই দেহের ওপর শাসনকাজ পরিচালনা করে। সওয়ারীর যথাযথ দেখাশোনা না করা হলে সওয়ারী সওয়ারকে তার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ইসলাম ভালো পোশাক, উত্তম খাবার, ভিটামিনযুক্ত পানীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেনি। ইবরাহীম আদহাম (র.) রাজ প্রাসাদের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে দরবেশী জীবন বেছে নিয়েছিলেন। একবার তাকে দেখা গেলো যে, বাজার থেকে বহু জিনিস ক্রয় করছেন। সেসব জিনিসের মধ্যে মাখন এবং পানিও ছিলো। এছাড়া ছিলো, মধু, রুটি এবং ফল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কেন এতো জিনিস ক্রয় করছেন? তিনি বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালা দান করেন তখন আমি পুরুষোচিতভাবে খেতে থাকি, আবার যখন অনাহারে থাকার মতো অবস্থা দেখা দেয় তখন পুরুষোচিতভাবেই ধৈর্য ধারণ করি। সুফিয়ান ছাওরি (র.) তার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক ছিলেন। তিনি গোশত, আঙ্গুর এবং ফালুদা খেয়ে নামাযের জন্যে ঘর থেকে বের হতেন। রসূল (স.) এক ব্যক্তির উস্কোখুস্কো চুল দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কাছে কি কোনো ধনসম্পদ আছে? সে বললো, হ্যাঁ আমার কাছে সব ধরনের ধনসম্পদই রয়েছে।

রসূল (স.) বললেন, তুমি নিজে কি অবস্থা করে রেখেছো? আল্লাহ তায়ালা যখন কারো ওপর কোনো প্রকার দয়া করেন তখন তিনি চান যে, বান্দার দেহে তার প্রকাশ থাকুক। আল্লাহ তায়ালা অপরিচ্ছন্নতা এবং কৃত্রিম দুরবস্থা পছন্দ করেন না।

সাহাবারা বৈধ উপায়ে অর্থসম্পদ উপার্জন করতেন এবং সেসব আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। বেশ কয়েকজন সাহাবা মৃত্যুর সময় পর্যাপ্ত ধনসম্পদ রেখে গেছেন। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, যোবায়ের ইবনে আওয়াম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা.) রসূল (স.) তাদের জীবদ্দশায়ই বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এসব সাহাবারা প্রচুর অর্থসম্পদ রেখে গেছেন।

রসূল (স.)-এর পরিচ্ছন্ন স্বভাব প্রকৃতি

রসূল (স.) অত্যন্ত পবিত্র পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মোসাফের অবস্থায় অথবা মুকিম অবস্থায় তিনি পোশাক এবং শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। সফরে যাওয়ার সময় তিনি সফরের সামগ্রীর মধ্যে চিরুনী, শিশি, তেল, মেসওয়াক এবং সুর্মা অবশ্যই নিতেন। তাঁর কাছে হাতীর দাঁতের তৈরি একখানি চিরুনি ছিলো। মিসরের বাদশাহ মাবুকাস তাঁকে সীসার তৈরি একটি গ্লাস উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। রসূল (স.) তরল পানীয় সেই গ্লাসে পান করতেন। ইসলাম শোভনতা সৌন্দর্যকে পছন্দনীয় রূপে আখ্যায়িত করে।

রসূল (স.) একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে সাহাবাদের কাছে এলেন। কিছুক্ষণ আগে গোসল করে তিনি সুগন্ধি মেখেছিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূলুল্লাহ (স.)! আপনি কি সুগন্ধি মেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। এরপর তিনি মানুষের ধনসম্পদের উল্লেখ করে বললেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের ধনসম্পদ থাকা দোষণীয় নয়। স্বাস্থ্য মানুষের ধনসম্পদের চেয়ে বেশী মূল্যবান। তবে এটা তখনই বেশী মূল্যবান হবে যখন মানুষ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। সুগন্ধি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নেয়ামত। ইসলামে নগ্নতা, বেহায়াপনা এবং নগ্ন পায়ে চলা দোষণীয়। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন তিনি এক যুদ্ধে রসূল (র)-কে বলতে শুনেছেন, সব সময় জুতো পায়ে বের হবে। মানুষের পায়ে যতোক্ষণ জুতো থাকে ততোক্ষণ সে যেন কোনো বাহনের ওপর থাকে।

রসূল (স.) মেসোয়াক ব্যাবহার করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় স্বভাবের মানুষ। হযরত আয়শা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রসূল (স.) ওযু করার আগে, ঘুমোবার আগে এবং ঘুম থেকে জেগে মেসোয়াক করতেন। বর্তমানে দেখা যায় একশ্রেণীর মানুষ এমনকি কিছু আলেমও নামাযের একামতের সময় পকেট থেকে মেসোয়াক বের করে কিছুক্ষণ দাঁত ঘষে কুলি করেন না এবং সেই ব্যবহার করা মেসোয়াক পকেটে রেখে দেন। এ ধরনের মেসোয়াক করা সম্পর্কে রসূল (স.)-এর কোনো হাদীস আছে কি না আমি জানি না। যদি থাকে তবে আমার চোখে পড়েনি। আমি নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করছি। তবে ওলামায়ে কেরামকে এ সম্পর্কে জেনে সঠিক পথনির্দেশ দেয়া দরকার। যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তবে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হাদীস এবং সুন্নত আমাদের জন্যে দলীলস্বরূপ। একটি হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা হলুদ এবং দুর্গন্ধময় দাঁত নিয়ে মসজিদে আসো? মেসোয়াক করো। অর্থাৎ মসজিদে আসার আগে মেসোয়াক করে দাঁত পরিষ্কার করো। মেসোয়াকের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখের পরিচ্ছন্নতা আনা এবং দুর্গন্ধ দূর করা। বুঝতে হবে যে, পানি ব্যবহার না করা হলে শুধু মেসোয়াক করে মুখের পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। মেসোয়াক করা ফরজ নয়, ওয়াজেবও নয়। এটা সুন্নত। ওযু করার সময় মেসোয়াক করা হলে এই সুন্নত আদায় হয়ে যায়। সহীহ মুসলিম-এর প্রথম খন্ডের ৫৮৩ পৃষ্ঠায় মেসোয়াক সম্পর্কিত হাদীসে

উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল (স.) কোনো অবস্থায়ই মেসোয়াককে ফরজ বলে আখ্যায়িত করেননি।

নারীর বিয়েতে তার সম্মতি প্রয়োজন

ইসলাম নারীকে তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। স্বামী নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর ইচ্ছে ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না। হযরত ওমর (রা.) এ সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.)-কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আতেকা শর্ত দিলেন যে, আমাকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতে পারবে না এবং মারপিট করতে পারবে না। হযরত ওমর (রা.) এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। ফলে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, একজন রাষ্ট্রপ্রধান বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, অথচ সেই নারী শর্ত দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান সেই শর্ত মেনেই তাকে বিয়ে করেছেন। কারণ এ রকম শর্ত আরোপ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হযরত ওমর (রা.) কিন্তু মহিলাদের এই ধরনের শর্ত আরোপ পছন্দ করতে পারছিলেন না। তবুও মেনে নিয়েছিলেন। ফলে বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।

উম্মে আবান বিনতে ওতবা নামের একজন মহিলা সাহাবীকে চারজন সাহাবী বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রস্তাব দানকারীরা হলেন, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত যোবায়ের এবং হযরত তালহা (রা.)। উম্মে আবান হযরত তালহা (রা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সাথে তার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। উম্মে আবান যে সময় হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে সময় তিনি ছিলেন আমীরুল মোমেনীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মে আবানের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। এতেই বোঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ছিলো সেই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইসলামী সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। একজন অন্যজনের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, নারীদেরও পুরুষদের ওপর যুক্তিসঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন নাকি পুরুষদের অধিকার রয়েছে নারীদের ওপর। তবে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। এই প্রাধান্য এ কারণে যে, নারীদের ভরণ-পোষণের পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষদের ওপর ন্যস্ত। কোরআনে পুরুষদের এ মর্মে নিষেধ করা হয়েছে তারা যেন নারীদের কোনো প্রকার ক্ষতি করার চেষ্টা না করে। পবিত্র কোরআনের সূরা তালাক-এর ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদেরকে উত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলার জন্যে।'

সামুরা ইবনে জুন্দবের মাতা উম্মে সামুরা অসাধারণ সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিধবা। তিনি মদীনায় আসার পর অনেকেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এমন ব্যক্তিকে বিয়ে করবো যিনি আমার পুত্র সামুরা সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ করবে। একজন আনসারী এই শর্ত মঞ্জুর করেছিলেন। ফলে উম্মে সামুরা তাকে বিয়ে করেন।

একটি ঐতিহাসিক বিয়ে

অনেক সময়ে দেখা যায়, মুসলিম মেয়েরা তাদের হবু স্বামীকে বিয়ের আগে নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা খোলাখুলি বলে ফেলে। বিয়ের আগে একে অন্যকে দেখার সময়ে খোলাখুলি নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা জানানো দোষণীয় নয়। বিনতে মালহান ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা। তিনি ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রা.) মা। তাকে আবু তালহা বিয়ের পয়গাম পাঠান। তিনি সেই সময় ছিলেন পৌত্তলিক। বিনতে মালহান বললেন, আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু তোমার সাথে আমার বিয়ে সম্ভব নয়। কেননা তুমি কাফের, আর আমি

মুসলিম। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তবে তোমার মুসলমান হওয়াই আমার জন্যে মোহরানা বিবেচিত হবে এবং আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ইসলামের বহু খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এই স্বামী-স্ত্রী মদীনায় আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

রসূল (স.) তাঁর স্ত্রীদের কখনো প্রহার করেননি

ইসলাম নারীদের যথেষ্ট সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছে। নারীর অবাধ্যতা এবং অসদাচরণ প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দিতে বলা হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে প্রথমে স্ত্রীকে উপদেশ দিতে হবে। যদি না মানে তবে বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। এরপরও যদি তার মাথা ঠিক না হয় তবে তাকে প্রহার করতে হবে। এই প্রহারও এমনভাবে করা যাবে না যাতে সে আহত হয়। মুখমন্ডলে প্রহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাপড় দিয়ে চাবুক তৈরি করে মারতে বলা হয়েছে। রসূল (স.) কখনো তাঁর স্ত্রীদের প্রহার করেননি।

এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর কাছে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। মহিলা ছিলো রুক্ষ মেযাজের এবং কটুভাষী। রসূল (স.) বললেন, কটুভাষী হলে তাকে তালাক দিয়ে দাও। সেই ব্যক্তি বললো, তার গর্ভজাত আমার সন্তান রয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করছে। রসূল (স.) বললেন, তাহলে তাকে উপদেশ দিতে থাকো। যদি তার মধ্যে কোনো মঙ্গল থেকে থাকে তবে ঠিক হয়ে যাবে।

নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্যে রসূল (স.) প্রায়ই লোকদের নসীয়ত করতেন্ একত্রে বসবাসের সময়ে যেন ভালো ব্যবহার করে। যদি একত্রে বসবাস করা সম্ভব না হয় তবে যেন ভালোভাবে পৃথক হয়ে যায়। রসূল (স.) স্ত্রীদের গালাগাল করতে এবং মারপিট করতে নিষেধ করেছেন। কেউ কেউ এরপর এসে অভিযোগ করলেন যে, বেশী প্রশ্রয় পেয়ে তাদের মেজায বিগড়ে গেছে। তারা এখন পুরুষদের কথা শোনো না। রসূল (স.) বললেন, যারা কথা শোনে না তাদের মারো। তবে মারপিটও তারাই করবে যারা তোমাদের মধ্যে খারাপ প্রকৃতির লোক।

নারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

নারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এই প্রমাণই যথেষ্ট যে, রসূল (স.)-এর ওপর একজন নারী বিবি খাদিজা (রা.) প্রথম ঈমান এনেছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। তিনি রসূল (স.)-কে সকল প্রকার সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং রসূল (স.)-এর সকল বিপদে-আপদে পাশে ছিলেন এবং তাকে সাহস যুগিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) কোনো নারীর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠানোর সময় ব্যাখ্যা করে দিতেন যে, কি কারণে তিনি সেই নারীকে বিয়ে করতে চান। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে তার কন্যা উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। হযরত আলী (রা.) জবাবে বললেন, উম্মে কুলসুম এখনো ছোট।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আবুল হাসান ওর বিয়ে আমার সাথে দাও। এই আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে আমি রসূল (স.)-এর নৈকট্য লাভে আগ্রহী। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, আমি উম্মে কুলসুমকে এতোটা সম্মান করবো এবং মর্যাদা দেবো যা অন্য কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আমি তার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। হযরত আলী (রা.) অবশেষে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিয়ে দেন।

রসূল (রা.) যেভাবে পুরুষদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন একইভাবে নারীদের অধিকারেরও হেফাযত করতেন। পুরুষদের রোগ হলে হযরত ওমর (রা.) শুশ্রূষা করতেন, রোগের খোঁজখবর নিতেন। মহিলাদের রোগ হলেও খোঁজখবর নিতেন। আসাদুল গামা নামক গ্রন্থে উল্লেখ

রয়েছে যে, রসূল (স.) একজন মহিলা আনসার সাহাবার অসুখের খোঁজখবর নিতে গেলেন। মহিলাকে তার অসুখের কথা জিজ্ঞেস করা হলে মহিলা বললেন এখন জ্বর নেই। আমি ভালো আছি। রসূল (স.) বললেন, অসুখ হলে ধৈর্য ধারণ করো। অসুখ হলে মুসলমানের দেহ পাপের কালিমা থেকে ঠিক তেমনি পাকসাফ হয়ে যায়, যেমন নাকি কামার লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে মরিচা পরিষ্কার করে রসূল (স.) সেসব সাহাবাকে বেশী মর্যাদা দিতেন যারা দ্বীনের জন্যে অধিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং অধিক জ্ঞানার্জন করেছেন। মহিলা সাহাবাদের ক্ষেত্রেও একই রকম মূল্যায়ন করতেন। হযরত আলীর (রা.) মা সাইয়েদা ফাতেমা বিনতে আসাদ মদীনায় ইন্তেকাল করেন। রসূল (স.) নিজের জামা দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা করেন এবং দাফনের আগে খননকৃত কবরে শয়ন করেন। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে রসূল (স.) বলেন, আবু তালেবের পর ফাতেমা বিনতে আসাদের মতো স্নেহ ভালোবাসা আমি অন্য কারো কাছে পাইনি। আমি নিজের জামা দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা এ কারণেই করেছি যে, আমি চাই আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতী পোশাক পরিধান করান। আমি তার কবরে এ কারণেই শয়ন করেছি যাতে তিনি কবর আযাব থেকে রেহাই পান।

পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালোবাসা রসূল (স.)-এর সুন্নত

রসূল (স.) তাঁর পরিবার-পরিজনকে খুবই ভালোবাসতেন। ঈদ এবং অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষে কৌতুক প্রদর্শনকারীনি হাবশী মহিলাদের ডেকে আনা হতো। কৌতুক ক্রীড়া প্রদর্শনে মহিলারা আনন্দিত হতেন। রসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবারা স্ত্রীদের মনোরঞ্জন এবং আরাম-আয়েশের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। ঘর পরিপাটি করা, আটা মাখানো, কাপড় তালি দেয়া ইত্যাদি কাজে রসূল (স.) স্ত্রীদের সহায়তা করতেন। হযরত আলী (রা.) সব কাজ এমনভাবে বন্টন করে রেখেছিলেন যে, ঘরের বাইরের সব কাজ তিনি এবং তার মা করতেন, আর ঘরের ভেতরের সব কাজ হযরত ফাতেমা (রা.) করতেন। হযরত ফাতমা (রা.) অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) তার শুশ্রূষার জন্যে গেলেন। হযরত আলী (রা.) বিবি ফাতেমাকে বললেন, হযরত আবু বকর (রা.) দরোজায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তুমি বলো, উনি আসবেন কি না। ফাতেমা (রা.) স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তার ভেতরে আসা পছন্দ করেন? হযরত আলী (রা.) বললেন হাঁ। ফাতেমা (রা.) বললেন, ঠিক আছে, তাঁকে ভেতরে ডেকে আনুন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ভেতরে এলেন। সহীহ মুসলিমের পঞ্চম খন্ডের ৬২৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস রয়েছে। উক্ত হাদীসের সারমর্ম হলো, স্বামী যদি স্বেচ্ছাসেবকের মতো মনোভাব নিয়ে স্ত্রীর সেবা করে তবে সে বিনিময়ে পুরস্কার পাবে। যদি খেদমত না করে তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

সওদা বিনতে জামআ (রা.) ছিলেন রসূল (স.)-এর সহধর্মীণী। হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রসূল (স.) হযরত সওদাকে (রা.) বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন বড়োই খোশমেআজ ও হাসিখুশী স্বভাবের মহিলা। একদিন তিনি তাঁর স্বামী রসূল (স.)-কে বললেন, গতরাতে আমি আপনার পেছনে নামায আদায় করেছিলাম। কিন্তু সেজদায় নাক থেকে রক্ত পড়ার উপক্রম হলে নাক টিপে ধরেছিলাম। হযরত সওদার (রা.) রসিকতাপূর্ণ এই উক্তিতে রসূল (স.)-এর সেজদায় গিয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থানের ইঙ্গিত রয়েছে। একথা শুনে রসূল (স.) পুলক বোধ করলেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দ নামক গ্রন্থে স্ত্রীদের সাথে রসূল (স.)-এর হাসি-রসিকতার বহু ঘটনার বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। সেইসব রসিকতায় তাঁর আলোচনার মজলিস নির্মল আনন্দে ভরে যেতো।

নারীদের কাজ করার তাকিদ

রসূল (স.) মুসলমান নারীদের কাজ করার তাকিদ দিতেন। তিনি বলেন, মোমেন নারীর সবচেয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে চরকা কাটা। নারী তার সীমারেখার মধ্যে ঘরে এবং বাইরের সব

কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে। এতে সমাজের এবং নারীর নিজের কল্যাণ হতে পারে। হযরত ওমর (রা.) মোহাজের মহিলাদের জন্যে দুই হাজার দেরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করেন।

সেই আমলে নারী নিজ হাতে কাজ করায় লজ্জাবোধ করতো না। আব্দুল্লাহ ইবনে আলকারশি বলেন, আমি হাজ্জাজের স্ত্রীকে দেখেছি। তিনি নিজের ঘরে বসে চরকা কাটছিলেন। আমি বললাম, আপনি তো গভর্নরের স্ত্রী অথচ আপনি চরকা কাটছেন? তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে আমার দাদার বরাতে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রসূল (স.) বলেছেন, নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পুরস্কার সেই নারী পাবে যে নারী অধিক পরিশ্রমী।

আল্লাহ তায়ালা নারীদের এ মর্মে স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, স্বামী যদি তাদের জীবন ধারণের উপকরণের যথাযথ ব্যবস্থা না করে তবে তারা স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদের রুজু করতে পারে। পুরুষদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, তারা নারীর সকল প্রকার অধিকার আদায় করবে। যদি তা না করে তবে তাদের ওপর অত্যাচার না করে তাদেরকে মুক্ত করে দেবে।

চিন্তার স্বাধীনতা

রসূল (স.) নারীদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি কোরায়শ গোত্রের মহিলাদের কাছ থেকে এ মর্মে বাইয়াত নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দাও বিনতে ওতবা বাইয়াতকারিনী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মনে করেন আপনার গোত্রের কোনো মহিলা এতো নীচু কাজ করতে পারে? এ প্রশ্ন শুনে রসূল (স.) বিরক্ত হলেন না। তিনি যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন।

নারীরা যুদ্ধের ময়দানে অনেক বড় বড় কাজ করেছে। বাইয়াতে রেযোয়ান ছিলো মৃত্যুর বাইয়াত। এর অর্থ ছিলো সাহাবারা হযরত ওসমানের (রা.) রক্তের বদলা নেবেন এবং কেউ পলায়নের চিন্তা করবেন না। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও বাইয়াত করেছিলেন। হযরত ফারিয়া বিনতে মালেক ইবনে শানান সেই বাইয়াতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে একজন নারী প্রথম শাহাদাত বরণের গৌরব অর্জন করেন। সকল মুসলমান জানেন যে, ইসলামের শহীদ হচ্ছেন সাইয়েদা সামিয়া (রা.)। হযরত লায়লা গেফারিয়ার নেতৃত্বে মহিলারা যুদ্ধের ময়দানে অংশ নিতেন। রোগীদের এবং আহতদের দেখাশোনা করতেন।

নারীরা ইসলামের সেবা করা এবং নিজেদের ঘরে কল্যাণকর কাজ করা ছাড়াও অর্থ-সম্পদ জমা রাখতেন। ব্যবসা করে তারা অর্থ উপার্জন করতেন। হযরত আনমারিয়া (রা.) নিজে ব্যবসা করতেন এবং ব্যবসায়ের ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে রসূল (স.)-এর কাছে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। একবার রসূল (স.) ওমরাহ করার পর সাফা মারওয়া সাঈ সমাপ্ত করেন। তিনি এহরাম খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় আনমারিয়া (রা.) তাঁকে ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। রসূল (স.) সেসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম নারীগণ

মক্কার প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত সামিয়া (রা.)। মক্কার সাহাবারা ইসলাম গ্রহণের কারণে বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। জানিয়া, মাহদিয়া এবং তাদের কন্যাদের কথা কে না জানে। এসব নারীদের ভূমিকা ইসলামে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

উম্মে সেলিম হোনায়েনের যুদ্ধে দৃঢ়পদ ছিলেন। বহু বীর পুরুষ কুপোকাত হওয়ার পর সাইয়েদা উম্মে সেলিম তার স্বামী আবু তালহার উটের লাগাম এক হাতে ধরলেন অন্য হাতে তলোয়ার তুলে নিলেন। হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধে শত্রু সৈন্যদের

ক্রমবর্ধমান গতিরোধের উদ্দেশ্যে পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেন। রোমক সৈন্যরা মুসলিম মহিলাদের তাঁবুতে হামলা করতে উদ্যত হলে হযরত আসমা (রা.) তাঁবুর খুঁটি উপড়ে নেন এবং নয়জন অমুসলিম সৈন্যকে পিটিয়ে হত্যা করেন। হযরত উমাইমা বিনতে কয়েস ইবনে আবু ছালত গেফারিয়া বলেন, আমি গেফারিয়া গোত্রের নারীদের সাথে রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে চাই। আমরা আহত রোগীদের সেবা করবো। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন। তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ।

সাইয়েদা উম্মে মুসা লাখমিয়া বর্ণনা করেন যে, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমরা নারীরা একটি তাঁবুতে ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একজন রোমক সৈন্য একজন মুসলিম মোজাহেদকে কাবু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাঁবুর একটি খুঁটি উপড়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে রোমক সৈন্যটির মাথায় আঘাত করলাম। মুসলিম সৈন্যটি মুক্ত হয়ে সাথে সাথে সেই রোমক সৈন্যকে হত্যা করলেন। সাইয়েদা উম্মে হাকিম বিনতে যোবায়ের ইবনে আবদুল মোত্তালেব ছিলেন রসূল (স.)-এর চাচাতো বোন। তিনি মারজুজ সাফার যুদ্ধে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে সাতজন কাফের সৈন্যকে হত্যা করেন। সেই জায়গায় হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রা.) তাঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তাঁরা সেখানেই বাসর রাত অতিবাহিত করেন।

জ্ঞান গরিমায় উজ্জ্বল মুসলিম নারী

পুণ্যশীলা এবং তাকওয়াসম্পন্ন যেসব মহিলাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি জ্ঞানের ঐশ্বর্য দান করেছেন তাদেরকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। সহীহ হাদীসে এ ধরনের বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে যে, সাহাবারা পুণ্যশীলা জ্ঞানসম্পন্না মহিলাদের কাছে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা জানার জন্যে হাযির হতেন। পর্দার আড়ালে থেকে তারা জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। নারী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারবে, তবে তাকে অবশ্যই পর্দার সাথে যেতে হবে। এ বিষয়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ এজমা রয়েছে। পর্দার সাথে বাইরে যাওয়ার আদেশ এ কারণেই দেয়া হয়েছে যাতে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি না যায়। দূরবর্তী কোনো জায়গায় সফরে যেতে হলে মুসলিম নারীকে নিজের মোহরেম আত্মীয়কে সাথে নিতে হবে। বিশেষ কোনো কারণে যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে নারী একা সফর করতে পারে। একা যাওয়ার মতো অনুমতি তখনই রয়েছে যখন নারীর প্রস্তাবিত সফর কোনোক্রমেই মূলতবী না করা যায় এবং এ বিষয়টি খুবই জরুরী হয়ে দেখা দেয়।

আলিয়া বিনতে হাসান ছিলেন বনি শায়বান গোত্রের এক ব্যক্তির দাসী। তবে তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং জ্ঞানী। তার কাছে হাদীস এবং ফেকাহ শেখার জন্যে বহু আলেম বসরায় যেতেন। সেই সময় মদীনার নারীদের মধ্যে যয়নব বিনতে উম্মে সালমা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ।

হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর হামলার পর মজলিসে শূরার সদস্যদের দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। বিষয়টি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ এবং নাজুক। মজলিসে শূরার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ফাতেমা বিনতে কয়েস ইবনে খালেদের ঘরে।

হযরত বেলাল (রা.) সর্বপ্রথম আযান সাইয়েদা নাওয়ার বিনতে মালেকের ঘরের ছাদের ওপর থেকে দিয়েছিলেন। এসব কিছুই হচ্ছে ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

নারীদের ভালো পোশাক ব্যবহারের অনুমতি

নারীর ভালো পোশাক পরিচ্ছদ এবং সাজ-সজ্জার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এর সবই স্বামীর জন্যে হতে হবে। বহু লোকের কাছে দর্শনীয় হওয়ার অনুমতি ইসলাম দেয় না।

হযরত উম্মে রাআলা কাশিরিয়া (রা.) যুবতী মেয়েদের চুল বাঁধা, মেহেদী লাগানো এবং রূপচর্চার কাজ করতেন। একদিন তিনি রসূল (স.)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমি মেয়েদের রূপসজ্জার কাজ করি যাতে মেয়েরা তাদের স্বামীর মন জয় করতে পারে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? রসূল (স.) বললেন, যদি সাজ-সজ্জার তাদের প্রয়োজন থাকে তবে তুমি তোমার কাজ করতে থাকো। একজন আনসার মহিলা সাহাবী বায়তুল মাকদেস এবং কাবা উভয় কেবলার দিকে ফিরেই নামায আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, একবার রসূল (স.) আমার কাছে এসেছিলেন। আমি হাতে মেহেদী লাগাইনি। রসূল (স.) বললেন, হাতে মেহেদী লাগাও। মেহেদী ছাড়া মেয়েদের হাত পুরুষদের হাতের মতো দেখা যায়। সেই মহিলা আশি বছর বয়স কালেও মেহেদী লাগাতেন। রসূল (স.)-এর আদেশ পাওয়ার পর থেকে তিনি কখনো মেহেদী লাগানো পরিত্যাগ করেননি।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মিসরে আমর ইবনুল আস বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র। জ্ঞানান্বেষীরা সেখানে সমবেত হতেন। শিক্ষকদের মধ্যে সেই সময় সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন সাইয়েদা উম্মুল খায়ের হেজাযিয়া।

বিয়ের আগে কনে দেখা

বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর কনেকে বর একবার দেখে নিতে পারে। কিন্তু এই আদেশ ওয়াজিব নয়। আল কুরতুবী ৫৩০৪ পৃষ্ঠায় সুনানে আবু দাউদ থেকে হযরত জাবেরের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ের পয়গাম পাঠায় তখন কনে সম্ভব হলে একবার দেখে নেবে। এক নযর দেখা জায়েয, কিন্তু বিয়ের আগে বারবার দেখা সাক্ষাত করা, কথা বলা ইসলামে কিছুতেই বৈধ বলা হয়নি। এক নযর দেখাও হতে হবে অভিভাবকদের সামনে।

শহীদ জননী

মুসলিম নারীরা চরিত্র শক্তি, কাজ, দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রকার তৎপরতায় উন্নত আদর্শ স্থাপন করেছেন। তারা বীরত্ব, সাহসিকতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এমন মানদন্ড পেশ করেন যা দেখে ঈমান তাজা হয়ে যায়। সাইয়েদা মায়া'যা আদুবিয়ার পুত্র শহীদ হওয়ার পর কয়েকজন মহিলা তার কাছে এলেন। সাইয়েদা মায়া'যা বললেন, তোমরা যদি আমাকে মোবারকবাদ জানাতে এসে থাকো তবে ঠিক আছে। যদি এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসে থাকো তবে তোমরা চলে যেতে পারো। আল্লাহর পথে যে পুত্র শহীদ হয়েছে তার জন্যে তার মা কিছুতেই শোক প্রকাশের কথা ভাবতে পারে না।

বীরত্ব এবং সাহসিকতার ঘটনাবলী যারা লিখেছেন, তারাও জ্ঞানের আলো জ্বেলে গেছেন। একবার উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে একটি মাসআলা নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। মাসআলা হচ্ছে, স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে যে স্বামী মারা যায় সেই নারী কবে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে? উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, সন্তান প্রসবের পর বিয়ে করতে পারবে। হযরত ওমর (রা.) এই মতামতের সাথে একমত হননি। এমতাবস্থায় উবাই ইবনে কা'ব-এর স্ত্রী উম্মে তোফায়েল একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত মোয়াবিয়া আসলামিয়ার স্বামী যায়েদ ইবনে খাওলার মৃত্যুর সময় সাবিয়া ছিলেন গর্ভবতী। সন্তান প্রসবের পর রসূল (স.) দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেন। এই হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) নীরব হয়ে যান।

মুসলিম নারীদের অশিক্ষিত রাখা ইসলামী নীতির পরিপন্থী এবং তা নারীদের ওপর যুলুম। প্রথম শতাব্দীতে নারীরা লেখাপড়া জানতো এবং নিজে শিখে অন্যদের শিক্ষা দিতো। উম্মে সা'দ বিনতে রবি ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। সাহাবারা তার কাছে যেতেন এবং কোরআন হাদীসের

জ্ঞান অর্জন করতেন। কেরাত ভুল হলে তিনি শুদ্ধ করে দিতেন। মহিলারা দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগের ক্ষেত্রে বড় রকমের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হযরত উম্মে শোরাইক মক্কায় কঠিন অবস্থায়ও কোরায়শ মহিলাদের দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তারা চুপিসারে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ইসলাম গ্রহণকারিনী মহিলাদের শিখিয়ে দিতেন কিভাবে তারা গোপনে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করবে।

হযরত উম্মে ছায়েব (রা.) রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় আতর বিক্রি করতেন। রসূল (স.) তাকে নিষেধ করেননি। সাইয়েদা কাইযা বিনতে সা'দ আসলামিয়া মসজিদে নববীর বাইরে প্রায় লাগোয়াভাবে একটি তাঁবু স্থাপন করেন। সেই তাঁবুতে তিনি আহত রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ওষুধ এবং অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে তিনি খয়বরের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। এসব মহিলারা জীবনের বহুমুখী কর্মচাঞ্চল্যে নিজেদেরকে জড়িত করেছেন, কিন্তু লজ্জা-শরম কখনোই বিসর্জন দেয়ার কথা চিন্তা করেননি। বরং লজ্জা-শরম, সংকোচ সব সময় বজায় রেখেছেন। হযরত খালদাদ নামে একজন আনসার সাহাবী শহীদ হলেন। পুত্রের শাহাদাতের খবর মাকে জানানো হলো। উম্মে খালদাদ পুত্রের দেহ দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছিলেন বোরখায় সম্পূর্ণ আবৃতা। যারা দেখছিলেন তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, উম্মে খালদাদ, তোমার পুত্র শহীদ হয়ে গেছে অথচ তুমি এখনো বোরখা পরিধান করে আছো? তিনি রুষ্টভাবে জবাব দিলেন, আমার কলিজার টুকরা খালদাদ শহীদ হয়ে গেছে, তাই বলে আমি কি নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করবো?

ইবনে হাযামের অভিমত হচ্ছে, প্রয়োজন হলে মুসলিম মহিলারা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বও পালন করতে পারে। মুসলিম মহিলারা জ্ঞানার্জনের জন্যে এতোটা মনোযোগী হতেন যে, তারা রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতেন। একবার একজন সাহাবা এসে জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষরাতো সব সময় আপনার কাছে এসে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পান, কিন্তু আমরা মহিলারা বঞ্চিত থাকি। আমরা দাবী করছি যে, সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন আমাদের জন্যে সময় নির্ধারণ করে দিন। মহিলাদের দাবী অনুযায়ী রসূল (স.) মহিলাদের জন্যে সপ্তাহে একদিন নির্ধারণ করেন। মহিলারা সেদিন একঘরে একত্রিত হতেন এবং রসূল (র)-এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন।

উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর চোখের সামনেই এসব ঘটনা ঘটেছিলো। তিনি নারীর মর্যাদা ভালোভাবেই জানতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তার কন্যা উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকরকে বিয়ে করার জন্যে ওমর (রা.) হযরত আয়শার (রা.) কাছে প্রস্তাব পাঠান। সাইয়েদা আয়শা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনার প্রস্তাব কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যাবে? হযরত ওমর (রা.) চলে যাওয়ার পর উম্মে কুলসুম হযরত আয়শা (রা.)-এর কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, আপনি জানেন যে, হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত কড়া মেযাজের মানুষ। তাছাড়া তার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর। আমি তো এমন যুবককে বিয়ে করতে চাই, যে যুবক দুনিয়ার সকল নাজ নেয়ামত আমার পায়ের ওপর এনে রাখবে।

বোনের কাথা শুনে হযরত আয়শা (রা.) নীরব হয়ে গেলেন। এরপর হযরত আমর ইবনুল আসকে (রা.) ডেকে তার কাছে এ সমস্যা তুলে ধরলেন। আমর (রা.) বললেন, আম্মাজান আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এ সমস্যার সমাধান বের করছি।

আমর ইবনুল আস (রা.) উম্মুল মোমেনীনের কাছ থেকে সোজা আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গেলেন। তাকে বললেন, আমীরুল মোমেনীন, আপনি কি নতুন কোনো বিয়ে

করতে চান? খলীফা বললেন, হ্যাঁ। আমর জানতে চাইলেন কাকে? খলীফা বললেন, উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকরকে। আমর বললেন, আপনার জন্যে এই বিয়ে সমীচীন হবে না। মেয়েটি এতিম। নাজ- নেয়ামতের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। আপনার ঘরে সে যদি কঠোর সাধনার জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে না পারে তবে সমস্যা দেখা দেবে। সে তো আবু বকর (রা.)-এর মেয়ে। যদি সে কখনো নিজের পিতার উদাহরণ দিয়ে নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করে তবে আমাদের সবার জন্যেই সেটা কষ্টকর হবে।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে আয়শা তোমাকে কিছু বলেছে। আমর বললেন, জ্বী হ্যাঁ। ওমর বললেন, ঠিক আছে। হযরত ওমর (রা.) উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করার ইচ্ছা ত্যাগ করার পর তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.)-এর সাথে উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়ে গেলো।

উম্মে কুলসুম বিয়ে করতে অস্বীকার করলেও হযরত ওমর কিছু মনে করলেন না। তাঁর মনের প্রসারতা এই ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যায়। এই ঘটনায় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান ও কোনো ব্যক্তির অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

মুসলিম মেয়েদের প্রতি উপদেশ

মুসলিম মেয়েদের আমি বলতে চাই যে, ইসলাম হচ্ছে তাদের দুর্গ। ইসলামই তাদেরকে সব রকম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে তাদেরকে ইসলামের অনুসারী হতে হবে। যেসব বস্তুবাদী লোক মুসলিম মেয়েদেরকে সুখের স্বপ্ন দেখাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কৌশলে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তারা মেয়েদের নিকৃষ্ট দুশমন। ওদের শয়তানী ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম মেয়েদের সতর্ক থাকতে হবে। মাদাস মারশেল, মাদাসম বোফোয়ার, মাদাম অমুক অমুকের পেছনে ছোটার চেয়ে ইসলামের সোনালী ইতিহাসের মনীষীদের জীবনী থেকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা নিতে হবে। এর মধ্যেই তোমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ, দেশ জাতি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণ রয়েছে।

রসূল (স.) যেভাবে মুসলিম মহিলাদের অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন ঠিক তেমনিভাবে হযরত ওমর (রা.) জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। হযরত শেফা বিনতে আব্দুল্লাহ আদুবিয়া ছিলেন আমীরুল মোমেনীনের আত্মীয়া। প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিকবার তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তার পরামর্শ হযরত ওমর (রা.) পছন্দ করতেন। হযরত সাওদা ছিলেন রসূল (স.) এর সহধর্মিনী। জ্ঞান গরিমায় তিনি ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। হাতের কাজে তিনি ছিলেন দক্ষ। চামড়ার ওপর তিনি কারুকাজ করতেন। সেই কারুকাজ করা চামড়া বিক্রি করে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। সেসব উপার্জিত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন।

ছাবেত ইবনে কয়েস ইবনে শাম্মাম (রা.) জামিলা বিনতে আবি সালামের সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হন। জামিলা হযরত ছাবেতকে পছন্দ করতেন না। রসূল (স.) জামিলাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! ছাবেতের দ্বীনদারী প্রশংসনীয়। কিন্তু তার চেহারার সৌন্দর্যহীনতার কারণে আমি তাকে পছন্দ করতে পারছি না। রসূল (স.) জামিলাকে দেয়া ছাবেতের বাগান ফেরত নিয়ে ছাবেতকে দিয়ে দিলেন। তারপর উভয়ের মধ্যে তালাকের ব্যবস্থা করলেন।

মেয়েরা বেহেশতের জামানত

ইসলামপূর্ব যুগে মেয়েদের মনে করা হতো লজ্জার কারণ। কিন্তু ইসলাম মেয়েদেরকে বেহেশতের জামানত বলে আখ্যায়িত করেছে। এ কারণে ইসলামে মেয়েদের প্রতি ভালোবাসা

প্রদর্শন এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। রসূল (স.) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের মধ্যে একজনকে দেখেছি যে, তাকে দোযখে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, এ সময় সেই লোকটির মেয়েরা তাকে জড়িয়ে ধরে। লোকটি চিৎকার করছিলো। মেয়েরা বললো, হে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা! এই লোকটি আমাদের পিতা। দুনিয়ায় আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে। তুমি তার প্রতি দয়া করো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা লোকটির প্রতি দয়া করে তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। মেয়েদের মর্যাদার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। পুত্র সন্তানের এরূপ মর্যাদা নেই।

ওলামায়ে কেরাম কোরআনের বহু রকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, নারীর মর্যাদা পরিচ্ছন্নতা, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওদের একজন বললো, হে পিতা তুমি একজন মজুর নিযুক্ত করো, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' (সূরা আল কাসাস, আয়াত ২৬)

নারীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সূরা কাসাসে আরো রয়েছে। মুসার বোন বললো, 'তোমাদেরকে আমি কি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন করবে এবং এর কল্যাণকামী হবে?' (সূরা কাসাস, আয়াত ১২)

সূরা নামল-এ সাবার রানীর ঘটনা উল্লেখ আছে। রাজকার্যের গুরুত্ব তিনি ভালোই জানতেন। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর পয়গাম পাওয়ার পর রাজ দরবারের লোকদের তিনি পরামর্শ চাইলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেই নারী বললো, হে পারিষদবর্গ, আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি কোনো ব্যাপারে তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (সূরা নামল, আয়াত ৩২)

সেই নারী আরো অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।' (সূরা নামল, আয়াত ৩৫)

পবিত্র কোরআনে মানুষ হিসেবে নারী পুরুষকে সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে। সূরা মায়েদার ৪৫ নং আয়াতে এ ব্যাপারে ইশারা রয়েছে। সূরা শূরায় নারীর প্রসঙ্গ পুরুষের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।' (সূরা শুরা, আয়াত ৪৯)

হযরত উম্মে আম্মারা আনসারী (রা.) রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন, হে রসূলুল্লাহ, কোরআনে পুরুষদের কথাই বেশী আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ কি? নারীদের কেন বঞ্চিত করা হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের পঁচিশতম আয়াত নাযিল করেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের সাথে মহিলাদের কথাও আলোচনা করেছেন।

পাশ্চাত্য সমাজে নারীর অবমাননা

পাশ্চাত্য সমাজে নারীর যে অবমাননা করা হয় তা দেখে মানুষের চোখে অশ্রুর বদলে রক্ত ঝরার অবস্থা হচ্ছে। সেখানে নারী খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। সেখানে নারীর মান-সম্মান নিরাপদ নয়, এমনকি মানুষ হিসেবেও তাদের মূল্য বিবেচিত হয় না। নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই। পোশাক এবং ঘরের সীমানায় থাকার ব্যবস্থা নেই। তথাকথিত স্বাধীনতার নামে নারী তার সবকিছু হারিয়েছে। পাশ্চাত্যের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত, বিশৃঙ্খল সমাজ এবং তাদের মিত্ররা ইসলামের সমালোচনা করছে। এক শ্রেণীর মুসলমান অকারণে তাদের সামনে নতজানু ভূমিকা পালন করছে অথচ এর কোনোই প্রয়োজন নেই। আমাদের জীবনব্যবস্থা স্বভাব ধর্মের ওপর

প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা। ওপরে উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর (রা.)-এর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের প্রসঙ্গে বড় বোন হযরত আয়শার (রা.) কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তার এ প্রতিবাদী চেতনার কথা ভেবে কোরআনের সূরা নেসার নিম্নোক্ত আয়াতের কথা আমার মনে পড়ছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা তোমাদের কাছে এলে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালুরূপে পাবে।' (সূরা নেসা, আয়াত ৬৪)

রসূল (স.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর উম্মতের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। এখনো কি চান? এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। আমি মনে করি, রসূল (স.) এখনো তাঁর প্রকৃত অনুসারী উম্মতদের জন্যে দোয়া করে থাকেন। তাঁর কবরের কাছে উচ্চস্বরে কথা বলা আদবের খেলাফ। এ বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। কিন্তু কেন? এর কারণ হচ্ছে, রসূল (স.) সব কথা শুনতে পান। আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে শুনিয়ে থাকেন।

ইমাম নববী মুসলিম শরীফের হাশিয়া অর্থাৎ টীকাভাষ্যে লিখেছেন, সালেহীন এবং পুণ্যবান লোকদের কবরের পাশে কোনো মুর্দার দাফনের জন্যে জায়গা পাওয়া সৌভাগ্য এবং বরকতের প্রমাণ। কোরআন সুন্নাহ থেকে জানা যায় যে, সালেহীন এবং মোত্তাকীদের কবরে আল্লাহর রহমত বরকত নাযিল হতে থাকে।

সাঈদ ইবনে মোসাইয়েবের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা

হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব (র.) সাইয়েদুত তাবেয়ীন অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রার (রা.) জামাতা। হাজ্জাজের মদীনা অবরোধের সময় মদীনায় আপদ নেমে এসেছিলো। মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের জন্যে কোনো নামাযী আসতে পারছিলেন না। সেই সময় হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব মসজিদে নববীতে এ'তেকাফ শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযের সময়ে রওযা মোবারক থেকে আযানের মধুর আওয়ায ভেসে আসতো। আমি উঠে তখন একামত দিয়ে নামায আদায় করতাম। মসজিদে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি থাকতো না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার আল আকীদা অল ওয়াসতিয়াহ নামক গ্রন্থে বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, আওলিয়া কেরামের কারামত এবং তাদের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

ইমাম নববী মুসলিম শরীফের চতুর্থ খন্ডের ৮৫৩ পৃষ্ঠায় রসূল (স.)-এর জোব্বা মোবারক বরকতের জন্যে পরিধান শীর্ষক হাদীসের টীকাভাষ্য লিখেছেন, আল্লাহর ওলীদের নিদর্শন থেকে তাবারক এবং তাদের মুখের লালা দিয়ে শিশুদের খাবার মাখানো জায়েয। ইমাম নববী আরো লিখেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আওলিয়াদের কারামত অস্বীকার করে না, অবশ্য মোতাযেলারা অস্বীকার করেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু তোফায়েল থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, তওয়াফের সময় রসূল (স.) হাজরে আসোয়াদে চুম্বন করতেন এবং সেই পবিত্র পাথর স্পর্শ করতেন। এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। হাজরে আসোয়াদতো একটি পাথর, কিন্তু রসূল (স.) আল্লাহর আদেশে সেই পাথর চুম্বন করেন এবং স্পর্শ করেন। মানুষের ভালো-মন্দের ক্ষেত্রে পাথর কি করতে পারে? তার ক্ষমতা কতটুকু? কিন্তু পাথরে চুম্বন করা এ কারণেই অনুসরণযোগ্য আমল যেহেতু রসূল (স.) সেই পাথরে চুম্বন করেছিলেন।

তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানীর অগ্নি পরীক্ষা

একজন তাবেয়ীর এই ঘটনাটি বড়োই ঈমান উদ্দীপক। আল্লাহ তায়ালা তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন। আসোয়াদ ইবনে কয়েস ইবনে যিলখেমার ইয়েমেনে নবুয়ত দাবী করেছিলো। তার নবুয়তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করানোর জন্যে সে বহু রকমের নির্যাতনের ব্যবস্থা করেছিলো। আবু মুসলিম খাওলানীকে সে নিজের দরবারে ডেকে নিলো এবং তাকে বললো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, হাঁ আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আসোয়াদ বললো, তুমি কি এই সাক্ষ্যও দিচ্ছো যে, আমি আল্লাহর রসূল? আবু মুসলিম খাওলানী বললেন, না। আমি এই সাক্ষ্য দিই না। আসোয়াদ বারবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো এবং আবু মুসলিম খাওলানী প্রতিবাদ করে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে ভন্ড নবী আসোয়াদ আবু মুসলিম খাওলানীকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। কিন্তু আগুনের কুন্ড থেকে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসেন। ভন্ড নবী আসোয়াদের সঙ্গীরা তাকে পরামর্শ দিলো যে, এই লোকটিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হোক,অন্যথা সে আমাদের জন্যে বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে। আবু মুসলিম খাওলানী মদীনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হলেন। সেই সময়েই রসূল (স.) ওফাতপ্রাপ্ত হন। আবু মুসলিম মদীনায় পৌঁছে জানতে পারেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে মুসলমানরা বাইয়াত করেছেন। আবু মুসলিম মসজিদের দরোজায় উট বসিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন, তারপর মসজিদের একটি খুঁটির পাশে বসে নামায আদায় করতে লাগলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আবু মুসলিম বললেন, আমি ইয়েমেন থেকে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো সেই লোকটির কি অবস্থা হয়েছে যাকে ভন্ডনবী আসোয়াদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলো? আবু মুসলিম বললেন, আল্লাহর সেই বান্দা ভালো আছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার ধারণা তুমি কি সেই ব্যক্তি নও? আবু মুসলিম বললেন, জ্বী হ্যাঁ আমিই সেই ব্যক্তি।

হযরত ওমর (রা.) আবেগে আনন্দে আবু মুসলিমকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। তার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারপর তাকে সাথে নিয়ে খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মাঝখানে তাবেয়ী আবু মুসলিম বসেছিলেন। উপস্থিত সাহাবারা তাকে শ্রদ্ধাভরে দেখছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন, সেই মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার জীবদ্দশায় সেই ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যার দ্বারা সাইয়্যেদেনা ইবরাহীমের সুন্নত যিন্দা হয়েছে।

দাবী করে আল্লাহর ওলী হওয়া যায় না

সাহাবায়ে কেরাম এবং সালেহীনদের বহু অলৌকিক ঘটনা বা কারামতের আলোচনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আসাদুল গাবা, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তারিখে ইবনে কাসির প্রভৃতি গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। মোজেযা আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে এবং কারামত আওলিয়াদের সাথে সম্পৃক্ত। মনে রাখতে হবে যে, দাবী করে কেউ আল্লাহর ওলী হতে পারে না। আওলিয়া তারাই হতে পারেন যারা কোরআন সুন্নাহর অনুসারী এবং আল্লাহর আদেশে নিজের সবকিছু কোরবানী করে দেয়।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। মানুষ ক্ষুধায় মারা যেতে থাকে। হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাসের (রা.) হাত ধরে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আমরা তোমার নবীর জীবদ্দশায় তাকে ওছিলা দিয়ে দোয়া করতাম। আমি নবীর চাচাকে ওছিলা করে তোমার কাছে দোয়া করছি। আমাদের ওপর যে বিপদ এসে পড়েছে তুমি এই বিপদ দূর করে দাও, তুমি আমাদের জন্যে বৃষ্টি বর্ষণ করো।

হযরত এমরান ইবনে হোসায়েন (রা.) বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি পথ চলার সময় ফেরেশতারা তার সাথে মোসাহাফা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হযরত আলা ইবনে হাজরামির (রা.) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দীর্ঘ সফরে তিনি মদীনায় আসছিলেন। দাহনা নামক মরু প্রান্তরে পৌছার পর পানি শেষ হয়ে গেলো। হযরত আলা ইবনে হাজরামি আল্লাহর কাছে দোয়া করার পর মরু বালুকার নীচ থেকে পানি বেরিয়ে এলো। তিনি এবং তার সফরসঙ্গীরা সেই পানি পান করলেন। কাফেলা গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একজনের মনে পড়লো যে, তিনি একটি জিনিস ভুলে রেখে এসেছেন। পুনরায় তিনি ফিরে গেলেন পূর্বের অবস্থানে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর পানির কোনো চিহ্নও দেখা গেলো না।

আওলিয়ায়ে কেরাম এবং সালেহীনদের সাথে সম্পর্ক তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। তাওহীদ হচ্ছে সবকিছুর মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যেখানে না থাকে সেখানে সবকিছু বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কোনো রকম বিভ্রান্তি বা বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই। কারণ মনে রাখতে হবে বাড়াবাড়ির পরিণামে প্রভূত ক্ষতি ডেকে আনে।

আওলিয়াদের পরিচয়

আল্লাহর ওলী কারা? তারাই আল্লাহর ওলী যারা আল্লাহর হক পুরোপুরি চেনে এবং আদায় করে। দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে যারা অবহিত এবং সেইসব মূলনীতি যারা অনুসরণ করে। যারা রসূল (স.)-এর উম্মতের জন্যে নির্ধারিত হক সম্পর্কে জানে এবং পুরোপুরি আদায় করে। আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর হকের পাশাপাশি যারা 'হুকুকুল এবাদ' বা বান্দার অধিকার এবং নিজের ওপর অর্পিত হক আদায় করে। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ অলসতার পরিচয় দেয় না। যার মধ্যে এসব বিষয়ে অলসতা এবং অপূর্ণতা পাওয়া যায় তাকে কিছুতেই আল্লাহর ওলী বলা যাবে না। প্রচলিত নিয়মে নামকাওয়াস্তে এবাদাত করে কারো পক্ষে ওলী হওয়া সম্ভব নয়। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কথায়, সকল কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর রেযামন্দি যাদের কাম্য তারাই আল্লাহর ওলী হতে পারেন। উপরোক্ত বিষয়সমূহে যার মধ্যে ত্রুটি পাওয়া যায় তিনি কিভাবে আল্লাহর ওলী হতে পারেন? রসূল (স.) একটি হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, 'নফল এবাদাতের মাধ্যমে বান্দা আমার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। একপর্যায়ে তারা আমার প্রিয়জনে পরিণত হয়। আমার প্রিয়জনে পরিণত হওয়ার পর আমি তার কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যে চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে চলাচল করে।' এবার আপনারাই বলুন, যে বান্দা এই হাদীসে কুদসীর আলোকে নিজেকে তৈরি করে নেয় তার থেকে অলৌকিকতা বা কারামত প্রকাশ পাওয়া কি বিস্ময়কর ব্যাপার হতে পারে?

সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন রসূল (স.)-কে বলা হয়েছিলো, আল্লাহর ওলী কে? তিনি বলেছিলেন, যাদের দেখে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।

কোনো কোনো আলেমের মতে যেসব মসজিদের পাশে মানুষের কবর রয়েছে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেসব মসজিদে যাওয়া গুনাহ। প্রিয় রসূল (স.) তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এসব মসজিদ হচ্ছে, মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী। কোনো কোনো ওলামা এই হাদীস দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, উক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই অভিমত আলেমদের সর্বসম্মত অভিমত নয়। উপরোক্ত তিনটি মসজিদের ওপর অন্য কোনো মসজিদকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়, কিন্তু অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে যাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, উপরোক্ত

তিনটি মসজিদের চেয়ে অন্য কোনো মসজিদকে কোনো মুসলমান কিছুতেই অধিক মর্যাদা দিতে পারে না। কাজেই আমি মনে করি, চরম মনোভাব সব ক্ষেত্রেই পরিহার করা সমীচীন।

হযরত ওমর (রা.)-এর আন্তরিকতার প্রকাশ

হযরত ওমর (রা.) মানুষের প্রতি সেবা ও ভালোবাসা প্রকাশে ছিলেন উদারমনা। তিনি পরিচিত সকলের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁর মজলিসে উপস্থিত লোকদের প্রতি তিনি মনোযোগী থাকতেন, অনুপস্থিত লোকদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যেতেন। সিরিয়ার একজন বীর যোদ্ধা প্রায়ই হযরত ওমর (রা.)-এর মজলিসে উপস্থিত হতেন। একবার বেশ কিছুদিন তিনি অনুপস্থিত থাকলে হযরত ওমর (রা.) খবর নিয়ে জানতে পেলেন লোকটি মদের নেশায় সব সময় জড়িয়ে থাকে। হযরত ওমর (রা.) কাতেবকে ডেকে লোকটির উদ্দেশ্যে এ চিঠি লেখালেন–পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের নামে। তোমার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কেতাব। এই কেতাব সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যে আল্লাহ তায়ালা অনেক শক্তিশালী এবং যিনি সবকিছু জানেন। তিনি পাপ মার্জনা করেন এবং তওবা কবুল করেন। তিনি কঠিন সাজা দেন, আবার বিশেষভাবে ক্ষমাও করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। এ চিঠি লেখার পর চিঠিখানি সীলমোহর লাগিয়ে সেই ব্যক্তির কাছে পাঠানো হলো। হযরত ওমর (রা.) পত্রবাহককে বলে দিলেন, লোকটি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন এই চিঠি তার হাতে দিয়ো। তারপর উপস্থিত সবাইকে নিয়ে হযরত ওমর (রা.) লোকটির জন্যে দোয়া করলেন।

চিঠি পাঠের পর লোকটির মধ্যে ভাবান্তর হলো। তিনি কেঁপে উঠলেন। বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করার ওয়াদা করেছেন এবং আমাকে তাঁর আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। বার বার তিনি একথা বলতে লাগলেন এবং ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেন। সাথে সাথে মদ ত্যাগ করার জন্যে খাঁটিমনে তওবা করলেন। হযরত ওমর (রা.) এই খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, তোমার কোনো ভাইয়ের পদস্খলন লক্ষ্য করলে তার সাহায্যে এগিয়ে যাও। তাকে নেকীর পথে দাওয়াত দাও। শয়তানের কবলে পতিত হতে দেখে তাকে আরো খারাপ করার জন্যে শয়তানকে সাহায্য করো না।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন দয়ালু পিতা এবং সহানুভূতিশীল অভিভাবক

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন দয়ালু পিতা এবং সহানুভূতিশীল অভিভাবক। তিনি জানতেন যে, প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসার আলাদা পদ্ধতি রয়েছে। একটি ওষুধ একজনের জন্যে কল্যাণকর হলেও অন্যজনের জন্যে নাও হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির দাওয়াই হতে হবে তার অসুখের অবস্থা অনুযায়ী। ওষুধের পাশাপাশি সহানুভূতি এবং সমবেদনা যথেষ্ট সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়। তার একজন দ্বীনী ভাইকে পথভ্রষ্ট হতে দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হননি। তিনি পুলিশ পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে শরীয়তসম্মত সাজাও দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা ছিলো সেই ব্যক্তির জন্যে বেশী কল্যাণকর।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা একে অন্যের প্রতি উদাসীন। সঙ্গীর প্রতি সঙ্গীর দরদ নেই। ভাইয়ের জন্যে ভাইয়ের চিন্তা নেই। নিত্য যার সাথে দেখা হতো তার হঠাৎ উধাও অবস্থা আমাদের বিচলিত করে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিভোর। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ও ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত। ফলে সৌহার্দ এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

হযরত ওমর (রা.) শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই খবর নিতেন না বরং দুঃস্থ-দুর্গত লোকদেরও খবর নিতেন। এমনকি ছোটদের প্রতিও তার ছিলো তীক্ষ্ম দৃষ্টি। সব সময় মসজিদে নামাযে উপস্থিত থাকতো এমন একটি বালককে কয়েকদিন না দেখে হযরত ওমর (রা.) বিশেষ চিন্তিত হলেন। জিজ্ঞেস করেও কারো কাছে খবর না পেয়ে অবশেষে তিনি বালকের বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীতেও তাকে পাওয়া গেলো না। বালকের মা জানালো, সে কিছু খাবার জিনিস বিক্রি করার জন্যে বাজারে গেছে। হযরত ওমর (রা.) বাজারে গিয়ে ছেলেটির সাথে কথা বললেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য বিক্রির চেয়ে উট, গাভী, বকরি পালন অধিক লাভজনক বলে ছেলেটিকে পরামর্শ দিলেন।

বর্তমান কালের শাসকদের কাছে এটা আমরা আশা করি না যে, তারা হযরত ওমর (রা.)-এর মতো আদর্শ পেশ করবেন। তবে শাসকদের উচিত নিজেদের আশপাশে এমন লোকদের অবস্থান নিশ্চিত করা, যারা জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। যারা জনসেবাকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করবে। জনগণ যদি এটা বুঝে যে, শাসক তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তবে তারা শাসনকাজে শাসক কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে, তাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে ও ভালোবাসবে।

শিল্প বাণিজ্য ও হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) ব্যবসা বাণিজ্যের মূলনীতি প্রণয়ন করেন। মজুদদারী, কালোবাজারি, ফটকাবাজি, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদি সব রকমের চরিত্রহীন কার্যকলাপ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যকে তিনি পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করেন। সততা, ন্যায়নীতি এবং আমানতদারীর ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে কোনো সরকারী লাইসেন্স পারমিট দেয়া হতো না। তবে পাইকারী ব্যবসায়ী এবং বড় বড় মহাজনদের ব্যবসার জন্যে তিনি শর্তারোপ করেছিলেন যে, ইসলামী শরীয়তের ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা সম্পর্কে যারা পুরোপুরি অভিজ্ঞ তারাই ব্যবসা করার অনুমতি পাবে। যারা এসব নীতিমালা জানবে না তাদেরকে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হবে না।

বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত ওমর (রা.) সবদিকে লক্ষ্য রাখতেন। একবার এক দুধ বিক্রেতার দুধে পানির মিশ্রণ রয়েছে এরূপ সন্দেহ হওয়ায় তিনি সব দুধ নর্দমায় ফেলে দেন এবং দুধে পানি না মেশানোর জন্যে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাণিজ্যের বিকাশ সাধনের জন্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেউ যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকেও নযর রাখা হয়। আমদানিরফতানি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কি হয়ে থাকে? সেটা অবশ্য আলোচনার ভিন্ন প্রসঙ্গ। হযরত ওমর (রা.) প্রত্যেক বাজারে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বাজারের তত্ত্বাবধায়করা শহরের একজন প্রধান কর্মকর্তার কাছে জবাবদিহি করতেন। শুধুমাত্র বাজার বিষয়ক উক্ত কর্মকর্তা প্রধান তত্ত্বাবধায়ক-এর দায়িত্ব পালন করতেন। বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সব রকম কাজ এরা সম্পন্ন করতেন। হযরত সোলায়মান ইবনে জাশমা (রা.) ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বাজার ব্যবস্থাপক। মদীনার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দুইজন। এরা ছিলেন ছায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রা.)।

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি অভিজাত পেশা। রসূল (স.) নিজে ব্যবসা করেছেন। হাদীসের বক্তব্য মতে সৎ, আমানতদার, নীতিপরায়ণ ও তাকওয়াসম্পন্ন ব্যবসায়ী আম্বিয়া এবং সিদ্দিকীনদের সাথে থাকবে। ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা সম্পর্কে হাদীসে বহু আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্য হচ্ছে একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মানুষের জন্যে সহজলভ্য করার ব্যবস্থা অন্যদিকে এবাদাত।

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক শহর থেকে খাদ্যশস্য অন্য শহরে পৌঁছায় এবং ন্যায্য মূল্যে জনগণের কাছে বিক্রি করে সে আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ অথচ এখলাছের উত্তম নমুনা। মানব জাতির জন্যে তিনি এমন সফল খেলাফত ব্যবস্থা রেখে গেছেন যা মানবতার জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। তার উদ্ভাবিত ব্যবস্থা সকল যুগ, সকল কালের জন্যে প্রযোজ্য। যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আরোপ করা হতো না। অন্যদিকে নির্বোধ সহজ সরল নাগরিকদের অসহায় বান্ধবহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হতো না। এসব ব্যবস্থায় তথাকথিত উন্নত জাতিসমূহের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার প্রতিষেধক যেমন রয়েছে তেমনি পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নতি-অগ্রগতির পথনির্দেশ রয়েছে। ভারসাম্যপূর্ণ এ জীবনপদ্ধতি মানব স্বভাবের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা.) এবং বিচার বিভাগ

যে কোনো সরকারের মানসিকতা, দূরদর্শিতা যাচাই করার জন্যে এবং সমাজের প্রকৃত চিত্র জানার জন্যে সেই সরকারের বিচার বিভাগের প্রতি নযর দেয়াই যথেষ্ট। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতো। বিচারক বা কাযী তাকওয়াসম্পন্ন আল্লাহভীরু এবং নিজ কাজে যোগ্যতাসম্পন্ন হতেন। কাযীরা স্বাধীন ছিলেন এবং তাদের বিচারকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিচার বিভাগের ওপর প্রশাসনের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিচার বিভাগকে বিশেষ কোনো নির্দেশ দেয়া হতো না। কোরআন এবং সুন্নাহর আইন বিদ্যমান ছিলো। কাযী সেই আইন অনুযায়ী বিচার কাজ সমাধা করতেন। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বাধীন একটি জাতির জনগণের জন্যে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এটাই যে, সেই জাতির মধ্যে আইনের শাসন সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা করা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের সমুন্নতকরণ

বিচারক নিয়োগের সময় হযরত ওমর (রা.) কাযীদের যোগ্যতাই শুধু দেখতেন না বরং আদালতের মর্যাদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতেন। মাঝে মাঝেই বক্তৃতায় এবং চিঠিতে এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতেন। আদালত সম্পর্কে হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে (রা.) হযরত ওমর (রা.) যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি এখনো পর্যন্ত আদালতের মর্যাদা সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আদালতের অর্থাৎ বিচারালয়ের পরিচ্ছন্নতা হযরত ওমর (রা.) নিজের ব্যক্তিজীবনের উদাহরণ দ্বারা নিশ্চিত করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি একাধিকবার আদালতে হাযির হয়েছেন এবং আদালতের রায় বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.)-এর বিবেচনায় আদালতের নির্দেশ মান্য করা ছিলো ওয়াজেব। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রপ্রধানসহ কেউই আইনের উর্ধে নয়। আইন সবার জন্যেই সমান। হযরত ওমর (রা.) তখন আমীরুল মোমেনীন। মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। সেই সময়ে একটি খেজুরের বাগানের মালিকানা নিয়ে তার সাথে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর ঝগড়া হলো। হযরত কাব (রা.) দাবী করছিলেন যে, বাগানটি তার। অবশেষে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালো। আদালতে কাযী দাবীর সপক্ষে প্রমাণ চাইলেন। হযরত কাব (রা.) বাগানের মালিকানার পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারলেন না। বিচারক তখন হযরত ওমরকে (রা.) বললেন, বাগানটি যে তার এ সম্পর্কে তাকে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে হবে। হযরত ওমর (রা.) কসম করলেন। ফলে বিচারক হযরত ওমর (রা.)-এর পক্ষে রায় দিলেন। আদালত থেকে বেরিয়ে হযরত ওমর (রা.) বাগানটি হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর নামে হেবা করে দিলেন। হযরত ওমরকে (রা.) জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি

কেন বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াতে দিলেন? আদালতে যাওয়ার আগেই তো হযরত উবাই (রা.)-কে হেবা করে দিতে পারতেন। হযরত ওমর (রা.) জবাবে বললেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, মানুষ নিজের অধিকার এবং আদালতের ক্ষমতা সম্পর্কে যেন ধারণা লাভ করতে পারে।

বিচারকদের মর্যাদা এবং বিচার কার্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ইসলামের মূলনীতি। ফায়সালা বা বিচার করার সময় কাযী শুধু আল্লাহকে ভয় করবেন। হযরত ওমর (রা.) প্রায়ই লোকদের বলতেন, তার ওপর কারো প্রতিশোধ নেয়ার থাকলে সে যেন নিয়ে নেয়। তিনি বাদী এবং বিবাদী উভয় অবস্থায়ই একাধিকবার আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কাযীদের সত্যনিষ্ঠ ন্যায়ানুগ নির্ভীক বিচারের প্রশংসা করতেন। তার বিরুদ্ধে রায় দেয়া হলেও হযরত ওমর (রা.) বিচারকদের প্রশংসা করতেন।

কাযী শোরাইহ-এর বক্তৃতা

একবার হযরত ওমর (রা.) একজন বেদুইনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া কিনতে চাইলেন। ঘোড়া পছন্দ করার জন্যে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলেন। ঘোড়া আছাড় খেয়ে পড়ে খোঁড়া হয়ে গেলো। হযরত ওমর (রা.) বেদুইনকে বললেন, নিয়ে যাও, এ ঘোড়া আমি ক্রয় করবো না। বেদুইন বললো, জ্বীনা, এ ঘোড়া আমি ফেরত নেবো না। আপনাকে এটি কিনতেই হবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এসো আমরা কাউকে এ সম্পর্কে সালিশ মানি। বেদুইন রাযি হলো। সে বললো, ঠিক আছে শোরাইহ ফয়সালা করুক। শোরাইহ সব বিবরণ শুনে বললেন, আমীরুল মোমেনীন, আপনাকে ঘোড়া কিনতে হবে। যদি না কেনেন তবে বেদুইনের কাছ থেকে যেভাবে ঘোড়াটি নিয়েছেন সেভাবে সেরূপ অবিকৃত অবস্থায় তার ঘোড়া তাকে ফেরত দিতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) শোরাইহর বিচার শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, একেই বলে ন্যায়বিচার। এ ঘটনার পর হযরত ওমর (রা.) শোরাইহকে কাযী নিযুক্ত করলেন। কাযী শোরাইহ হযরত ওমর (রা.) এবং পরবর্তী খলীফাদের শাসনামলে দীর্ঘদিন (কাযীউল কোযাত) বা প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে কাযী শোরাইহ এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছেন।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয়

১. রাষ্ট্রের একজন সাধারণ মানুষের সাহসিকতা উপরোক্ত ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ একজন বেদুইন খলীফার কথা মানতে অস্বীকার করেছে। খলীফার পদমর্যাদা সম্পর্কে সে জানতো। তবে উদ্ধতভাবে নয়, নম্রভাবে সে খলীফার সাথে কথা বলেছে। সত্যের মহিমা উজ্জ্বল। সত্য সবকিছুর উর্ধে। আইন যদি তার নিজস্ব নিয়মে ও নিজস্ব গতিতে চলে, সত্য ও ন্যায় যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সেটা আমীরুল মোমেনীনেরই বিজয়। একজন সাধারণ মানুষও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে নিতে পারে। বিচারক ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেবেন না, বরং তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইনের শাসন কায়েম করবেন।

২. খলীফার সত্যনিষ্ঠা এবং আল্লাহভীতি। হযরত ওমর (রা.) নিজের শক্তি প্রদর্শন করেননি। প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভেবে জোর করে তার মুখ বন্ধ করে দিতে চাননি। তিনি তৃতীয় একজনের সালিশী মেনে নিয়েছেন এবং ন্যায় ও ইনসাফের জীবন্ত প্রমাণ পেশ করেছেন।

পাশ্চাত্যের কাছে মন মগজ বিক্রি করে দেয়া আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনাদর্শ এবং ইসলামের নীতিমালার মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পান না। ফলে তারা পাশ্চাত্য সমাজের কৃত্রিম উদাহরণসমূহ পেশ করেন।

৩. যাকে সালিশ মানা হয়েছিলো তার ছিলো সাহসিকতা, দূরদর্শিতা এবং ন্যায়নীতি। শোরাইহ ন্যায়বিচার করেছিলেন এবং কারো প্রতি কোনো অবিচার করেননি। যা সত্য, যা বাস্তব, সেটাই ছিলো প্রত্যাশিত। শোরাইহ সেই প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে তার নির্ভীক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্ষমতাসীন খলীফা কি মনে করবেন, তাকে খুশী করা দরকার এসব তিনি একবারও চিন্তা করেননি। একজন বিচারকের দায়িত্ব তিনিই পেতে পারেন যার মধ্যে সত্য, ন্যায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকে। কাযী বা বিচারকও ভুল করতে পারেন। কেননা ভুল হয় না একমাত্র আল্লাহর। কাযী যদি জ্ঞানী হন, প্রজ্ঞার অধিকারী হন, আল্লাহভীরু হন তবে তার বিচার কাজে সেই গুণাবলীর প্রকাশ অবশ্যই ঘটবে। যদি উদ্দেশ্য মহৎ থাকে, কাযীর মনে আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকে, তবে বিচারের রায়ে ভুল করলেও পুণ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না।

৪. বিচারের রায় বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া। যার বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে তিনি ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বিচারের রায় তিনি খুশী মনে মেনে নিয়েছেন এবং বিচারকের প্রজ্ঞা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করেছেন। এই উদাহরণ বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি মযবুত করেছে এবং বিচারকের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছে। শাসনকর্তা তো একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান, কিন্তু তার শাসনের কথা, তার গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের কথা সবই লিখিত থাকে। ইতিহাস অত্যাচারী শাসক এবং স্বেচ্ছাচারী বিচারকদের ধিক্কার দেয়। পক্ষান্তরে ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ শাসক এবং ন্যায়বিচারক মৃত্যুর বহুকাল পরও স্মরণীয় হয়ে থাকেন। মানুষ তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

৫. প্রশিক্ষণের বাস্তব উদাহরণ। আমার ধারণা বেদুইনের ঘোড়ার বিষয়ে ন্যায়বিচার কি হতে পারে এটা হযরত ওমর (রা.) আগেই জানতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত ওমর (রা.) কাযীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বিচারক হিসেবে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও সবার প্রশংসাধন্য। মানুষকে ন্যায়বিচারের নমুনা দেখানোর জন্যেই তিনি বিষয়টি তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে মীমাংসার প্রস্তাব দেন।

এ আলোচনা শেষ করার আগে আমি আরো কিছু কথা বলতে চাই। ইসলাম শুধু ন্যায়বিচারের নির্দেশই প্রদান করেনি বরং বিচার কাজ দ্রুত সমাধা করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছে। বর্তমানকালে দেখা যায় সব রকমের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিচার কাজে বিস্ময়কর রকমের বিলম্ব করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে সম্মানিত বিচারকরা মোকদ্দমা ঝুলিয়ে রাখতেন না। বিচার কাজে অহেতুক দীর্ঘমেয়াদী বিলম্ব বিচার না করার চিন্তার শামিল। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামারিশি বিখ্যাত কাযী ছিলেন। তার বিচার ফয়সালা উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হতো। তিনি মার্ভ শহরে বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন। তিনি সাক্ষী গ্রহণের আগে সাক্ষীদের শপথ করাতেন। বহুবার তিনি বাদী বিবাদীর বক্তব্য শুনে বাজারে বিচার করেছেন। কখনো কখনো কোনো পথের মোড়ে বিচার বসতো এবং তিনি সেখানে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায় দিতেন। গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে কাযী সাহেব হয়তো কোথাও যাচ্ছেন এমন সময় বাদী বিবাদী হাযির হতো। কাযী সাহেব উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর নিখুঁত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতেন।

অমুসলিমদের সাথে বিয়ে প্রসঙ্গ

সজীব এবং জাগ্রত বিবেকসম্পন্ন কোনো জাতি অন্য জাতির মধ্যে বিয়ে করতে পারে না। জাতির কোনো মানুষ নিজে তো এরূপ করেই না অন্যকেও করার অনুমতি দেয় না। যাদের সাথে আমাদের আদর্শিক পার্থক্য বিদ্যমান তাদের মেয়েরা আমাদের ঘরে এলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবেই। এ কারণেই সচেতন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি জনগণের ওপর বিশেষত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অন্যত্র বিয়ে করার অনুমতি দেয় না।

স্ত্রী হচ্ছে ঘরের রাণী। ঘরের কোথায় কি আছে সবই তার জানা। স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো কিছু আপনি যদি গোপন করে রাখতে চান তবে জেনে রাখুন, তা পারবেন না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক হযরত ওমর (রা.) এ বিষয়টি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ কারণে সঙ্গী-সাথীদের তিনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন। সকল মুসলমান শাসকের জন্যে হযরত ওমরের এই উদাহরণ অনুসরণযোগ্য।

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) এক ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করেন। হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) এক ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করেন। এ খবর শুনে হযরত ওমর (রা.) অসন্তুষ্ট হলেন। আমীরুল মোমেনীনের অসন্তুষ্টির খবর শুনে উক্ত দু'জন বিশিষ্ট সাহাবা তার সাথে দেখা করলেন। তারপর বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিচ্ছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওদের তালাক দেয়াও বৈধ, বিয়ে করাও বৈধ, কিন্তু যেহেতু আমরা ইসলামের অনুসারী এ কারণে আমরা চাই না যে, আমাদের ঘরে কোনো অমুসলিম নারী আসুক।

ইসলাম ইহুদী এবং খৃষ্টান মহিলাদের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করেনি, কিন্তু হযরত ওমর (রা.) অনুভব করেছিলেন যে, যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হওয়ার পর ইহুদী, খৃষ্টানরা মুসলমানদের অন্দরমহলে প্রবেশ করার ফন্দি-ফিকির করছে। উপরোক্ত দুজন সাহাবা ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাদের ঘরে অমুসলিম স্ত্রীর বিদ্যমানতা ইসলামী খেলাফতের শান্তি ও স্থিতিশীলতা পরিপন্থী। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) উল্লেখিত দু'জন সাহাবার বিয়ে বন্ধন থেকে অমুসলিম স্ত্রীদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এতে অন্য মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ইহুদী এবং খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করার অবৈধতা ঘোষিত হয়নি, তবে এ ধরনের বিয়ে আবশ্যকও বলা হয়নি। তবে দায়িত্বশীল সরকার প্রধানকে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত হোযায়ফা (রা.) সিরিয়ায় এক ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে চিঠি লিখলেন সেই মহিলাকে যেন তালাক দেয়া হয়। হযরত হোযায়ফা (রা.) চিঠি লিখে এ মর্মে ব্যাখ্যা চাইলেন যে, আমীরুল মোমেনীন এই বিয়ে অবৈধ মনে করেন কি না। আমীরুল মোমেনীন জবাবে জানালেন, অবৈধ নয় তবে আমি আশংকা করছি দুষ্কৃতকারিনী মহিলারা তোমাদেরকে ফাঁদে না ফেলে।

সেই কবেকার কথা। হযরত ওমর (রা.) কতো দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অমুসলিম মহিলারা মুসলমানদের ঘরে এসে কতো রকমের ফেতনা-ফাসাদ তৈরি করে। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তো বিবেচ্য হতে পারে না। ওসব মহিলা ইসলামকে পছন্দ করে না বরং নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসকে পছন্দ করে এবং প্রাধান্য দেয়। এমতাবস্থায় অমুসলিম মেয়ে বা মহিলাদের বিয়ে করার যে অনুমতি ইসলাম দিয়েছে সেটা বিশেষ অবস্থায় বিবেচনায় দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সেই আচরণ থেকে দূরে থাকাই ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর। তাছাড়া অমুসলিম ইহুদী এবং খৃষ্টান মেয়েদের রূপসৌন্দর্যের কারণে মুসলমানরা যদি ঢালাওভাবে ওসব মেয়ে বিয়ে করে তাহলে মুসলমান মেয়েরা কোথায় যাবে?

আমরা সবাই ভালোভাবে জানি যে, শিশুরা পিতার চেয়ে মায়ের সংস্পর্শে বেশী সময় কাটায়। মায়ের চিন্তায় পছন্দ-অপছন্দে শিশুরা অধিক প্রভাবিত হয়। যে মা আমাদের ধর্মবিশ্বাস এবং দেশের চেয়ে অন্য ধর্ম এবং অন্য দেশকে বেশী ভালোবাসে তার সন্তান মাকেই অনুসরণ করবে। এটাই স্বাভবিক। সন্তান মায়ের পদাংক অনুসরণ করেই জীবনযাপন করবে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে, তবে সেটা খুব কম। হযরত ওমর (রা.) এসব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি উক্ত দুই সাহাবকে বলেছিলেন, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন।

ইসলাম ও ক্রীতদাসত্ব

ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কে ইসলামের শত্রুরা সবচেয়ে বেশী প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে। চিন্তাভাবনা ছাড়া এ ধরনের অপবাদ বড়োই বিস্ময়কর। ইসলামের দোষ এভাবে যারা খুঁজে বেড়ায় তারা নিজেরাই নানা দোষে দোষী। ক্রীতদাসত্ব বা গোলামী ইসলামের আবিষ্কার নয়। ইসলাম প্রচারের আগে এবং পরে ক্রীতদাসত্ব অমুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। ইসলামই সুকৌশলে ক্রীতদাসত্বের অবসান ঘটিয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে রসূল (স.)-ই সর্বপ্রথম ক্রীতদাসদের অধিকার নির্ধারণ করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবের আগে ক্রীতদাসদের অধিকারের চিন্তাও ছিলো হাস্যকর। ক্রীতদাসত্ব এবং তাদের অধিকার ছিলো দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়। আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, ইসলাম ক্রীতদাসদের যে অধিকার দিয়েছে তথাকথিত সভ্য জাতির স্বাধীন নাগরিকরাও সে অধিকার অর্জন করতে পারেনি। রোম সভ্যতার ওপর পাশ্চাত্যের অনেক গর্ব, অনেক অহংকার। কিন্তু রোমক সমাজে ক্রীতদাসদের সাথে যে ব্যবহার করা হতো সে সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখনো সেখানে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের দুরবস্থার কথা কে না জানে?

ইউরোপে ক্রীতদাসদের অবস্থা

রোমে লাখ লাখ নারী পুরুষ দাসত্বের শৃংখলে ছিলো আবদ্ধ। তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হতো? যার মনে সামান্য মানবতা রয়েছে সেও ওরকম ব্যবহারের কথা শুনে শিহরিত হয়ে উঠতো। মনিব আইনের এবং নৈতিকতার বিচারের এমন অধিকার পেয়েছিলো যে, যখন ইচ্ছে হতো তখনই যে কোনো দাস বা দাসীকে হত্যা করতে পারতো। এটা কোনোরকম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো না। ইসলাম এ অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছে। পাশ্চাত্যের আইন মনিবকে যথেষ্ট অধিকার দিয়েছিলো যে, মনিব দাস-দাসীকে ইচ্ছে অনুযায়ী নির্যাতন করতে পারবে। ইসলাম এ বর্বর আচরণ বন্ধ করেছে।

রোমক সভ্যতার কতো যে প্রশংসা করা হয়। অথচ সেই সভ্যতার আইন মনিবকে ঢালাও অধিকার দিয়ে রেখেছিলো যে, মনিব ক্রীতদাসদের কাঁধে বহন করা পালকিতে সফর করতে পারবে এবং তাদের চাবুক দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করতে পারবে। রোমের আইনে মনীবের সওয়ারী পশুর সামনে ক্রীতদাসদের দৌড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সেখানে ক্রীতদাসদের জুতো পরিধানের অধিকার ছিলো না। তারা খালি পায়ে মনীবের সওয়ারী পশুর আগে আগে দৌড়াতো। ইসলাম এসব যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, মনিব যদি ক্রীতদাসকে শাস্তি বা কষ্ট দেয় তবে সেই শাস্তির কাফ্ফারা হচ্ছে ক্রীতদাসকে মুক্তি দেয়া। একটি আইন ক্রীতদাসদের দেয় স্বাধীনতা, অন্য আইন অর্থাৎ পাশ্চাত্য আইনে ক্রীতদাসদের নির্যাতনে আনন্দ উৎসব পালন করে। ক্রীতদাসদের মৃত্যুতে আনন্দ নৃত্য করে। উভয় আইনের মধ্যে পার্থক্য কতো সুস্পষ্ট।

রোমে ক্রীতদাসদের শেকলের সাহায্যে পরস্পরের সাথে বেঁধে রাখা হতো। তাদের যে খাবার দেয়া হতো সেই খাবার ছিলো পশুদের খাবারের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের। নোংরা দুর্গন্ধময় পানি ছিলো তাদের পান করার জন্যে নির্ধারিত। ক্রীতদাসদের শাস্তি দেয়া ছিলো মনিবদের কাছে শিল্প চর্চার শামিল। অকারণে ক্রীতদাসদের গলা টিপে হত্যা করা বা ফাঁসী দিয়ে মেরে ফেলা ছিলো সভ্যতার দাবীদারদের দৈনন্দিন কাজ। ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর সামনে ক্রীতদাসদের ছুঁড়ে দেয়া হতো। ওসব জন্তু ক্রীতদাসদের দেহ ছিঁড়ে ফেড়ে খেয়ে ফেলতো। এসব কিছু সভ্য মনিবদের বিনোদন এবং ক্রীড়াকৌতুকের রসদ যোগাতো। বন্য জন্তুদের পদতলে ক্রীতদাসদের দেহ পিষ্ট এবং ছিন্নভিন্ন হতে দেখে মনিবরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। রোমক সাম্রাজ্যের স্পার্টা দ্বীপের কুখ্যাত ক্রীতদাস

স্কোয়ারের কথা সম্ভবত আপনারা শুনেছেন। সেখানে অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত করে ক্রীতদাসদের হত্যা করা হতো। এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সেখানে ক্রীতদাসদের ফাঁসীতে মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হতো। এ ধরনের বর্বরতার কথা জেনেও তথাকথিত সভ্যতার ধ্বজাধারীদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। তাদের বিবেকে কোনো আঁচড় লাগে না। ইসলামের বিধানের সাথে এ ধরনের বর্বর আচরণের তুলনা করুন। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে মনিব যা খাবে ক্রীতদাসকেও তাই খেতে দিতে হবে। মনিব যে পোশাক পরিধান করবে ক্রীতদাসকেও সেই পোশাক পরিধান করতে দিতে হবে। মনিব যেভাবে আরামে ঘুমাবে ক্রীতদাসকেও সেভাবে ঘুমাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ইসলাম এমনিভাবে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

ইসলাম ক্রীতদাসত্বের শিকল কেটেছে

রোমে কোনো ক্রীতদাসের মুক্তির ঘটনা ছিলো বিস্ময়কর ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা ছিলো রীতিমতো অপ্রত্যাশিত। মুক্ত হওয়ার ঘটনা কালেভদ্রে ঘটলেও মুক্ত স্বাধীন ক্রীতদাস নিজের ইচ্ছে মতো কোনো কাজ করতে পারতো না এবং নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারতো না। নামমাত্র স্বাধীনতার পরও ক্রীতদাসকে মনিবের ইচ্ছার ক্রীড়নক হয়ে জীবন কাটাতে হতো অথচ ইসলাম ক্রীতদাসকে পদে পদে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মুক্ত হওয়ার পর ইসলামে ক্রীতদাসের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাক্তন মনিবের সমান অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করতে পারতো। মনিবের পরিবারে বিয়েশাদীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতো। কোরআনের তাফসীর এলমে হাদীস এবং ফেকাহ শাস্ত্রে বহু প্রাক্তন ক্রীতদাসের মহত্বপূর্ণ নাম দেখতে পাওয়া যায়। তাদের দেয়া ফতোয়া সমগ্র মুসলিম মিল্লাত সসম্মানে ও সাগ্রহে মেনে নিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা ওদের দান করবে'। (সূরা নূর, আয়াত ৩৩)

এমনিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা ক্রীতদাসদের এ অধিকার দিয়েছেন যে, তারা যদি দাসত্বের শৃংখল হতে মুক্ত হতে চায় তবে মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে তাদের যেন সাহায্য করা হয়। উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হলে মনিব কিছুতেই দাসকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না। কোরআনের আয়াতে চুক্তির কথা বলা হয়েছে। চুক্তির পর দাসকে মুক্ত করার জন্যে সহায়তা করা মনিবের কর্তব্য। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন পাপের কাফ্‌ফারা হিসেবে ক্রীতদাসের মুক্তির উল্লেখ করেছে। মুসলিম এবং অমুসলিম দাসদাসীদের মুক্তির ব্যাপক সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বিষয় সবার জানা। কিন্তু ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে এসব বিষয়ে প্রশংসা পাওয়ার আশা করা যায় না। এসব অসন্তুষ্ট বিভ্রান্ত লোকেরা অন্যদেরও বিভ্রান্ত করতে সংকল্প করেছে। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মোমেন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে আল্লাহ তায়ালা সেই মুক্তিদানকারীর প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন, কেননা সে ক্রীতদাস মোমেন বান্দার অংগ-প্রত্যঙ্গ দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। এমনকি লজ্জাস্থানের মুক্তির পরিবর্তে লজ্জাস্থানকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন।

ক্রীতদাসকে মুক্ত করা হচ্ছে বেহেশতের চাবি

মুসলমানরা রসূল (স.)-এর সকল কথা বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্যে সচেষ্ট থাকতেন। সাঈদ ইবনে মারজানা হযরত আলী ইবনে হোসাইনের (যয়নুল আবেদীন) সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি হযরত আবু হোরায়রাকে (রা.) রসূল (স.)-এর

নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। রসূল (স.) বলেন, কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলমানের দাসত্ব মুক্তির ব্যবস্থা করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার পরিবর্তে মুক্তিদানকারীর প্রত্যেক অংগকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন। ইবনে মারজানা বলেন,হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে এ হাদীস শোনার পর আমি আলী ইবনে হোসাইন (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে এ হাদীস শোনালাম। এ হাদীস শোনার সাথে সাথে তিনি একজন ক্রীতদাসকে ডাকলেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। এই ক্রীতদাস এতো দামী ছিলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) তাকে দশ হাজার দিরহামে ক্রয়ে আগ্রহী ছিলেন।

হযরত যয়নুল আবেদীন দশ হাজার দেরহামের লোভ সম্বরণ করলেন এবং হাদীসের ওপর আমল করে দোযখের আগুন থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হলেন। এ ধরনের উদাহরণ এতো বেশী রয়েছে যে, এখানে উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। ক্রীতদাস মুক্ত করা বেহেশতের চাবিসমূহের মধ্যকার একটি চাবি। ক্রীতদাস ছাড়া বন্দীদের সাথেও ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমার বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্যে আমি রসূল (স.)-এর অসংখ্য বক্তব্যের কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করতে চাই। যাদের মনে সামান্য বিবেকবোধ রয়েছে তারা হয়তো আমার কথা বুঝতে সক্ষম হবে। যারা এসব গুণ থেকে বঞ্চিত তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা বৃথা।

ক্রীতদাসদের সম্পর্কে রসূল (স.)-এর শিক্ষা

হযরত মোহাম্মদ (স.) ক্রীতদাসদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট তাকিদ দিয়েছেন। রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো ক্রীতদাস খাবার তৈরি করে আনার পর তাকে একই দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়াবে। যদি সেটা করতে না পারো তবে অন্তত খাবারের কিছু অংশ অবশ্যই তাকে দেবে। কেননা সে তো খাবার তৈরিতে কষ্ট করেছে এবং আগুনের উত্তাপ সহ্য করেছে। বর্তমান কালের সভ্য মানুষদের মধ্যে কে আছে যে কি না নিজের সাথে দাসকে বসিয়ে খাবার খাওয়ায় অথবা নিজের খাবার থেকে দাসের জন্যে কিছু অংশ রেখে দেয়? এরা দাস নয় ভৃত্য, কিন্তু তারা মনিবের আহারের পর উচ্ছিষ্টই খেতে পায়।

রসূল (স.) ক্রীতদাসদের সাথে এতো ভালো ব্যবহার করতেন যে, তারা মুক্তির বদলে তাঁর অধীনে থাকাই বেশী পছন্দ করতো। তিনি যায়েদ ইবনে হারেছাকে (রা.) মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যায়েদ (রা.) বললেন, আমি মুক্তির পরিবর্তে আপনার অধীনে দাস হিসেবে থাকতে চাই। হযরত হাতেম (রা.) ছিলেন রসূল (স.)-এর দাস। তিনি বলেন, রসূল (স.) আমাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমি তখন বলেছিলাম, আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, কিন্তু আমি আপনাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না। এরপর আমি চল্লিশ বছর যাবৎ (তেরো বছর নবুয়তের আগে এবং তেইশ বছর নবুয়তের পর) রসূল (স.)-এর সেবা করেছি।

হুযুর আকরাম (স.) তাঁর ক্রীতদাসদের সাথে ভাই অথবা সন্তানের মতো ব্যবহার করতেন। তিনি উম্মতকেও বলে দিয়েছেন, তোমাদের দাস তোমাদের ভাই। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিজেদের কাজে তাদের সাহায্য নাও, তাদের ওপর কঠিন কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হলে তাদের সাহায্য করো।

আপনারাই বলুন, বিশ্বের অন্য কোনো ব্যবস্থায় কি মনিব ও দাস, খাজা এবং খাদেম পরস্পর ভাইয়ের মতো একাত্ম হয়ে বসবাস করে? আছে কি কোথাও এমন উদাহরণ? ইসলামে ক্রীতদাস তার মনিবের দাসত্ব করে না। দাসত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর। ইসলামে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সহায়তা এবং কল্যাণের প্রেরণা বিদ্যমান। ক্রীতদাসদের কাছ থেকে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ আদায় করে নেয়া নিষিদ্ধ। তাদের কাজ সহজ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) এ

সম্পর্কে তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তুমি যদি তোমাদের খাদেমের ভারী কাজ হালকা করে দাও তবে তা কেয়ামতের দিন তোমার নেকীর পাল্লায় তুলে দেয়া হবে।

দাসদের ভুল হয়ে গেলে তাদের মারপিটের সাজা দেয়া সমীচীন নয়। প্রাণে মেরে ফেলার তো প্রশ্নই ওঠে না। ইসলাম সে অধিকার কাউকে দেয়নি। (তবে তিনটি অবস্থায় মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে। মুরতাদ হয়ে গেলে। কেসাস বা হত্যার বদলে হত্যা। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি ব্যভিচার করে।) রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'তোমাদের দাস, তোমাদের দাস, তাদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখবে। তোমরা যা খাবে তাদের তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরিধান করবে তাদের তা পরিধান করতে দেবে। যদি ওরা ক্ষমার অযোগ্য কোনো অপরাধ করে ফেলে তবে তাদের শাস্তি দিয়ো না বরং ওহে আল্লাহর বান্দারা ওদের বিক্রি করে দাও।'

ইসলামে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা কি সেটা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কাফ্ফারা সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। রসূল (স.) বলছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কসম খায় অর্থাৎ শপথ করে যে, সে তার দাসকে প্রহার করবে তবে সেই শপথ পূর্ণ করার দরকার নেই। বরং এ ধরনের শপথ ভংগ করাই সমীচীন। এ ধরনের অনভিপ্রেত শপথ ভংগ করে ফেলাই হচ্ছে শপথ বা কসমের কাফ্ফারা। এটাই তার জন্যে কল্যাণকর। দাসদের যুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে কি আশ্চর্য রকমের তাকিদ দেয়া হয়েছে তা কি ভেবে দেখেছেন? রসূল (স.) এবং সাহাবারা নিজেরা যে পোশাক পরিধান করতেন দাসদেরও সেই পোশাক পরিধান করাতেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতা কি এ ধরনের উদাহরণ, এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে? বর্তমান যুগকে বলা হয় সভ্যতার যুগ। বর্তমান যুগের মানুষ নিজেদেরকে সভ্য এবং সংস্কৃতিমনা মনে করে। কিন্তু আজ যুদ্ধবন্দীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়?

মনিব যদি কোনো কারণে আত্মসম্বরণে ব্যর্থ হয়ে দাসকে প্রহার করে বা তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে, তবে ইসলাম-এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করেছে? রসূল (স.) এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, তার একজন ক্রীতদাস ছিলো, কোনো এক কারণে তিনি সেই দাসকে প্রহার করেছিলেন। প্রহারের সময় শুনতে পেলেন কে যেন বলছে, আবু মাসউদ তুমি তার ওপর যতোটা শক্তিমান, আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান। আবু মাসউদ বলেন, পেছনে ফিরে দেখি স্বয়ং রসূল (স.)। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমি এই দাসকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত করে দিলাম। তিনি বললেন, তুমি যদি এ কাজ না করতে তবে আগুন তোমাকে অল্পের জন্যে ছুঁয়ে ফেলার মতো অবস্থা হয়েছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন রসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের কোনো দাসকে চপেটাঘাত করে অথবা তাকে প্রহার করে, তবে তার কাফ্ফারা বা প্রতিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে সেই দাসকে মুক্ত করে দেয়া। ইসলাম দাসদের এমন অধিকার দিয়েছে, যেসব অধিকার তাদের মানুষ হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে। দাসদের সম্পর্কে প্রচারিত প্রচার-প্রোপাগান্ডা, বিভ্রান্তি ও অপবাদের প্রতিবাদ করার জন্যে আমি এ বিষয়ে কলম ধরেছি। আমি লজ্জা এবং বিনয়সুলভ ব্যবহারের পক্ষপাতী নই বরং দ্বিধাহীনভাবে সত্য কথা তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ তায়ালা ওসব লোককে মেরে ফেলুন যারা ইসলামী রীতি-নীতির ওপর অহেতুক ও অন্যায় সমালোচনা করে এবং ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে।

দাসদের মানসিক শান্তি

উম্মে সালমা ছিলেন উম্মুল মোমেনীন। তাঁর দাস ইবরাহীম (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূল (স.)-এর বিছানায় শয়ন করতাম এবং রসূল (স.) যে পাত্রে ওযু করতেন সেই পাত্র থেকে পানি

নিয়ে ওযু করতাম। বর্তমানে কোনো উদার মানসিকতার মানুষ অথবা মানবতার নামে বড় বড় বুলি উচ্চারণকারী মানুষ কি এমন উদাহরণ পেশ করতে পারবে? রসূল (স.) শুধু দাসদের শারীরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাই নিশ্চিত করেননি বরং তাদের মানসিক শান্তির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছেন। দাসরাও মানুষ। নিজের অস্তিত্ব, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাদের অবশ্যই ধারণা রয়েছে। এ ধারণা, এ অনুভূতি কোনোক্রমেই নষ্ট হতে দেয়া বা বিপর্যস্ত হতে দেয়া উচিত নয়। রসূল (স.) বলতেন, তোমরা মুখে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করো না যাতে তোমাদের দাস বা দাসী কষ্ট পায়। তিনি বলেছেন, তোমরা কখনোই দাস-দাসীদের আমার বান্দা, আমার বান্দী বলবে না। কারণ তোমরা যারা মুক্ত, যারা স্বাধীন, তারা সবাই একই রকমে আল্লাহর দাস। তোমরা বলবে যে, আমার দাস, আমার দাসী অথবা আমার কানিজ। অথবা বলবে আমার ছেলে, আমার মেয়ে। দাসদের সাথে নরম ব্যবহার করা, তাদের কল্যাণের জন্যে চিন্তা করা, বিশ্বের ইতিহাসে একটি অপরিচিত বিষয় ছিলো। ইসলাম দাসদের মানুষের অধিকার দিয়েছে। একবার রসূল (স.) উম্মে জমিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উম্মে জমিলা (রা.) কাঁদছিলো। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কাঁদো কেন? সে বললো, আমার এবং আমার মায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। দয়ার নবী, মানবতার নবী রসূলে ইনসানিয়াত বললেন, সন্তান এবং তার মায়ের মধ্যে যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। তারপর তিনি মা ও মেয়েকে একত্র করে মিলিয়ে দিলেন। রসূল (স.) যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের সন্তানরা অনাহারে থাকতেন, কিন্তু বন্দীদের পেট ভরে খাবার খেতে দিতেন।

দ্বিগুণ বিনিময় কারা পাবে

আল্লাহর কাছে মনিব এবং দাসদের মর্যাদা তাদের আমল এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হয়ে থাকে। দাসদের সুসংবাদ শুনিয়ে রসূল (স.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক তাদের আমলে দু'রকম বা দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পাবে। কোনো আহলে কেতাব যদি আমার ওপর ঈমান আনে। আল্লাহর অধিকার আদায় করার পাশাপাশি যে দাস মনিবের হক বা অধিকারও আদায় করে। যে ব্যক্তি নিজ দাসীকে ভালো শিক্ষা দিয়েছে, তারপর তাকে মুক্ত করে তার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক তাদের কাজের জন্যে দু'রকমের পুরস্কার বা দ্বিগুণ বিনিময় পাবে।

দাস আলেম এবং আয়েম্মায়ে ইসলাম

কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, দাসরাও স্বাধীন লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। দ্বীনী এলেম এবং নেক আমলের ভিত্তিতে উম্মত দাসদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। রসূল (স.)-এর হিজরতের আগেই কয়েকজন সাহাবা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় যান। প্রথম দিকের সেই মোহাজেরদের মধ্যে সাইয়্যেদেনা আবু হোযায়ফার দাস সালেমও ছিলেন। তিনি ছিলেন কোরআনের হাফেয এবং আলেম। রসূল (স.)-এর মদীনা যাওয়ার আগে সালেম মদীনায় নামায পড়াতেন। তাঁর পেছনে নামায যারা আদায় করতেন তাদের মধ্যে বড় বড় নেতাও ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)ও ছিলেন। হযরত আয়শার (রা.) দাস জাকোয়ান (রা.) নামাযে কোরায়শ নেতাদের ইমামতি করতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুর রহমানও (রা.) জাকোয়ানের পেছনে অর্থাৎ তার ইমামতিতে নামায আদায় করতেন। তিনি কোরআনের ক্বারী এবং ফেকাহর আলেম ছিলেন। বনু আবদুল আশহালের মধ্যে বহু বিশিষ্ট সাহাবা ছিলেন। নামাযে তাদের ইমামতি করতেন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আহমদ ইবনে জাহাশের দাস সাইয়্যেদেনা আবু সুফিয়ান (রা.)।

যুদ্ধের সময় নানারকম মারাত্মক দুর্যোগ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে সময় যদি একজন দাস কোনো শত্রুকে নিরাপত্তা দেয় তবে ইসলামী রাষ্ট্র সেটা মেনে নেয়। হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষও সবার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। তার দেয়া নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিয়েছে একজন দাস

মুসলমানরা ইরানের তারতুস শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন। তারতুসের বাসিন্দারা দুর্গের ভেতর থেকে মোকাবেলা করছিলো। হঠাৎ তারা মুসলমানদের ওপর হামলা বন্ধ করলো এবং শহরের দরোজা খুলে নিশ্চিন্তে বাইরে এলো। মুসলমানরা অবাক হলেন। প্রকৃত বিষয় জানার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তারতুসের এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা আমাদের কাছে কী জিজ্ঞেস করছো? তোমরাই তো আমাদের দিকে নিরাপত্তার প্রস্তাব সম্বলিত শর্ত লেখা কাগজের টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছো। আমরা তোমাদের শর্ত মেনে তোমাদের দেয়া নিরাপত্তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। একথা শুনে মুসলমানরা পেরেশান হয়ে পড়লেন। তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করলেন নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দিয়েছে? মাকনাফ নামক একজন ক্রীতদাস বললেন, আমি দিয়েছি। একটি কাগজে নিরাপত্তার কার্ড লিখে আমি তীরের মাথায় গেঁথে ওদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছি। মুসলমানরা যুদ্ধ বন্ধ করলেন ঠিকই, কিন্তু পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তারা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে দূত পাঠালেন এবং এ রকম নাযুক বিষয়ের পথনির্দেশ চাইলেন। আমীরুল মোমেনীন জবাব পাঠালেন। তিনি জবাবে চিঠিতে লিখলেন, অংগীকার পালনের ওপর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কোনো ব্যাপারে সন্দেহ, সংশয় থাকলেও তোমাদেরকে অবশ্যই অংগীকার পালন করতে হবে। তারতুসবাসীদের নিরাপত্তা দাও এবং নিজেদের অংগীকার পালন করো। খলীফার নির্দেশ পাওয়ার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়।

ইসলামের সৌন্দর্য দেখে যাদের গা জ্বালা করে এবং ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরানোর জন্যে যারা প্রোপাগান্ডা করে, মিথ্যা অপবাদ দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াত দান করুন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের পছন্দ হয় না অথচ ইসলামের শত্রুদের সবকিছুই তাদের ভালো লাগে। ওদের সৌন্দর্যহীনতাও সৌন্দর্য মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াত করুন। আমি তাদের চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন এবং দেখুন, ইসলাম কি ধরনের সত্যের শিক্ষা দিয়েছে।

দাস এবং মনিবের মধ্যে সাম্য

হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারেসের (রা.) দাস আবু ওকবাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের মধ্যে ধন-সম্পদ বন্টন করা হচ্ছিলো। তিনি আমার মনিব আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে (রা.) যে পরিমাণ দিয়েছিলেন আমাকেও ঠিক ততোটুকু দিলেন।

ইসলামের শত্রুদের কাছে আমি দাবী করছি, আপনি বিশ্বের অন্য কোনো সমাজ ব্যবস্থা থেকে এ ধরনের উদাহরণ সম্ভব হলে পেশ করুন। আমাদের যারা চ্যালেঞ্জ করে আমি তাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তারা সাহস থাকলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।

রসূল (স.)-এর বারবার তাকিদের কারণে মুসলমানরা ভালোভাবেই জানতেন যে, দাসদের অধিকার সম্পর্কে কঠিন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত মোয়াবিয়া ইবনে সুরাইদ (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে একজন ক্রীতদাস ছিলো। একদিন আমি তাকে জোরে থাপ্পড় দিয়েছিলাম।

এরপর আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। যোহরের নামাযের সময় বাড়ী ফিরে আমার আব্বার পেছনে নামায আদায় করলাম। নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে আব্বা আমাকে ডাকলেন এবং দাসকেও ডেকে আনালেন। তারপর দাসকে বললেন, ও তোমাকে সকালে চড় দিয়েছিলো, তুমিও তাকে চড় দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। দাস মনিবপুত্রের গালে চড় দিয়ে মনিবের আদেশ পালন করলো। ইতিহাসের কোথাও কি আপনারা এ ধরনের ঘটনা পড়েছেন?

গবর্নর এবং তার দাস

হযরত সালমান ফারসী (রা.) একদিন আটা মাখছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন গবর্নর। আটা মাখাতে দেখে একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার দাস কোথায়? সালমান (রা.) বললেন, তাকে একটা কাজে অন্যত্র পাঠিয়েছি। আমি চাই না ফিরে এসে সে আটা মাখিয়ে রুটি তৈরি করুক। ওর ওপর দ্বিগুণ কাজের বোঝা চাপাতে চাই না। এ কারণে আমিই আটা মাখাচ্ছি।

মুসলমানদের জ্বী হুযুর ভূমিকা দেখে মনে বড়োই ব্যথা লাগে। হে মুসলমানরা, তোমাদের সভ্যতা সবচেয়ে উন্নত, তোমাদের আদর্শ সবচেয়ে উত্তম, তোমাদের ইতিহাস সবচেয়ে উজ্জ্বল। এরপরও কেন তোমরা এতো হীনমন্যতার শিকার?

ক্রীতদাসের সাথে চুক্তির আদেশ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) দাসদের ভালোমন্দের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) ছিলেন রসূল (স.)-এর ব্যক্তিগত ভৃত্য। তিনি ছিলেন উঁচুস্তরের একজন সাহাবী এবং আনসারদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সিরিনের পিতা সিরিন ইবনে আবু ইমরান হযরত আনাসের (রা.) দাস ছিলেন। সিরিন হযরত আনাসকে (রা.) বললেন তার সাথে যেন মুক্তির জন্যে চুক্তি করা হয়। হযরত আনাস (রা.) রাযি হলেন না। সিরিন হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে হাযির হয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত আনাস (রা.)-কে ডেকে তার সাথে চুক্তি করার আদেশ দিলেন। হযরত আনাস (রা.) এতেও রাযি হলেন না। হযরত ওমর (রা.) তখন চাবুক হাতে নিলেন এবং কোরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও।' (সূরা নূর, আয়াত ৩৩)

হযরত আনাস (রা.) অবশেষে তার ক্রীতদাসের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। এক পর্যায়ে দাস মুক্তি লাভ করলো।

রোম সাম্রাজ্যের কোনো সম্রাট অথবা কোনো প্রজা কি এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পেরেছে? ইসলামপূর্ব আরবেও কি এ ধরনের ঘটনার কথা কেউ চিন্তা করতে পারতো? সভ্যতার দাবীদারদের মধ্যে কোথাও কি এ ধরনের একটি ঘটনারও সন্ধান পাওয়া সম্ভব? মনিব ক্রীতদাসের সাথে চুক্তি করতে রাযি না হওয়ায় চাবুকের ভয় দেখিয়ে হযরত ওমর (রা.) তাকে চুক্তি করতে বাধ্য করলেন। এ ধরনের ঘটনা একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাতেই সম্ভব। রোম সাম্রাজ্যে তো ক্রীতদাসদের ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে নিক্ষেপ করা হতো। এরপর সেই তামাশা দেখা হতো। এর চেয়ে বর্বরোচিত কোনো ঘটনার কথা কি মানুষ চিন্তা করতে পারে?

ঈমান উদ্দীপক দৃষ্টান্ত

হযরত ওমর (রা.) সকল ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দুর্বলরা তার কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো। তারা সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেতো। শক্তিমানরা ইনসাফ ও ন্যায়নীতির সামনে মাথানত করতো। আবু সাঈদ আল মাকবারি নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখ

করেছেন। তিনি বলেন, আমি বনি ইয়ারবুর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলাম। আমার মনিব আমার সাথে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলো যে, আমি তাকে চল্লিশ হাজার দেরহাম পরিশোধ করবো। যতো বছরে এই অর্থ পরিশোধ না হবে ততো বছরের ঈদুল আযহায় তাকে একটি বকরিও দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ৪০ হাজার দেরহাম ব্যবস্থা করে দিলেন। উক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়ে আমি মনিবের সামনে হাযির হলাম। মনিব অর্থ গ্রহণে রাযি হলেন না। তিনি কিস্তিতে অর্থ নিতে চাইলেন। আমি আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে সব কথা তাকে জানালাম। তিনি সব শুনে বললেন, তুমি কোনো চিন্তা করো না। তোমার অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দাও। বিকেলে এসে আমার সাথে দেখা করবে। আমি তোমাকে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দেবো। তোমার মনিব যখন ইচ্ছা করবে তখন বায়তুলমাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ তুলে নেবে। যদি তুলতে না চায় সেটা তার ইচ্ছা। আমি ৪০ হাজার দেরহাম বায়তুলমালে জমা করলাম। আমার মনিব এ খবর পেয়ে বায়তুলমালের কর্মকর্তার কাছ থেকে ৪০ হাজার দেরহাম একত্রে তুলে নিয়ে গেলেন।

শাসন ক্ষমতায় ক্রীতদাস

ক্রীতদাসরা শুধু মৌলিক মানবাধিকারই অর্জন করেনি বরং তারা শাসন ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াছেলা বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) নাফে ইবনে আবদুল হারেসকে মক্কার গবর্নর নিযুক্ত করেন। আসফানকা নামক জায়গায় হযরত নাফের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর দেখা হয়ে গেলো। হযরত ওমর হযরত নাফেকে বললেন, তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করছো কেন? মক্কায় কাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করে রেখে এসেছো? হযরত নাফে বললেন, ইবনে আবজাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন ইবনে আবজা কে? গবর্নর নাফে বললেন, আমাদের একজন ক্রীতদাস। হযরত ওমর (রা.) বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি একজন গোলামকে আমীর মনোনীত করে এসেছো? নাফে বললেন, জ্বী হ্যাঁ। কেননা সে আল্লাহর কেতাবের সবচেয়ে উত্তম ক্বারী এবং ফারায়েজ বিদ্যায় বিচক্ষণ আলেম। হযরত ওমর (রা.) শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী যথার্থই বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কেতাবের মাধ্যমে কিছু লোককে উপরে উঠাবেন আবার কিছু লোককে নীচে নামাবেন।

বিয়ে শাদীর ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে পৌত্তলিকদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। একজন মুসলমান ক্রীতদাস স্বাধীন পৌত্তলিক নারী পুরুষের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। মুসলমান সমাজে ক্রীতদাসেরা অভিজাত পরিবারে বিয়ে করেছে। উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) ফাতেমা বিনতে কয়েসের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত বেলাল (রা.) আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) বোনকে বিয়ে করেন। উসামা স্বাধীন পুরুষ ছিলেন, কিন্তু এক সময় হযরত উসামার পিতা যায়েদ ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) মক্কায় গোলামীর শিকলে বাঁধা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করেছিলেন। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। অভিজাত হোক বা সাধারণ মানুষ হোক, ধনী হোক বা গরীব হোক, মনিব হোক বা ক্রীতদাস হোক, পুরুষ হোক বা নারী হোক, বৃদ্ধ হোক বা যুবক হোক, এদের মধ্যে যে অধিক মোত্তাকী বা পরহেযগার আল্লাহর কাছে সে অধিক সম্মানিত। পবিত্র কোরআনে সকল সাহাবার মধ্যে একমাত্র হযরত যায়েদের (রা.) নাম উল্লেখ রয়েছে। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। পরে তাকে মুক্ত করা হয়। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) বাদে কোরআনে অন্য কোনো সাহাবীর নাম নেই। এমনকি রসূল (স.)-এর পূর্ববর্তী যতো নবী ছিলেন তাদের কোনো সাথীর নাম নেই। এ মর্যাদা একমাত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) লাভ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

রসূল (স.)-এর জীবনের শেষ বাণী

রসূল (স.) সব সময়ই ক্রীতদাসদের অধিকার সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তাঁর মুখে উচ্চারিত ছিলো কোরআনের সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত শব্দ। 'আসসালাতু ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম'। অর্থাৎ নামাযের পাবন্দি করবে এবং দাসদের অধিকার সংরক্ষণ করবে।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে চুক্তি করা, চুক্তিতে স্বাক্ষর করা, এমনকি কারো ওকালতি করার ক্ষেত্রে মুক্ত ও স্বাধীন লোকদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি ক্রীতদাসদেরও অধিকার রয়েছে। মোটকথা কোনো ক্ষেত্রেই ক্রীতদাসদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। ইসলাম স্বভাবসম্মত ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই মানুষের একটি শ্রেণী কিভাবে মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে?

এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যারা যুদ্ধ করে, ইসলাম মানুষ হিসেবে তাদের অধিকারেরও নিশ্চয়তা দেয়। নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ মাখজুমী খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মারা যায়। কাফেররা রসূল (স.)-এর কাছে বার্তা পাঠালো যে, নওফেলের লাশ যদি ফেরত দেয়া হয় তবে তারা রসূল (স.)-কে দশ হাজার দেরহাম দেবে। রসূল (স.) কোনো বিনিময় ছাড়াই কাফের নওফেলের লাশ তার জীবিত সঙ্গীদের কাছে ফেরত দেন।

স্বাধীন বা পরাধীন, বন্ধু বা শত্রুর বিবেচনার উর্ধে রসূল (স.) মৃতদের সম্মান দেখানোর নির্দেশ দেন। তিনি অমুসলিমদের জানাযার প্রতিও সম্মান দেখান। তিনি এক অমুসলিমের জানাযা দেখে তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে দাঁড়িয়ে যান। রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা যখন কোনো মানুষের জানাযা আসতে দেখবে (জানাযা যারই হোক না কেন) সেই জানাযার সাথে সাথে যাবে। যদি সাথে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে জানাযা দেখে উঠে দাঁড়াবে এবং চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

হযরত আলী (রা.) এবং তার ক্রীতদাস

দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় ক্রীতদাসদের যে অন্যায়ের কারণে নির্যাতন করে চামড়া তুলে নেয়া হয় অথবা মেরে ফেলা হয়, ইসলামে সে ধরনের অন্যায়ের কারণে শাস্তি তো দেয়াই হয় না বরং পুরস্কৃত করা হয়। এমনি একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

হযরত আলী (রা.)-এর কাছে একজন ক্রীতদাস ছিলো। একদিন তিনি তাকে কয়েকবার ডাক দিলেন। ক্রীতদাস কোনো জবাব দিলো না। হযরত আলী (রা.) ভেবেছিলেন হয়তো দূরে কোথাও গেছে এ জন্যে তার ডাক শুনতে পায়নি। কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে, ক্রীতদাস দরোজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে ডাকলাম কিন্তু তুমি জবাব দাওনি। বলো, জবাব দিলে না কেন? ক্রীতদাস জবাবে বললো, আপনার জ্ঞানের গভীরতা, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার ভালোই ধারণা আছে, আমি জানতাম জবাব না দেয়ার অন্যায় করলেও আপনি আমাকে কোনো শাস্তি দেবেন না। এ কারণে আমি আপনার ডাক শুনেও চুপ করে ছিলাম। ক্রীতদাসের কথা শুনে হযরত আলী (রা.) খুশী হলেন এবং তাকে শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কৃত করলেন।

আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর পুণ্যশীল ক্রীতদাস

ক্রীতদাসদের মধ্যে পুণ্যশীল ক্রীতদাসরা এতো উন্নত নমুনা পেশ করেছেন যে, তাদের আনুগত্য পরায়ণতায় প্রশংসা করতে হয়। তারা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ক্রীতদাস আফলাহ মনিবের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন

করেন। চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, আফলাহ চল্লিশ হাজার দেরহাম পরিশোধ করবে এবং আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) তাকে মুক্ত করে দেবেন। লোকেরা আফলাহকে মুক্তি উপলক্ষে আগাম মোবারকবাদ দিতে শুরু করলো। আবু আইয়ুব ঘরে পৌঁছার পর সম্পাদিত চুক্তির ব্যাপারে তার আফসোস হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন চুক্তি বাতিল করে দেবেন। আফলাহের কাছে বার্তা পাঠানো হলো। তাকে বলা হলো, আমি চাই তুমি আমার কাছে আগে যেভাবে ছিলে সেভাবে থাকো। আফলাহর স্ত্রী এবং সন্তানরা তাকে বললো, তুমি কি পুনরায় দাসত্বের জীবনে ফিরে যেতে চাও? অথচ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে স্বাধীনতা রূপ নেয়ামত দান করেছেন। আফলাহ বললেন, আল্লাহর শপথ, আবু আইয়ুব আনসারী আমাকে যে আদেশ দেবেন আমি সে আদেশই পালন করবো। আফলাহ চুক্তির কাগজ আবু আইয়ুবকে ফেরত দিলেন। আবু আইয়ুব সেই কাগজ সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর আবু আইয়ুব আফলাহকে ডেকে পাঠালেন। আফলাহ উপস্থিত হলে হযরত আবু আইয়ুব বললেন তুমি মুক্ত। তোমার যতো ধন-সম্পদ রয়েছে সবই তোমার।

এ উদাহরণের মাধ্যমে মনিব ও দাস উভয় পক্ষেই আভিজাত্য, ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নমুনা দেখা যায়। দাস তার মনিবের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেন আর মনিব খুশী হয়ে দাসের প্রতিশ্রুত ৪০ হাজার দেরহাম মাফ করে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন। এরপর দাসের কাছে মনিবের যেসব সম্পদ রয়েছে তার সবই তাকে দিয়ে দেন। এটাই হচ্ছে ইসলামী সমাজের নমুনা। অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষেরা, কুচক্রীরা এই সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে।

পশুদের অধিকার

হযরত ওমর (রা.) ভাষাহীন পশুদের প্রতি বিশেষ নযর রাখতেন। পশুদের ওপর কোনো মনিব অত্যাচার করে কি না, পশুরা অনাহারে থাকে কি না এসব খবর নিতেন। তিনি ভাবতেন যে, এসব ভাষাহীনেরাও আল্লাহর সৃষ্টি, প্রত্যেক প্রাণীর প্রতিই দয়ার প্রকাশ পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ। পশুদের ওপর বাড়াবাড়ি করা, তাদের দ্বারা তাদের সাধ্যের অধিক কাজ নেয়া, যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়নি সেই উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না। রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এসব ভাষাহীন প্রাণীদের ব্যাপারে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। 'তুমি পশুর পিঠে আরোহণ করে কোথাও যাওয়ার পরপরই পশুদের আরাম করার সুযোগ দাও।' অপর এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, জীবিত পশুদের প্রতি কখনো তীর নিক্ষেপ করো না। তীর চালনা প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্যে চামড়া দিয়ে পশুর আকৃতি তৈরি করে নাও।

সাইয়্যেদেনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রসূল (স.)-এর কাছ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে তিনি বলেন, কখনো কোনো জীবিত প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যস্থল করো না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) কয়েকজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় লক্ষ্য করলেন, কয়েকজন লোক সওয়ারীর পিঠে আরোহণরত অবস্থায় কথাবার্তায় মশগুল রয়েছে। রসূল (স.) বললেন, ওসব পশুর ওপর আরোহণ করে সফর করো, কিন্তু তাদের সহীহ সালামতে রাখো। পথে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে পশুদের চেয়ার বানিও না। বহু সওয়ারী সওয়ারের চেয়ে অধিক উত্তম, কেননা তারা সওয়ারের চেয়ে আল্লাহকে আরো বেশী স্মরণ করে।

পশুপাখিদের সাথে ভালো ব্যবহার

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো চড়ুই পাখি মেরে ফেলবে সেই চড়ুই কেয়ামতের দিন অভিযোগ করবে। চিৎকার করে অভিযোগ করবে, হে পরওয়ারদিগার এ ব্যক্তি আমাকে অকারণে হত্যা করেছে। আমার দ্বারা কারো কোনো উপকার হয়নি। এ ব্যক্তিও আমার দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং সে আমাকে বেঁচে থাকার অধিকারও দেয়নি।

পশুদের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পশুদের সাথে মানুষের আচরণের ওপর পারলৌকিক জীবনে নাজাত এবং শাস্তি অনেকটা নির্ভর করবে। একটি হাদীসে রহমতুল্লিল আলামিন বলেন, একটি বিড়ালের কারণে এক মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। মহিলা বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিলো, তাকে কোনো পানাহারও দেয়নি, বন্ধনমুক্ত করেও দেয়নি। ছেড়ে দেয়া হলে বিড়াল তার আহার খুঁজে নিতো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে একবার একটি কাক ধরে আনা হয়েছিলো। রসূল (স.) সেই কাক দেখে বললেন, যখনই কোথাও কোনো পশু বা পাখি হত্যা করা হয় তখনই আল্লাহর যেকেরে নিয়োজিত মাখলুক কমে যায়। মানুষের জীবনে যখনই কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সেটা তার পাপের ফলেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তো বান্দাকে সব পাপের জন্যে পাকড়াও করেন না। বহু পাপ তিনি মার্জনা করে দেন। রসূল (স.) এরপর কাকটি ছেড়ে দেন। কাক কা কা করে উড়ে যায়। আবু ওমর শায়বানি (রা.) বলেন, একবার এক সফরে আমি রসূল (স.) -এর সাথে ছিলাম। এক জায়গায় কাফেলা অবস্থান করছিলো। আমরা লক্ষ্য করলাম একটি চড়ুই পাখি আমাদের মাথার ওপর চুঁ চুঁ করে উড়ছে। রসূল (স.) অস্থিরতা প্রকাশ করলেন। খবর নিয়ে জানা গেলো, একজন সাহাবী চড়ুই পাখির বাসা থেকে তার ছানা নিয়ে এসেছে। রসূল (স.) চড়ুই পাখির ছানা তার বাসায় রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, এই চড়ুই পাখির তার শাবকের প্রতি যতটুকু মমতা রয়েছে বান্দার প্রতি আল্লাহর মমতা এর চেয়ে ঢের বেশী।

হযরত ছাওয়াদা ইবনে রবি আলজারমি (রা.) রসূল (স.)-এর কাছে তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, একবার আমি আমার মাকে নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। রসূল (স.) আমাকে সমাদর করলেন এবং কয়েকটি বকরি দান করলেন। তারপর আমার মাকে বললেন, তোমার ছেলেকে বলবে সে যেন এই বকরিগুলো ভালোভাবে দেখাশোনা করে। ওদের পায়ের নখ কেটে দেয়। দুর্বল বকরিগুলোকে শীত-গ্রীষ্মের সময় নিরাপদ হেফাযতে রাখবে, ক্ষুধার সময় তাদের খেতে দেবে। রসূল (স.)-এর এ বাণী থেকে বোঝা যায়, ভাষাহীন পশুদের অধিকারের ব্যাপারে তিনি কতোটা সচেতন এবং মনোযোগী ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার তাকিদ দিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যেই পশু সৃষ্টি করেছেন। পশুদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা মমতা প্রদর্শন করা ওয়াজিব। পশুদের কষ্ট দেয়া পাপ। রসূল (স.) বলেছেন, ঘোড়ার কপাল, ঘাড় এবং লেজের পশম কেটো না। কারণ ঘোড়া তার লেজ দিয়ে মশা মাছি তাড়ায়। কপাল এবং ঘাড়ের পশম ঘোড়াকে শীতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ঘোড়ার কপালের পশমের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গল জড়িত। রসূল (স.) ঘোড়া খাসী করতেও নিষেধ করেছেন।

একবার রসূল (স.)-এর কাছে একজন লোক উপস্থিত হলো। তার গায়ে ছিলো চাদর। চাদরের নীচে সে কি যেন লুকিয়ে রেখেছিলো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে আসছিলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলার সময় পাখির ছানার কিচিরমিচির আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি সেই পাখির ছানা ধরে চাদরের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। পাখির ছানার কিচিরমিচির শুনে মা পাখি আমার পিছু নিলো এবং আমার মাথার ওপর উড়তে শুরু করলো। আমি তখন পাখির ছানা মাটিতে রাখলাম। মা পাখি নীচে নেমে এলো এবং বাচ্চাগুলোকে তার পাখার নীচে লুকিয়ে রাখলো। আমি তখন বাচ্চাসহ মা পাখিকে ধরে ফেললাম। এখন পাখির ছানা এবং পাখি আমার কাছে রয়েছে। রসূল (স.) বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। আমি তখন ওদের ছেড়ে দিলাম। মা পাখি কিছুতেই বাচ্চাদের ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না। রসূল (স.) বললেন, পাখির বাচ্চাদের প্রতি মা পাখির মমতা দেখে তোমরা অবাক হয়েছো তাই না? সাহাবারা বললেন, হ্যাঁ। রসূল (স.) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, পাখির শাবকদের প্রতি মা পাখির মমতা যেরূপ, বান্দার প্রতি আল্লাহর মমতা এর চেয়ে অনেক বেশী। যাও এই পাখি এবং পাখির ছানা যেখান থেকে ধরেছো সেখানে রেখে এসো।

কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে ক্ষমা

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা একজন পাপীষ্ঠ নারীকে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর ওছিলায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। সেই মহিলা পিপাসায় কাতর একটি কুকুরকে কূয়ার কিনারে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছিলো। মহিলার মনে দয়া হলো। সে জুতোর মধ্যে পানি ভরে সেই কুকুরের পিপাসা নিবারণ করালো। এই দয়াশীলতার কারণে আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর দায়িত্বানুভূতি

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন যথেষ্ঠ সচেতন মানুষ। তিনি এতোটা সচেতন এবং দায়িত্বশীল ছিলেন যে, তিনি বলতেন, পথের বন্ধুরতার কারণে ইরাকের কোনো অজ্ঞাত এলাকায় একটি খচ্চর যদি পিছলে পড়ে আঘাত পায় তবে আমাকে সেজন্যেও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী খেলাফতের পরিচালক ছিলেন এ রকমই দায়িত্ব সচেতন জনপ্রতিনিধি।

হযরত ওমর (রা.) মদীনায় একবার একটি উট চালককে দেখেছিলেন। সেই উট চালক উটের পিঠে খুব বেশী বোঝা চাপিয়েছিলো। উটের পিঠ বেঁকে গিয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) চাবুক দেখিয়ে সেই উট চালককে শাসিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি উটটির পিঠে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছো। এই উটের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তার সাধ্যের অধিক বোঝা তার ওপর চাপিয়েছো। এ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় করো।

একবার রসূল (স.) জঙ্গলে একটি উট দেখলেন। উটটি ছিলো বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। দুর্বলতার কারণে সে চলাচল করতে পারছিলো না। সম্ভবত উটের মালিক অকর্মণ্য দেখে উটটি ছেড়ে দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) উটটির কাছে এগিয়ে গেলেন। তার পিঠে মমতার সাথে হাত বুলিয়ে দিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, আমি আশংকা করছি যে, কেয়ামতের দিন তোমার সম্পর্কেও আমাকে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে। এসব ঘটনা হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের উত্তরাধিকার। আমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং দুর্ভাগ্য এমনই যে, আমরা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতাকেই সকল সৌন্দর্য ও সাফল্যের আধার মনে করছি। পশুর প্রতি নির্মম আচরণ প্রতিরোধ সংস্থা এবং পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির উদ্ভাবক হিসেবে পাশ্চাত্যকে বাহবা দেয়া হচ্ছে। অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের যুবসমাজ তাদের মূল্যবান উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা এটাও জানে না যে, পাশ্চাত্য তো এসব কিছু মুসলমানদের কাছ থেকেই শিখেছে। ইসলাম সেই সময়েই পশুদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে যে সময় বিশ্বের জাতিসমূহ মানুষের অধিকার সম্পর্কেই কিছু জানতো না। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের আগে আমাদের যুবসমাজ যদি নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভে সক্ষম হতো তবে কি যে ভালো হতো। সকল প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম পথ প্রদর্শক, কিন্তু আজ আমরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছি।

হযরত ওমর (রা.) বায়তুলমালের আঁচড় লাগা উটের দেহ নিজ হাতে মালিশ করতেন। এর আগে অসুস্থ প্রৌঢ় উটের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) কোনো প্রাণিবিদ্যা কলেজ থেকে উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ করেননি। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা এবং আল্লাহভীতির কারণে হযরত ওমর (রা.) এসব বিষয়ে এতোটা মনোযোগী ছিলেন। আল্লাহর ভয় হচ্ছে মোমেন বান্দার জন্যে অলংকারস্বরূপ। এই আল্লাহভীতিই হচ্ছে সকল নেক আমলের ভিত্তি। এটাই হেদায়াতের মূল উৎস এবং কল্যাণের মিনার। হযরত ওমর (রা.)-এর আল্লাহভীতির গুণবৈশিষ্ট্য অন্য সব বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) নিজেকে সব সময় আল্লাহর সামনে জবাবদিহিরত মনে করতেন।

জেহাদ

জেহাদ হচ্ছে ইসলামের একটি উচ্চ চূড়া। মোমেন বান্দাতো পুরো জীবন জেহাদেই কাটিয়ে দেয়। জেহাদ থেকে যারা পালাতে চায় তারা তো মোনাফেকির রোগে আক্রান্ত। আমাদের নেতা হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন মহান মোজাহেদ। তিনি শুধু জেহাদের তাকিদই দিতেন না, বরং মোজাহেদ এবং তার পরিবার পরিজনের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার প্রমাণ দিতেন। মোজাহেদ সীমান্তে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় মনে মনে ভাবতেন, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) তার পরিবার-পরিজনের জন্যে একজন দরদী সুবিবেচক অভিভাবক হিসেবে রয়েছেন। তিনি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মোজাহেদ পূর্ণ নিশ্চিন্ততা এবং এখলাছের সাথে বীরত্বের পরিচয় দিতেন। কোনো প্রকার পিছুটান, মানসিক টেনশন তাকে কর্তব্য পালনে শৈথিল্যের মধ্যে ঠেলে দিতো না। অন্যদিকে গৃহকর্তার অনুপস্থিতির কারণে পরিবারের লোকেরা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হতো না। তারা দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করতো যে, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) তাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো প্রকার ক্রটি হবে না।

শহীদদের মর্যাদা এবং উত্তরাধিকারীদের প্রতি সমবেদনা

হযরত ওমর (রা.) জানতেন যে, মোমেন বান্দা জেহাদকে ভালোবাসে। আল্লাহর পথে সে এ বিশ্বাসের সাথে বের হয় যে, তার জন্যে শুধু লাভই রয়েছে। হয়তো তিনি বিজয়ী হবেন, এটাতো নিঃসন্দেহে খুশীর ব্যাপার। অন্যথা শাহাদতের সৌভাগ্য নসীব হবে। এই শাহাদাত হচ্ছে প্রকৃত সাফল্য। হযরত ওমর (রা.) তার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদের মনে এ প্রেরণা গেঁথে দিয়েছিলেন। শহীদদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান করা হতো। তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি সমবেদনা, সম্মান এবং আর্থিক ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো কার্পণ্য করা হতো না। তিনি তাদের বলতেন, তোমাদের শহীদের প্রকৃত বিনিময়তো আল্লাহ তায়ালা দেবেন, তবু আমি কর্তব্য হিসেবে তোমাদের কিছু সেবা করছি। ইসলামী রাষ্ট্রে শহীদ পরিবারের বিশেষ মর্যাদা ছিলো। তারা নিজেদেরকে কিছুতেই বঞ্চিত এবং বিড়ম্বিত মনে করতো না। সাইয়েদা কাছাআ (রা.)-এর চারটি সন্তান যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাদের শহীদ হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) তার জীবদ্দশায় উক্ত মহিলাকে চার সন্তানের নামে নিয়মিত ভাতা পরিশোধ করেছিলেন।

শহীদ হওয়ার পর উত্তরাধিকারীদের দুয়ারে দুয়ারে সাহায্যের আশায় ঘুরতে হবে, মোজাহেদ যদি যুদ্ধে যাওয়ার আগে এ রকম চিন্তা করতে থাকে তাহলে কিছুতেই সে মনেপ্রাণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, সাহসিকতার সাথে শক্রর মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে যারা যুদ্ধ করবে তাদের মনে যদি এ চিন্তা থাকে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারকে দেখার কেউ থাকবে না, তাহলে তারা কিছুতেই দৃঢ়ভাবে শক্রর মোকাবেলা করতে পারবে না। যে যোদ্ধার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে থাকে যে, তার বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে এবং শাহাদাত বরণের পর তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে তবে সেই যোদ্ধার মনোবল থাকে অটুট। যোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি পাবেই এ ধরনের মনোভাব না থাকলে যুদ্ধক্ষেত্রের নির্মম পরিবেশে একাগ্রতার সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তোপ থেকে আগুন বর্ষিত হচ্ছে, বিমান থেকে বোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, রকমারি অস্ত্র চারদিকে তৈরি করছে ধ্বংসযজ্ঞ। এমতাবস্থায় সৈনিকের আত্মবিশ্বাসই তাকে দৃঢ়পদ রাখতে পারে। নিজের পরিবার-পরিজনের সুখে-স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরই একজন সৈনিকের মনে এ রকম আত্মবিশ্বাস জন্ম নিতে পারে।

বীরত্ব মনে থাকে, দেহে নয়

বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, নিরোগ দেহ দেখেই সাধারণতঃ সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। হযরত ওমর (রা.) জানতেন যে, দেহের শক্তির চেয়ে মনের শক্তিই বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচায়ক হতে পারে। সৈনিকের অনেক কিছুই প্রভাব বিস্তার করে। তার মানসিক অবস্থা বিচার করতে হবে। বিবাহিত লোকদের চেয়ে অবিবাহিত লোকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তির ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) অধিক গুরুত্ব দিতেন। কেননা অবিবাহিত সৈনিকের পিছুটান কম থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে তারা বেশী মাত্রায় একাগ্রতার পরিচয় দিতে পারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সময় সৈনিকের আত্মীয়-স্বজন বিশেষতঃ পিতা-মাতার মনের অবস্থা থাকে খুব খারাপ ও বিস্ময়কর। তারা মনে করে যে, তাদের সন্তান ফিরে নাও আসতে পারে। হয়তো এটাই তার শেষ বিদায়। বিদায়ের সেই সময় বড়ই নাজুক এবং স্পর্শকাতর। যুদ্ধের ময়দানে যেসব সৈনিক বীরত্বের সাথে লড়াই করছে হযরত ওমর (রা.) সেসব সৈনিকের পিতামাতার সাথে দেখা করতেন। পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কাউকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হতো না। এমনি করে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা দুটি লাভ পেতো। একটি হচ্ছে জেহাদে অংশগ্রহণের লাভ, অন্যটি হচ্ছে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কারণে তাদের দোয়া লাভ। এ দু'টি কাজই উত্তম। সকল কাজেই পিতা-মাতার সন্তুষ্টি লাভ করা আবশ্যক। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করাও জেহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের লক্ষ্য থাকে শাহাদাত, কিন্তু যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম তৈরি করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) পদাতিক ডিভিশনের চেয়ে আরোহী সৈনিকদের বেশী গুরুত্ব দিতেন।

সুপ্রীম কমান্ডার বা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে হযরত ওমর (রা.)

যুদ্ধাস্ত্র নিঃসন্দেহে শক্তির নিদর্শন। বর্তমান যুগে যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষেত্রে মানুষ বিস্ময়কর উন্নতি অগ্রগতি অর্জন করেছে। এসব সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, অস্ত্রের চেয়ে মানুষের গুরুত্ব ঢের বেশী। বর্তমান যুগেও নিজের মানসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা, আত্মত্যাগের প্রেরণা একজন সৈনিকের মূল্য নাজুক মুহূর্তে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের একজন মানুষই হাজার হাজার সৈন্য সজ্জিত প্রতিপক্ষের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

আমীরুল মোমেনীন হওয়ার কারণে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ইসলামী বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার বা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সেনাপতিদের ওপর ন্যস্ত না করে তিনি নিজেও যুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতেন। সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি হিসেবে তিনি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। যে কোনো জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইসলামী রাষ্ট্র তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম ছিলো।

প্রত্যেক বড় বড় শহরে ঘোড়া তৈরি থাকতো। যুদ্ধের ময়দানে মোজাহেদদের ব্যবহার করা ঘোড়া ছাড়া এসব ঘোড়া ছিলো অতিরিক্ত। এটা ছিলো মূলতঃ সে আমলের ট্যাংক এবং আর্মড কার। শুধুমাত্র কুফাতেই চার হাজার ঘোড়া সজ্জিত অবস্থায় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতো। কুফার উদাহরণ থেকেই ধারণা করা যায় সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো কতো মযবুত। জরুরী পরিস্থিতিতে কোথাও সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজন হলে মোজাহেদরা বিদ্যুৎ গতিতে এসব ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছে যেতেন। এটা ছিলো একটা নিয়মিত বিভাগ। হযরত সোলায়মান ইবনে রবিয়া আল বাহিলী এই বিভাগের প্রধান পরিচালক ছিলেন।

নেতৃস্থানীয় কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হতো। হযরত ওমর (রা.) সেনাপতিদের বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতেন। কার কাছ থেকে কি ধরনের সেবা নেয়া

যাবে বা নিতে হবে সে ব্যাপারেও তিনি নির্দেশ পাঠাতেন। বহুদর্শী হযরত ওমর (রা.) সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের যোগ্যতার তথ্য সংরক্ষণ করতেন এবং প্রয়োজনে সেই তথ্য অনুযায়ী সৈনিকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনা করতেন। সে আলোকে তাদের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হতো। একবার সিপাহসালার নোমান ইবনে মাকরান (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.) এ মর্মে চিঠি পাঠালেন যে, তোমার অধীনস্তদের মধ্যে তুলাইহা এবং আমর ইবনে মাদি কারব-এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেবে, সাহায্য নেবে। তবে কোনো ব্যাপারেই তারা যেন একক সিদ্ধান্ত নিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রজ্ঞা, মেধা, বিবেচনাবোধ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। উপরোক্ত দুইজন সাহাবা তুলাইহা এবং আমর ইবনে মা'দি কারাব ছিলেন অসীম সাহসী। তাদের সাহসিকতা ছিলো অসাধারণ। যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে তারা ভাবনা চিন্তা ছাড়াই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) উক্ত দু'জনকে কোনো সেনাদলে সেনাপতি নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছিলেন।

আল্লাহর হাতেই রয়েছে বিজয় ও সাহায্য

যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় সব রকমের উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) সব সময়েই মনে করতেন বিজয় ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তিনি সিপাহসালারদের সব সময় বোঝাতেন যে, যুদ্ধাস্ত্র এবং সমরোপকরণের ওপর কখনো ভরসা করবে না। বরং মোসাব্বেবুল আসবাব আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে। তাঁর কাছ থেকেই বিজয় ও সাফল্যের আশায় আশান্বিত থাকবে।

রোমকরা মুসলমানদের মোকাবেলায় বিরাট সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করেছিলো। এ অবস্থা লক্ষ্য করে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে চিঠি পাঠালেন। তিনি পরিস্থিতির নাজুকতা ব্যাখ্যা করলেন এবং বাড়তি সাহায্য চাইলেন। জবাবে হযরত ওমর (রা.) লিখলেন, তোমার চিঠি পেয়েছি। মোমেন বান্দার ওপর যতো সমস্যা সংকুল অবস্থাই আসুক না কেন তাকে মহান আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার মুশকিল আসানের ব্যবস্থা করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযাগিতা করো এবং সদা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ২০০)

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কি?

ইসলাম বিবেকসম্মত এবং স্বভাবসম্মত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম জীবন ধারণের জন্যে জীবনোপকরণ ব্যবস্থা করার শিক্ষা দেয়। রসূল (স.)-এর জীবনে এ ক্ষেত্রে বিস্তৃত শিক্ষা লক্ষ্য করা হয়। রসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবারা সব সময় সফর সরঞ্জাম তৈরি করে সফরে রওয়ানা হতেন। সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পাথেয় সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হতো। এরপরই তারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাওয়াক্কুল কি? নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করা এবং পরিণামের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। প্রস্তুতিও আল্লাহর আদেশ। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অলসতা, কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার শিক্ষা আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়েছেন। এটা কোনো প্রকার দুর্বলতার পরিচায়ক নয়। আল্লাহর ওপর ভরসাকে দুর্বলতা মনে করা ঠিক নয়।

রসূল (স.) তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্যে পুরো এক বছরের খাদশস্য জমা করে রাখতেন। কিন্তু দেখা যেতো যে, জমা করা খাদ্যসামগ্রী অভাবী দুঃখী দরিদ্র লোকদের মধ্যে নিয়মিত বিতরণ

করা হতো। ফলে এক বছরের খাবার কখনো কয়েক মাসে, আবার কখনো এক সপ্তাহে শেষ হয়ে যেতো। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি প্রস্তুতি নিয়ে যেতেন। ওহুদ যুদ্ধের দিনে তিনি বর্ম পরিধান করে রেখেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও রসূল (স.) বর্ম পরিধান করেছিলেন। মক্কায় প্রবেশের সময় রসূল (স.) মাথায় নিরাপত্তা আবরণী পরিধান করেন। এ প্রস্তুতি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ছিলো না, কিন্তু এ ধরনের প্রস্তুতির পরই আল্লাহর ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল ছিলো যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এটাই চান। কাজেই সব রকমের প্রস্তুতির পর তাওয়াক্কুল করাই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা এবং রসূল (স.)-এর সুন্নত।

রসূল (স.)-এর প্রহরী সা'দ ইবনে মালেক (রা.)

হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকার নাম আমাদের দ্বীনে তাওয়াক্কুল নয়। বরং বাহ্যিক সকল প্রকার প্রস্তুতিকে ওয়াজিব বা আবশ্যিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদাররা, মোকাবেলার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকো।' (সূরা নেসা, আয়াত ৭১)

রসূল (স.) নাকা ইবনে ছাকান আনসারীকে তাঁর প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, এক রাতে আমি রসূল (স.)-এর পাশে ছিলাম। কিছুতেই তার ঘুম আসছিলো না। তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। আমি বললাম, হে রসূল (স.) কি ব্যাপার? তিনি বললেন, আমার সাথীদের মধ্যে থেকে কোনো পুণ্যবান আজ রাতে যদি আমার পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। তিনি এ কথা বলার সাথে সাথে অস্ত্র ঝংকারের শব্দ শোনা গেলো। রসূল (স.) বললেন কে? জবাব এলো আমি সা'দ ইবনে মালেক। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন কেন এসেছো? আগন্তুক বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার পাহারা দিতে এসেছি। একথা শোনার পর রসূল (স.) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর আমি রসূল (স.)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম।

হযরত ওমর (রা.) দোয়ার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু দোয়ার পাশাপাশি বস্তুগত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তিনি কখনো অমনোযোগী থাকতেন না। রেযেক অবশ্যই আল্লাহর যিম্মায়, তিনিই রেযেক দিয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে রেযেক চাওয়ার কথা দোয়ার সাথে আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। রেযেক পাওয়ার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। হযরত ওমর (রা.) সেনাবাহিনীর জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার সামরিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতেন, তারপর যুদ্ধে বিজয় ও সাফল্যের জন্যে বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে দোয়া দাওয়া দু'টোরই ব্যবস্থা করতেন। শত্রুর সংখ্যাধিক্যে হযরত ওমর (রা.) কখনো ভীত হতেন না। তিনি বলতেন আমি আশংকা করছি যে, আমাদের পাপ এবং সুন্নতের ওপর আমল না করার কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তার সামনে সব সময় পাক কোরআনের এই আয়াত জ্বলজ্বল করতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর আদেশে কতো ক্ষুদ্র দল কতো বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন'। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৯)

'কি ব্যাপার, যখন তোমাদের ওপর মুসিবত এলো তখন তোমরা বললে, এটা কোথা হতে এলো। অথচ তোমরাতো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বলো, এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকে। আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৫)

আল্লাহর সাহায্য

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি কখনো ওয়াদা ভংগ করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে এবং মোমেনদেরকে সাহায্য করবো। পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে।' (সূরা মোমেন, আয়াত ৫১)

এতে বোঝা যায় যে, ঈমানদারদের সাফল্য নিশ্চিত। শত্রুদের সংখ্যাধিক্য এবং অতিরিক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম মোমেনদের কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। তবে শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে এখলাছ সম্পন্ন মোমেন হতে হবে, শুধু মোমেনের দাবীদার হলেই হবে না। মোমেনদের চেষ্টা-সাধনাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। এ কারণে তাদেরকে তাঁর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য মনে করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোককে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে।' (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'হে মোমেনরা যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।' (সূরা মোহাম্মদ, আয়াত ৭)

আল্লাহর সাহায্য যেসব মোমেন পেয়ে থাকে তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আল্লাহর সকল আদেশের সামনে মাথানত করে এবং আল্লাহর নিষেধ করা কাজ থেকে দূরে থাকে। তারা পরিপূর্ণ এখলাছের পরিচয় দেয়। অথচ বর্তমানকালে মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে তারা গাফেলতির মধ্যে ডুবে আছে। শুধু তাই নয় বরং আল্লাহর সকল আদেশ-এর বিরোধিতা করছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ একই সাথে তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য মনে করছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য না পেলে তারা আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদার সমালোচনা করছে অথবা নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। এই উম্মত যেদিন নিজেদের ঈমানের দাবী পূরণ করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হবে সেদিন হবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন। সেদিন অবশ্যই তাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য নাযিল হবে।

বিনয় এবং আনুগত্যে যেদিন ঘাড় নত হবে এবং হে আল্লাহ তায়ালা! আমরা যেদিন তোমার সামনে মাথা নত করবো সেদিনই তোমার সাহায্য আসবে। সেদিন আমরা সম্মান লাভ করবো। তোমার সামনে নত হয়ে আত্মসমর্পণ করাই হবে আমাদের সম্মান পাওয়ার গ্যারান্টি।

মোজাহেদদের পথ প্রদর্শন

মোজাহেদরা জেহাদের ময়দানে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.)-এর দেহ মদীনায় থাকলেও মন থাকতো মোজাহেদদের কাছে। মোজাহেদদের চিন্তায়, তাদের কল্যাণের ভাবনায় তিনি অধীর থাকতেন। তিনি তাদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করতেন এবং মদীনায় বসেই পথনির্দেশ দিতেন। তাঁর এ ধরনের ঈমানের নূর ছিলো আল্লাহর বিশেষ দান। এই নূরের আলোকে মোমেন বান্দা দূরদূরান্ত পর্যন্ত দেখতে পায়। বান্দার সুস্থ মনকে আল্লাহ তায়ালা দূরদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ করে দেন। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতি অনেক হচ্ছে। মানুষ সবকিছুকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছে। যে সম্পর্কে তারা বুঝতে পারে না সেটা অস্বীকার করছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপায়-উপকরণ তাঁরই দান। তিনি ইচ্ছে করলে এসব উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে পারেন। বর্তমানে একজন মানুষ মিসরে বসে কানাডায় বা আমেরিকায় অবস্থিত অন্য একজনের সাথে কথা বলছে। হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে তো এসব উপকরণ বিদ্যমান ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের সাহায্যে হযরত ওমর (রা.)-এর কণ্ঠস্বর দূরে রণাঙ্গনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আল্লাহর জন্যে কোনো কাজই অসম্ভব নয়, কোনো কিছুই তাঁর অসাধ্য নেই।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত ওমর (রা.) মদীনায় মসজিদে নববীতে জুময়া'র খোতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ খোতবার মধ্যে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'হে সেনাদল! তোমরা পাহাড়ের দিকে নযর রাখো। যারা বাঘকে

বকরির পালের রাখাল নিযুক্ত করেছে তারা ভুল করেছে'। মুসল্লিরা অপ্রাসঙ্গিক একথা খোতবায় শুনে একে অন্যের দিকে তাকালেন। নামায শেষে হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এ কথার ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বললেন, খোতবা পড়ার সময় হঠাৎ আমার মনে হলো শত্রু সৈন্যরা পাহাড়ে ওঁৎ পেতে আছে। মুসলমানরা অসতর্কভাবে পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। একথা মনে হওয়ায় আমি বলেছিলাম, 'হে সেনাদল পাহাড়ের দিকে নযর রাখো। যারা বাঘকে বকরির পালের রাখাল নিযুক্ত করেছে তারা ভুল করেছে।'

এ ঘটনার এক মাস পর দূত বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় এলো। দূত বললো, মোজাহেদরা পাহাড়ের পাদদেশ অতিক্রমের সময় হঠাৎ আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর কণ্ঠে সতর্ক বার্তা পেয়েছিলাম। ফলে আমরা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলাম এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলাম। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জয়ী করেছেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর মন জেহাদের ময়দানে আটক থাকতো। তার কণ্ঠস্বর কোনো যান্ত্রিক উপায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানো হয়নি বরং আল্লাহর ইচ্ছায়ই এই আওয়ায যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেছিলো।

কেউ কেউ এ ঘটনা শুনে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেয়। যারা অস্বীকার করে তারা বস্তুবাদের দাস। তারাতো একথা বিশ্বাসই করে না যে, আল্লাহর অসাধ্য কিছু নেই। তিনি সব জানেন, সব শোনেন। তাঁর শক্তির, তাঁর কুদরতের কোনো শেষ নেই, সীমা পরিসীমা নেই। উপরোক্ত ঘটনা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এতে অবিশ্বাস করার মতো কিছু রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। যারা বিশ্বাস করে না তাদের সাথে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই, কারণ আমরাতো দারোগা হয়ে আসিনি।

হযরত ওমর (রা.) এবং সামুদ্রিক যুদ্ধ

হযরত ওমর (রা.) মোজাহেদদের জীবনকে বিশেষ মূল্যবান মনে করতেন। অনিশ্চিত এবং আশংকাজনক অবস্থায় তাদের রক্ষা করার জন্যে তিনি চিন্তা করতেন। আমীর মোয়াবিয়া (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে নৌ যুদ্ধের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন না। হযরত ওমর (রা.) নৌ যুদ্ধকে নাজায়েয মনে করার কারণে অথবা দাওয়াত ও তাবলীগের পরিধি বাড়াতে রাযি না থাকার কারণে এ যুদ্ধের অনুমতি দেননি এমন নয়। বরং সেই সময় পর্যন্ত সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মতো নৌবহর মুসলমানদের ছিলো না। সমুদ্র অভিযানের দক্ষতাও অর্জিত হয়নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং আত্মরক্ষার কৌশল ছাড়া সমুদ্রে অভিযান চালানো মূল্যবান জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শামিল। পরবর্তীকালে মুসলমানরা সমুদ্র যান ব্যবহার করেছিলো এবং সমুদ্র অভিযানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলো। স্থলের মতো সমুদ্রেও মুসলমানদের অধিকারের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। সাইপ্রাসের আশপাশের কয়েকটি দ্বীপ মুসলমানরা অধিকার করেছিলেন। মুসা ইবনে নাসির সে অভিযানের নেতৃত্ব দেন। ২৭ হিজরীতে হযরত ওসমানের (রা.) শাসনামলে মুসলমানরা সাইপ্রাস অধিকার করেন। সে অভিযানে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন আমীর মোয়াবিয়া (রা.)। তার সাথে আবু-যর গিফারী (রা.) আবুদ দারদার (রা.) মতো বিশিষ্ট সাহাবারাও অংশ নিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) দুরদর্শিতা এবং সতর্কতার কারণে বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও অপরিণামদর্শী যোদ্ধা বারা ইবনে মালেককে (রা.) সেনাবাহিনীর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ হযরত ওমর (রা.) জানতেন, লাফালাফির নাম যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে পরিকল্পনা ও কৌশল একান্ত প্রয়োজন। এসব কিছুর পাশাপাশি বীরত্বের ভূমিকাও রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) নিজে বীর ছিলেন। বীরত্বকে তিনি পছন্দও করতেন। কিন্তু অন্ধভাবে বীরত্ব দেখানো তাঁর পছন্দনীয় ছিলো না।

বায়তুল মাকদেসে হযরত ওমর (রা.)

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হযরত ওমর (রা.) মানুষের অধিকারের গুরুত্ব দিতেন। মোশরেক এবং আহলে কেতাবদেরও তিনি কখনো কোনো প্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। ইসলামী খেলাফত এবং ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য ছিলো সাম্য। এক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে বায়তুল মাকদেস মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়া হয়। শহরের চাবি হস্তান্তরের সময় নাগরিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) স্বয়ং বায়তুল মাকদেস সফর করেন। সেখানে যাওয়ার পর নামায আদায়ের জন্যে একটি ময়দানে যান। সেই ময়দান ছিলো হযরত মরিয়ম (আ.)-এর নামে নির্মিত একটি গীর্জার প্রাঙ্গণ। থু থু ফেলার প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত ওমর (রা.) নিজের রুমালে থু থু ফেললেন। তাকে কেউ কেউ বললো, আপনি ওই গীর্জায় থুথু ফেলুন, কারণ ওখানে আল্লাহর সাথে শেরেক করা হচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওখানে শেরেক করা হলেও আল্লাহর স্মরণও তো বেশী বেশী পরিমাণে করা হয়ে থাকে।

একজন যিম্মির ঘটনা

কোনো যিম্মির ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন। দুনিয়াবী বিষয়ে এবং সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করেনি। যে যেমন কাজ করবে সে তেমনই ফল পাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহর হাতে। সেখানের আদালতে এই ভিত্তিতে বিচার হবে যে, নবীদের শিক্ষার সাথে মানুষ কিরূপ আচরণ করেছে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তবে যে লোক মোমেন সে কি পাপাচারী লোকের মতো? তারা তো পরস্পর সমান নয়।' (সূরা সাজদা, আয়াত ১৮)

ন্যায়নীতি ও সুবিচার হচ্ছে এমন জিনিস যা চোখে দেখে এবং কানে শোনে, মূক এবং বধির নয়। নবীরা দুনিয়ায় ন্যায়নীতি এবং সুবিচারের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তারা ভেতরে বাইরে উভয় সৌন্দর্যে শোভিত ছিলেন। ন্যায়নীতি এবং সুবিচারও ভেতরে বাইরের সৌন্দর্যে শোভিত। যেখানে সঠিকভাবে ন্যায়নীতি ও সুবিচারের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে মানুষ ইনসাফকে বাস্তবরূপে দেখতে পায়। এ চিত্র বড়োই সুন্দর শোভন। এখানে কোনো লোক দুর্বলতার কারণে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয় না। কোনো শক্তিমান নিজের শক্তির দাপটে ন্যায়নীতি ও সুবিচারের গলা টিপে হত্যা করতে পারে না।

একবার হযরত ওমর (রা.) সিরিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে একজন যিম্মি এসে তার কাছে কাঁদতে শুরু করলো। সে ছিলো উদভ্রান্ত এবং বিধ্বস্ত। সে বললো, হে আমীরুল মোমেনীন, একজন মুসলমানের বাড়াবাড়ির কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। সে ব্যক্তি আমাকে মারপিট করেছে। আপনার কাছে আমি ফরিয়াদ করছি। আপনি সুবিচার করুন। হযরত ওমর (রা.) ক্রুদ্ধ হলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করার জন্যে গবর্নরকে নির্দেশ দিলেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.)। যিনি পাকড়াও করে আনতে গিয়েছিলেন তিনি বললেন, আমীরুল মোমেনীন তোমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছেন। আমি আশংকা করছি খুব শীঘ্র তিনি তোমাকে সাজা দেবেন। তুমি মায়া'য ইবনে জাবালের সাথে একটু কথা বলো। নামাযের সালাম ফিরিয়ে হযরত ওমর (রা.) সোহায়েব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যাকে ডেকে আনার জন্যে তোমাকে বলেছিলাম তাকে এনেছো? সোহায়েব বললেন, হ্যাঁ এনেছি। হযরত মায়া'য ইবনে জাবাল (রা.) বললেন, তিনিতো হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.), তিনি এসেছেন। তাকে ডেকে ঘটনা কি ঘটেছিলো জেনে নিলে ভালো হতো।

হযরত ওমর (রা.) আওফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমীরুল মোমেনীন, আমি লক্ষ্য করেছিলাম এই লোকটি একজন মহিলাকে শোয়াবার চেষ্টা করছে। মহিলা জোরাজুরি

করছে। একপর্যায়ে লোকটি মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে তার ওপর চড়াও হলো। আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মহিলাকে তার কবল থেকে মুক্ত করলাম এবং এ লোকটিকে কিছু উত্তমমধ্যম দিলাম।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কি না সেই মহিলাকে হাযির করো। হযরত আওফ (রা.) মহিলার বাড়ীতে গিয়ে সব কথা তাকে জানালেন। মহিলা সাথে সাথে আসতে চাইলো। মহিলার স্বামী এবং পিতা বললো, তোমার যাওয়ার দরকার নেই, আমরা গিয়ে তোমার পক্ষ থেকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। তারপর উভয়ে এসে আওফ ইবনে মালেকের (রা.) বর্ণিত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন। সবকিছু জানার পর হযরত ওমর (রা.) ক্রুদ্ধভাবে যিম্মির প্রতি তাকিয়ে বললেন, এসব কিছু করার জন্যেই কি আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। তারপর হযরত আওফকে মুক্ত করে দিলেন এবং যিম্মিকে শাস্তি দিলেন।

ইসলামী সমাজে সংখ্যালঘুদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছিলো, তাদের অধিকার যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো সেদিকে লক্ষ্য করুন। তারপর বর্তমান কালের অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। কি দেখবেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমরা মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর নানারকম নির্যাতন নিষ্পেষণ চালাচ্ছে এবং সংখ্যালঘুদের নির্মূল করার চেষ্টা করছে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব সহজেই সহ্য করে, এমনকি সেসব ধর্মের মানুষদের অধিকার সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অথচ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা ইসলামের অস্তি ত্বকেই ভয় পায়।

সর্বোপরি হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন মানুষ। তিনি ভুলত্রুটির উর্ধে ছিলেন না। রসূল (স.) বলেছেন, সকল মানুষই ভুল করে। ভুল করলেও যারা তওবা করে তারা উত্তম। হযরত ওমর (রা.) ভুল করলেই সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং অনুনয় বিনয় করতেন। তারপর নিজের সংশোধনের জন্যে চেষ্টা করতেন। এ রকম করাই হচ্ছে বান্দা হিসেবে মানুষের কর্তব্য।

হযরত আবু মুসা (রা.)-এর হাদীস এবং তার সত্যতা

একবার হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি দরোজায় তিনবার শব্দ করে কোনো সাড়া না পেয়ে ফিরে গেলেন। হযরত ওমর (রা.) সে সময় ঘরের ভেতর অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরক্ষণে এসে দেখলেন কেউ নেই। একজনকে বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েস অর্থাৎ আবু মুসা আশয়ারীর গলার আওয়ায শুনেছি, যাও তাকে ডেকে নিয়ে এসো। আবু মুসা আসার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি এসেছিলে কিন্তু আমার সাথে দেখা না করেই ফিরে গেলে কেন? আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বললেন, রসূল (স.) আদেশ দিয়েছেন যে, তিনবার কড়া নাড়ার পরও যদি গৃহস্বামী সাড়া না দেয় তবে ফিরে যাবে। এ হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই হাদীসের সপক্ষে প্রমাণ দাও।

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বেরিয়ে আনসারদের এক মজলিসে গেলেন। সেখানে সব কথা জানালেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বললেন, হাঁ এ হাদীস সত্য। রসূল (স.) এ রকম নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) শুনে বললেন, রসূল (স.)-এর এই হাদীস আমার তো জানা নেই। আজই প্রথম শুনলাম। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছ থেকে বেরোবার পর হযরত ওমর (রা.) মন্তব্য করলেন যদি সে সাক্ষী যোগাড় করতে পারে তবে বিকেলে তাকে মেম্বরের পাশে দেখবে, আর যদি সাক্ষী যোগাড় করতে না পারে তবে তাকে মিম্বরের পাশে দেখতে পাবে না।

বিকেলে হযরত আবু মুসা (রা.) মেম্বরের পাশে বসা ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবু মুসা বলো সাক্ষী পেয়েছো কি না। তিনি বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রসূল (স.)-এর এ হাদীস বর্ণনার সাক্ষী।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। হযরত উবাই সামনে এসে রসূল (স.)-এর উক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র রসূল (স.)-এর সাহাবীদের জন্যে আযাব হয়ে উঠো না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সোবহানাল্লাহ রসূল (স.)-এর নামে প্রচারিত একটি কথা আমি শুনেছি, আমি কি সেই কথার সত্যতা যাচাই করবো না?

কারো ঘরে প্রবেশ করার ইসলামী রীতি

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষণীয়। (১) কারো ঘরে যেতে চাইলে অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। এটা ইসলামী আদাব বা ইসলাম রীতি। (২) কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তা অনুমতি না দিলে মেহমানকে বিনা বাক্যে ফিরে যেতে হবে। এটা কোরআনেরও শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'কারো ঘরে অনুমতি না পেয়ে প্রবেশ করো না।' (৩) হযরত ওমর (রা.)-এর মেধা এবং সচেতনতা প্রশংসনীয়। কাজে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেই মানুষকে সনাক্ত করতে পারতেন। (৪) তাকে একটি হাদীস শোনানো হয়েছিলো। সেই হাদীস তিনি আগে কখনো শোনেননি। হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তিনি প্রমাণ চাইলেন। (৫) হাদীস সম্পর্কে তিনি যে জানেন না সেটা তিনি সহজভাবে স্বীকার করেছেন এবং আমীরুল মোমেনীন হওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রকার সংকোচ বোধ করেননি। আমরা কি এমন অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করি? সমাজে নিজেকে ছোট করার কোনো বিষয় কি আমরা মেনে নিই? অথচ হযরত ওমর (রা.)-এর জন্যে এটাই ছিলো স্বাভাবিক।

হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রা.) এবং ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)

হযরত ওমর (রা.) একবার মসজিদে নববীতে এলেন। হাসসান ইবনে ছাবেত (রা.) মসজিদে বসে কবিতা পাঠ করছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মসজিদে নববীতে বসে গযল পাঠ করছো? হযরত হাসসান (রা.) শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি সেই সময়েও এই মসজিদে বসে কবিতা পাঠ করেছিলাম যখন তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এখানে বিদ্যমান ছিলেন। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আর কোনো কথা না বলে নীরবে চলে গেলেন। হাসসানের কথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর মনে পড়ে গেলো যে, হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) একবার মসজিদে বসে কবিতা পাঠ করছিলেন। হঠাৎ রসূল (স.) মসজিদে এলেন। রসূল (স.)-কে দেখে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) ভীষণ অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু রসূল (স.) বললেন, পড়তে থাকো। এ কথা শোনার পর হযরত কা'ব (রা.) কবিতা পাঠ অব্যাহত রাখলেন।

এজতেহাদ কখন বৈধ

কোনো বিষয়ে এজতেহাদ করার সময়ে যদি হযরত ওমর (রা.)-কে বলা হতো যে, এ বিষয়ে কোরআন হাদীসে প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে তখন সাথে সাথে তিনি এজতেহাদ পরিত্যাগ করতেন। কেননা এমন ক্ষেত্রে এজতেহাদ বৈধ নয়। হযরত ওমর (রা.) যে সময় খলীফা হয়েছিলেন সে সময় নিহত ব্যক্তির স্ত্রীকে নিহত ব্যক্তির হত্যার বিনিময়ে পাওয়া অর্থের অংশ দেয়া হতো না। হযরত যেহাক ইবনে সুফিয়ান (রা.) এ খবর জানার পর হযরত ওমর (রা.)-কে লিখে জানালেন যে, রসূল (স.) নিহত ব্যক্তির স্ত্রীকে অংশীদারিত্ব দিয়েছিলেন। একথা জানার পর হযরত ওমর (রা.) এজতেহাদ ত্যাগ করেন।

নিজের ভুল স্বীকার এবং রায় প্রত্যাহার

ভুল হয়ে গেছে জানার পর হযরত ওমর (রা.) লজ্জিত হতেন এবং বিনয়ের সাথে সঠিক বিষয় মেনে নিতেন। তার চেহারায় এবং অবয়বে এ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতো। একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর এহরামের চাদর রং দিয়ে রঙিন করা হয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) আপত্তি করলেন, সাথে সাথে হযরত আলী (রা.) বললেন, এ সম্পর্কে রসূল (স.)-এর সুন্নত আমরা জানি। কাজেই কারো কাছে জিজ্ঞেস করার এবং কারো কাছ থেকে শেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (রা.)-এর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) জানতেন। এ কারণে তিনি আর কোনো কথাই বললেন না। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

একবার একটি মাসআলা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে একজন আনসার মহিলার মতভেদ দেখা দিলো। মহিলা হযরত ওমর (রা.)-কে তার মতামত পরিবর্তন করতে বললেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন একজন মহিলার কথায় আমি তা করতে পারি না। মহিলা যুক্তি দিয়ে বললেন, কেন পারেন না? রসূল (স.)-এর সহধর্মিনীরা কি তাঁর সাথে তর্ক করেননি? তারা কি তাদের যুক্তিসঙ্গত মতামত রসূল (স.)-কে দিয়ে মানিয়ে নেননি? আনসার মহিলারা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং ফেকাহর মাসআলা তারা ভালোই জানেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে সত্য তথ্য জানার ক্ষেত্রে লজ্জা-সংকোচ, হায়া-শরম তাদের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। হযরত ওমর (রা.) মহিলার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তার মতামত মেনে নিলেন।

হযরত আবু মাহজান ছাকাফি (রা.)-কে মদ পানের অভিযোগে হযরত ওমর (রা.) সাতবার শাস্তি দিয়েছিলেন। একদিন তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে হাযির হলে তিনি একজনকে বললেন, ওর মুখ শুঁকে দেখো। হযরত ওমর (রা.) সন্দেহ করছিলেন যে, তিনি তখনো মদ পান করে এসেছিলেন। হযরত আবু মাহজান (রা.) বললেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।' অথচ আপনি তা করছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) নীরব হয়ে গেলেন। হযরত আবু মাহজান ছাকাফি (রা.) সূরা হুজুরাতের আয়াত থেকে যুক্তি দিয়েছিলেন। কোরআনের আয়াতের সুস্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) কিভাবে পাল্টা কথা বলতে পারেন?

আম্বিয়ায়ে আলাইহিস সালাম বাদে অন্য কোনো মানুষ দোষত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। হযরত ওমর (রা.) একথা ভালোভাবেই জানতেন। এ কারণে কোনো ভুল হয়ে গেলে তিনি তা মেনে নিতেন। কোনোরকম হঠকারিতার পরিচয় অথবা ক্ষমতার দম্ভ দেখতেন না। বরং সংকোচে লজ্জায় বিনয়ভাব প্রকাশ করতেন। হযরত ছাওয়াদ ইবনে কারেব জাহেলি যুগে জ্যোতিষী ছিলেন। একদিন হযরত ওমর (রা.) তাকে বললেন, তোমার জ্যোতিষ বিদ্যার কি খবর? হযরত ছাওয়াদ একথা শুনে ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি বাদে অন্য কেউ আমাকে এমন কষ্টদায়ক কথা বলেনি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ভাই ছাওয়াদ আমরা তো শেরেকের মধ্যে ছিলাম, সেটা তো ছিলো জ্যোতিষ্ক বিদ্যার চেয়ে আরো বেশী মারাত্মক।

হযরত ওমর (রা.) রসিকতা করে কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু হযরত ছাওয়াদ ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কথা বাড়ালেন না। তিনি নরমভাবে সাথীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আমরা তো এক সময় জ্যোতিষ্ক বিদ্যা চর্চার চেয়েও খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম। খেলাফতের মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.) সব সময় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণের চিন্তা করেছেন। নিজে খলীফা হিসেবে কোনো প্রকার দাপট কখনো দেখাননি। তিনি সব মানুষকে সম্মান করতেন এবং সকলের সাথে ন্যায়নীতিমূলক আচরণ এবং সুবিচার করতেন। মানুষকে সম্মান করা, মর্যাদা দেয়া ছিলো তার স্বভাবজাত গুণ।

হযরত ওমর (রা.)-এর কোনো কথার বা সিদ্ধান্তের কেউ প্রতিবাদ করলে তিনি প্রতিবাদকারীর বক্তব্য ভালোভাবে শুনতেন। এরপর কৃতজ্ঞতার সাথে সেই বক্তব্য গ্রহণ করতেন এবং প্রতিবাদকারীর প্রশংসা করতেন। আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে দশ লাখ দেরহাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেসব মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেন। কিছু দেরহাম উদ্বৃত্ত থাকলো। সেই দেরহাম ব্যয় করার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলো। এক যুবক দাঁড়িয়ে বললো, হে আমীরুল মোমেনীন পরামর্শ তো সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যেসব ক্ষেত্রে কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। গনিমতের মাল, ফাঈ এবং সাদাকাত সম্পর্কে আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান কোরআনে বিদ্যমান রয়েছে। আপনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করুন। যুবকের নাম ছিলো সাআসাআ ইবনে সাওহান। যুবকের কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন, তুমি আমার আপন লোক এবং আমি তোমার আপন লোক। এরপর অবশিষ্ট অর্থও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

রাত্রিকালের টহল এবং একটি চমৎকার ঘটনা

একরাতে হযরত ওমর (রা.) মদীনার গলিতে টহল দিচ্ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। তারা এক ঘরের দরোজায় পৌঁছে লক্ষ্য করলেন ভেতরে চেরাগ জ্বলছে। হযরত ওমর (রা.) সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো এ কার ঘর? আবদুর রহমান বললেন, জানি না। খলীফা বললেন, এ ঘর রবিয়া ইবনে উমাইয়ার। এ ঘরের লোকেরা এখন মদ পান করছে। বলো কি করা যায়? আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।

এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট সঙ্গীর পরামর্শ মেনে নিয়ে তিনি শরীয়তের বিধান মেনে নিয়েছেন। অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান থেকে বিরত থাকলেন। সর্বোচ্চ শাসক যদি এভাবে আইনের শাসন মেনে চলেন তবে সেটা দেশের জনগণের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত ঘরের মালিক কে সেটা আবদুর রহমান ইবনে আওফ জানেন না, অথচ সচেতন খলীফা সেটা জানেন।

উম্মতের হিতাকাঙ্খী

যে জাতির উত্তরাধিকারের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব রয়েছে সে জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন-কানুন, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই পরানুকরণ শোভা পায় না। তবু যদি পরানুকরণ করে তবে তাদেরকে হতভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যাবে? আমাদের মন তালাবদ্ধ নাকি আমাদের বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে কে জানে?

পরিস্থিতির দাবী বুঝতে পারা, দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনে এগিয়ে যাওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর বিশেষ গুণ। বিপদ, কষ্ট, মুসিবত প্রতিটি মানুষের জীবনের অংশ। সে রকম সময়ে সমবেদনা প্রকাশের মতো মানুষ দরকার। এ রকম সময়ে হযরত ওমর (রা.) কখনো অনুপস্থিত অথবা সম্পর্কহীন থাকতেন না। সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা ও কল্যাণ চিন্তার কারণে মানুষ হযরত ওমর (রা.)-কে মনে-প্রাণে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

কোরায়শ নেতা আবু সুফিয়ান অন্যান্য কোরায়শ নেতাকে সঙ্গে করে একবার হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময়ে হযরত ওমর (রা.) মজলিসে শূরার সদস্যদের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা করছিলেন। একই সময়ে হযরত বেলাল, হযরত খাব্বাব (রা.) প্রমুখ হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন।

হযরত ওমর (রা.) শেষোক্তদের অনুমতি দিলেন। এতে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য অপেক্ষমান কোরায়শ নেতা অপমানিত বোধ করলেন। তারা এ অপমান বোধ করার কথা প্রকাশ করে বিরক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই আবু সুফিয়ানের সাথেই তার শোকের সময়ে হযরত ওমর (রা.) গভীর সমবেদনাপূর্ণ আচরণ করেন। ফলে আবু সুফিয়ান খুশী হন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর জন্যে দোয়া করেন। হযরত ওমর (রা.) সব সময়েই এমন ব্যবহার করতেন যা তার জন্যে মানানসই ছিলো।

ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর শাহাদাত

আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়াজিদ ছিলেন বিশিষ্ট সেনানায়ক। হযরত ওমর (রা.) তাকে সিরিয়ার গবর্নর নিয়োগ করেছিলেন। এক যুদ্ধে তার শাহাদাতের খবর ডাকযোগে মদীনায় এসেছিলো। চিঠি খোলার সময় ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে ছিলেন। আবু সুফিয়ানকে খলীফা চিঠি পড়ার পর বললেন, ইয়াজিদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ধৈর্য ধারণ করে মনে সাহস রাখার তওফিক দান করুন। আল্লাহ তায়ালা ইয়াজিদকে তার রহমতের ছায়ায় জায়গা দিন।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদে আবু সুফিয়ান গভীর মর্মাহত হন। আমীরুল মোমেনীন তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, ইয়াজিদের জায়গায় আপনি সিরিয়ায় কাকে গবর্নর নিয়োগ করবেন? খলীফা বললেন, তার ভাই আমীর মোয়াবিয়াকে। একথা শুনে আবু সুফিয়ান খুশী হলেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে দোয়া করলেন। বললেন, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এর বিনিময় দান করুন।

আবু সুফিয়ান ছিলেন কোরায়শ নেতা। রসূল (স.) তাকে সম্মান করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, যারা কাবা ঘরে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ, যারা নিজ ঘরে দরোজা বন্ধ করে বসে থাকবে তারা নিরাপদ, আর যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ।

ইসলামের সেবায় আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ভূমিকা

আবু সুফিয়ান (রা.)-এর যুবক পুত্রের শাহাদাতে তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে অপর পুত্র মোয়াবিয়াকে হযরত ওমর (রা.) একই জায়গায় সিরিয়ার গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। উত্তম ব্যবহারের এটা ছিলো প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবু সুফিয়ান এ ধরনের উত্তম ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি জেহাদে অংশ নেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আত্মত্যাগের পরিচয় দেন। মোরতাদদের ফেতনা মোকাবিলায় অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের প্রথম দলে তিনি ছিলেন। রসূল (স.) নিজের জীবদ্দশায় তাকে ইয়েমেনের গবর্নর নিযুক্ত করেন। রসূল (স.)-এর ওফাতের সময় ইয়েমেন থেকে মদীনায় আসার পথে একজন মোরতাদের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। আবু সুফিয়ান সেই ধর্মান্তরিত ব্যক্তি অর্থাৎ মোরতাদকে হত্যা করেন। রসূল (স.)-এর ওফাতের পর মোরতাদ হত্যার এটা প্রথম ঘটনা বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। ইবনে শেহাব বলেন, কোরআনের সূরা মোমতাহেনার নিম্নোক্ত আয়াত আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত তাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা মোমতাহেনা, আয়াত ৭)

জেহাদের ময়দানে আবু সুফিয়ানের দুটি চোখই শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। রসূল (স.) এর নেতৃত্বে তায়েফে বনু ছকিফ-এর মোকাবেলার সময় আবু সুফিয়ানের একটি চোখ শহীদ হয়। দ্বিতীয় চোখ রোমকদের সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছিলো। আবু সুফিয়ান আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়েও রসূল (স.)-কে সম্মান করতেন। ইতিহাসে এ সম্পর্কিত বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা ছিলেন রসূল (স.)-এর স্ত্রী।

মানবীয় সৌন্দর্যে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন উঁচুস্তরের প্রশংসাধন্য মানুষ। আনন্দ ও বেদনা উভয় সময়েই তিনি অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম ছিলেন। বন্ধুদের আনন্দে বেদনায় তিনি অংশ নিতেন। নিজের কষ্ট, বেদনার সময়েও তিনি ছিলেন একজন আবেগকাতর বিবেকবান মানুষ।

যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর শাহাদাত

যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর বড় ভাই। হয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) বলেন, ভোরের হাওয়া প্রবাহিত হলে সেই হাওয়া যায়েদের সুবাস নিয়ে আসে। মনের জখম তাজা হয়ে যায়, মনের শান্তি তিরোহিত হয়ে যায়।

যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর চেয়ে বয়সে বড় এবং তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাকে স্মরণ করে হযরত ওমর (রা.) অস্থির হয়ে উঠতেন। হযরত যায়েদ (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ ভালোবাসতেন। ওহুদের যুদ্ধের সময় হযরত ওমর (রা.) কসম দিয়ে বললেন, বর্মটা তুমি পরো। যায়েদ (রা.) বর্ম পরিধান করলেন। একটু পর যায়েদ বর্মটা খুলে ফেলে বললেন, তুমি আমার সম্পর্কে যা চিন্তা করো আমিও তোমার সম্পর্কে তাই চিন্তা করি। তারা একে অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

হযরত যায়েদ (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় হযরত ওমর (রা.) ভীষণ মর্মাহত হন। তার বিচ্ছেদ বেদনায় হযরত ওমর (রা.) ছটফট করতেন। মাতমাম ইবনে নুয়াইয়া ছিলেন কবি। তার ভাই মালেক ইবনে নুয়াইয়ার মৃত্যুতে মাতমাম অত্যন্ত মর্মস্পর্শী মর্সিয়া রচনা করেছিলেন। মাতমাম মদীনায় এলে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে তার দেখা হলো। হযরত ওমর (রা.) মাতমামকে বললেন, আমি যদি তোমার মতো কবি হতাম তবে তোমার মতোই ভাইয়ের শোকে মর্সিয়া (শোকগাঁথা) লিখতাম। মাতমাম জবাবে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, যদি আমার ভাই আপনার ভাইয়ের মতো মৃত্যুবরণ করতো তবে আমি কোনো শোক, কোনো দুঃখ প্রকাশ করতাম না এবং তার শোকে মর্সিয়াও রচনা করতাম না। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) প্রভূত সান্ত্বনা পেলেন এবং বললেন, অনেকেই আমার ভাইয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করেছে কিন্তু তোমার মতো উত্তম শোক প্রকাশকারী অন্য কেউ আমার কাছে আসেনি।

এরপর হযরত ওমর (রা.) যখনই নিজ ভাই যায়েদ (রা.)-কে স্মরণ করতেন তখনই ভাইয়ের সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, আমার ভাই আমাকে টেক্কা দিয়েছে। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন, শাহাদাত বরণের ক্ষেত্রেও তেমন। মোমেন বান্দা নিজের ভাইকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই ভালোবাসে এবং সেই ভালোবাসা হয় অত্যন্ত গভীর এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। আমরা সকল মুসলমান এক উম্মত এবং একই দেহের মতো। ভালোবাসার সেই প্রেরণাকে আমাদের জাগ্রত করতে হবে যা দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়ে গেছে।

সাহাবায়ে কেরামও চিত্তবিনোদন করতেন। বাহুল্য বিবর্জিত এবং পাপমুক্ত ছিলো সে বিনোদন। একরাতে হযরত ওমর (রা.) মদীনার পথে টহল দেয়ার জন্যে সঙ্গী হিসেবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে সঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আবদুর রহমানের বাড়ী যাওয়ার পর

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে খলীফা শুনতে পেলেন আবদুর রহমান গজল গাইছেন। পরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি বললেন, হাঁ গাইছিলাম। আমি যখন একা থাকি তখন অন্যান্য লোকের মতো আমিও ভালো কবিতা পাঠ করে চিত্তবিনোদন করি।

একজন বেদুইনের কবিতা

হযরত ওমর (রা.) নিরস স্বভাব রুক্ষ মেজাজের মানুষ ছিলেন না। ব্যক্তিত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য তিনি যেমন বজায় রাখতেন তেমনি হাসিখুশীও ছিলেন। তিনি রসিকতা যেমন জানতেন তেমনি অন্যদের রসিকতায় আমোদিতও হতেন। একবার এক বেদুইন তার কাছে এলো এবং তাকে নিজের রচিত কবিতা শোনালো–

কল্যাণময় হে ওমর
আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাত দান করুন,
আজ আমাদের মেয়েদের জন্যে কিছু দাও
তাদের কাপড় পরাও।
আমি আল্লাহর কসম করে বলছি
তুমি অবশ্যই এসব করবে।

হযরত ওমর (রা.) রসিকতা করে বললেন, যদি এসব না করি তবে কি হবে? বেদুইন বললো, আমি কসম করে বলছি, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাবো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি চলে গেলে তারপর কি হবে?

বেদুইন বললো, আল্লাহর কসম, আমার সম্পর্কে তোমাকে সেদিন অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে যেদিন হিসাবকেতাবের জন্যে মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে। সেদিন হিসাব গ্রহণকারী মাঝখানে থাকবেন। একদিকে বেহেশত অন্যদিকে দোযখ থাকবে। হিসাবনিকাশের পর তাকে দুই দিকের একদিকে যেতে হবে।

এই কবিতা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে শুরু করলেন। অশ্রুতে দাড়ি ভিজে গেলো। ভৃত্যকে ডেকে বললেন, শোনো আমার এই জামা ওকে দিয়ে দাও। আজ এই জামা ছাড়া ওকে দেয়ার মতো আর কিছুই আমার কাছে নেই।

একটি বিস্ময়কর নাম

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) মজলিস গুলজার করতেন। তার রসিকতা, ঠাট্টামস্করাও হতো শিক্ষণীয়। কোনো কথা বিশেষভাবে বোঝানোর প্রয়োজন হলে তিনি সহজ সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ দিতেন। মানুষকে শিশুদের অর্থপূর্ণ ভালো নাম রাখার জন্যে তাকিদ দিতেন। কারো নাম ভালো না হলে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। একবার একজন লোক হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এলে তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললো, 'শেহাব' (আগুনের চমক)। জিজ্ঞেস করলেন পিতার নাম কি? বললো, 'জামরা' (অংগার)। জিজ্ঞেস করলেন, কোনো গোত্রের অধিবাসী? বললো 'হালকা' (গরম)। জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শাখার? বললো 'বনি জেরাম' (জ্বলন)। জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছো? বললো, 'হোররাতুন নার' (আগুনের গরম থেকে)। জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারপরিজনকে কোথায় রেখে এসেছো? বললো 'লাজায়' (আগুনে উত্তপ্ত জায়গায়)।

উপরোক্ত জবাবগুলো সবই ছিলো আগুনের সাথে সংশ্লিষ্ট। হযরত ওমর (রা.) রসিকতা করে বললেন, আমি আশংকা করছি তোমার পরিবার পরিজন জ্বলে পুড়ে না যায়। লোকটি বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলো তার ঘরের চারদিকে আগুন জ্বলছে। পরিবারের লোকেরা কোনোক্রমে জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

কাব্য চর্চার নীতিমালা প্রণয়ন

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন জাগ্রত বিবেকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি মন্দকে শুরুতেই সমূলে উৎখাতের ব্যবস্থা করতেন। কারণ তিনি জানতেন মন্দকে বাড়তে দিলে সেটা ফেতনা তৈরী করে এবং তার মূলোৎপাটন অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরবের লোকেরা ভাষা শিল্পে উপমা উৎপ্রেক্ষায় ছিলো পারদর্শী। আরব সমাজে কাব্য চর্চার বিশেষ ভূমিকা ছিলো। কবিদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। একজন কবি কবিতার মাধ্যমে অন্য একটি গোত্রের বড় রকমের ক্ষতি করতে সক্ষম হতো। প্রেম ভালোবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে কবিতার ভূমিকা তখনো ছিলো অনস্বীকার্য। একইভাবে কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের বাজার গরম করা যেতো সহজেই। কাব্য চর্চা ছিলো একটি শিল্প। এ শিল্পকে মুক্ত স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হযরত ওমর (রা.) সমীচীন মনে করেননি। এ কারণে কাব্য চর্চার জন্যে তিনি একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন, গোত্রীয় বিবাদ উস্কে দেয়ার মতো কবিতা কেউ লিখতে বা গাইতে পারবে না। কারো নিন্দা বা কুৎসামূলক কবিতা রচনা করা যাবে না। কারণ এতে ঘৃণা জন্ম নেয়। সমাজের জন্যে সেটা হয়ে ওঠে হন্তারক বিষের শামিল। তিনি আনসারদের দোষ বর্ণনা নিষিদ্ধ করেন। কোরায়শ গোত্রের মোশরেকদের নিন্দা রটনাও নিষিদ্ধ করা হয়। আনসাররা ছিলো সকল ক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তারা আল্লাহর নবীকে আশ্রয় দেয়ার গৌরবে ছিলো গৌরবান্বিত। কোরায়শরা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কুফুরী অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করেছিলো তারা তো তাদের পরিণামে পৌঁছে গিয়েছিলো। কুফুরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের নিন্দা কুৎসা কাব্যাকারে প্রকাশ পেলে তাদের জীবিত আত্মীয়স্বজন কষ্ট পায়। জাহেলিয়াতের রোগ শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং মানুষদের জীবনে ইসলাম এক নয়া রং, নয়া গতি দান করেছিলো। কবিতা ও কাব্য হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) কাব্য সাধনাকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করেন। কিন্তু ফেতনা সৃষ্টি এবং মন্দ পরিবেশ তৈরির পথ রুদ্ধ করে দেন। উপদেশ দেয়া সত্ত্বেও যারা তা মানতো না তাদের শাস্তি দেয়ার জন্যে চাবুক ব্যবহার করা হতো। হিতিয়া নামের একজন কবি যবরকানের নিন্দা কুৎসা রটনার পর হযরত ওমর (রা.) তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

কবিতা যদি চারিত্রিক মাঁপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়, নির্লজ্জতা বেহায়াপনা থেকে মুক্ত থাকে তবে সেই কাব্য চর্চায় কোনো ক্ষতি নেই। জাহেলী যুগের কবিদের কবিতাও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানের কথায় পূর্ণ ছিলো। অশালীন এবং বেহায়াপনাপূর্ণ কবিতা না হলে কাব্য চর্চা দোষণীয় ছিলো না। তবে সব সময় কবিতা নিয়ে মেতে থাকতে হবে, অন্য কিছু করা যাবে না এ ধরনের কাব্য চর্চা দোষণীয় মনে করা হতো। কবিতা চর্চা যদি আল্লাহর যেকের, শরীয়তী জ্ঞান অর্জন এবং কোরআন তেলাওয়াতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে সে রকম কবিতার চর্চাও নিন্দনীয়। এছাড়া কবিতা আবৃত্তি করা, কবিতা শোনা, মুখস্থ করা, সময়োপযোগীভাবে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া জায়েয এবং মোবাহ।

কাজা ওমরাহর সফরে ইবনে রওয়াহা (রা.)-এর কবিতা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, সপ্তম হিজরীতে রসূল (স.) কাজা ওমরাহ পালনের জন্যে মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কার প্রবেশপথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) রসূল (স.)-এর সামনে দিয়ে পথ চলতে চলতে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন।

ওহে নাফরমান কাফেররা
আল্লাহর নবীর পথ উন্মুক্ত করে দাও
কোরআনের নির্দেশ মেনে আজ আমরা
তোমাদের মারবো।

এই মার হবে এমনই ভয়ঙ্কর
মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে
বন্ধু তার বন্ধুত্ব ভুলে যাবে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আব্দুল্লাহ! হরম শরীফে এবং রসূল (স.)-এর সামনে তুমি এ কবিতা পাঠ করছো? রসূল (স.) বললেন, ওকে আবৃত্তি করতে দাও। আল্লাহর শপথ ওর কবিতার আঘাত কাফেরদের ওপর আমাদের বর্শার আঘাতের চেয়ে তীব্র ও মারাত্মক।

রসূল (স.)-এর উপস্থিতিতে কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে এবং সে কবিতা তিনি শুনেছেন। ভালো কবিতা শুনে সে কবিতার প্রশংসা করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য পুণ্যবান সালেহীনরাও কবিতা আবৃত্তি করেছেন এবং শুনেছেন। কবিতা এমনিতে খারাপ নয় তবে যে কবিতায় অশ্লীলতা, অশালীনতা এবং খারাবি রয়েছে সে কবিতা নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য।

তওয়াফের সময় কবিতা আবৃত্তি

তোফায়েল ইবনে মালেক বর্ণনা করেন রসূল (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) কাবাঘর তওয়াফ করছিলেন। এ সময় অন্ধ কবি আহমদ ইবনে হাজালের এ কবিতা ছিলো৷ তাদের কণ্ঠে-

মক্কা আর তার জনপদের কথা কি বলবো
ওখানে আমার স্থান আর পরিবার থাকে
ওখানের অলিগলি আমি এমনভাবে চিনি
কোনো পথ দেখানোর প্রয়োজন নেই
আমি নিজেই পথ খুঁজে পাই।

হযরত ওমর (রা.) এবং গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ

ক্ষমতাসীন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে গবর্নর মনোনয়ন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হযরত ওমর (রা.) এ ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আগামীদিনেও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গভর্নর নিয়োগের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) দ্বীন এবং আখলাককে প্রথমে গুরুত্ব দিতেন। এরপর ক্রমাগতভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করতেন। যদি কোনো দায়িত্বশীলের দুর্বলতার কোনো খবর তিনি পেতেন তবে সাথে সাথে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। গবর্নরদের প্রতি নির্দেশ ছিলো তারা যেন তাদের দরবারে ফটকাবাজ এবং অবিশ্বস্তদের জায়গা না দেন। কারণ এর ফলে মানুষের মনে গবর্নরের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে, গবর্নরের কোনো আদেশের গুরুত্ব থাকবে না। গবর্নরদের কর্মপদ্ধতি এবং আচরণ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো, কৈফিয়ত তলব করা হতো। গবর্নর যদি ন্যায়নীতিভিত্তিক আদেশ দিতেন তবে সন্তোষ প্রকাশ করতেন, অন্যথা তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। গবর্নর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে তাদের ভুলের জন্যে সংকোচহীন সমালোচনা করতেন, কখনো কখনো ধমকাতেন। কেননা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে জনগণের কল্যাণ এবং জনগণের স্বার্থ ছিলো সর্বাগ্রগণ্য বিষয়।

গবর্নরদের প্রকাশ্যেই সমালোচনা করা হতো এবং প্রকাশ্যেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতো। কারণ এর ফলে ভবিষ্যতে কেউ সীমালংঘন করার সাহস পাবে না। গভর্নররা শাসন কাজে খারাপ কিছু করলে শুধু শাসন, তিরস্কার বা শাস্তিই ছিলো না। বরং ন্যায়পরায়ণ, মোত্তাকী গবর্নরদের ভালো কাজে তাদের প্রশংসা করা হতো, তাদের পুরস্কার দেয়া হতো। খলীফার দরবারে তাদের বিশেষ মর্যাদার ব্যবস্থা ছিলো। প্রকাশ্যে সমালোচনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও গবর্নরদের কাজের বিরুদ্ধে কোনো গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো না। তাদের অনুপস্থিতিতে কাউকে

তাদের সমালোচনা করার বা দোষ বর্ণনা করার মতো প্রশ্রয় দেয়া হতো না। কোনো গবর্নরের সম্মান নিয়ে কেউ কথা বললে তাকে তিরস্কার করা হতো এবং গবর্নরদের নিন্দা সমালোচনার পথ তিনি নিজেই বন্ধ করে দিতেন। দায়িত্বশীল এবং বিশ্বস্ত লোকদের হযরত ওমর (রা.) গবর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। জনগণের কল্যাণ চিন্তায়ই শুধু এ ব্যবস্থা নেয়া হতো না বরং তিনি চাইতেন সব কাজ যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। তিনি মানুষের কাছে যে রকম কাজ আশা করতেন সে কাজ প্রথমে নিজে করে দেখাতেন। কোনো কাজ করার যোগ্যতা তার নেই এটা জানা ও বোঝার পর হযরত ওমর (রা.) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন, সে কাজ থেকে বিরত থাকতেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি এবং হযরত ওসমান (রা.) প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তার রচিত সীরাতুন নবী গ্রন্থে হোদায়বিয়ার সন্ধি এবং বাইয়াতুর রেজোয়ান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-কে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কোরায়শ নেতাদের সামনে মুসলমানদের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবেন এবং মক্কায় প্রবেশের অনুমতি চাইবেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, অবস্থাটা হচ্ছে মক্কায় আমার খান্দান বনু আদীতে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নেই যারা সেখানে আমাকে সহায়তা করতে পারবে। তাছাড়া ইসলামের প্রতি আমার দ্ব্যর্থহীন ভূমিকার কারণে কোরায়শরা আমাকে ভীষণ ঘৃণা করে। আমি নিজেও কোরায়শদের ভালো চোখে দেখি না। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত ওসমান (রা.)। মক্কায় তার প্রভাব, পরিচিতি ও সম্মান সর্বজনবিদিত।

এখানে লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত ওমর (রা.)-এর যুক্তি এবং প্রস্তাবনা কতো চমৎকার ছিলো। রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব সাথে সাথে সমর্থন করলেন। নিজের সমস্যা অকপটে তুলে ধরা এবং নিজের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি মনোনয়নে তিনি কোনোপ্রকার লজ্জা বা সংকোচ অনুভব করেননি। আমাদের অবস্থা হচ্ছে যে, অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য লোকদের ওপর আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করি। অথচ সেই ব্যক্তি নিজের কাজের সীমা জানে না, কাজের গুরুত্ব বোঝে না। ফলে ব্যর্থতার গ্লানি সইতে হয়। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়, নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে তাহলে এ রকম অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটতে পারবে না, আর মহান আল্লাহর রহমত থেকেও আমরা বঞ্চিত হবো না।

গবর্নরদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাখ্যা

হযরত ওমর (রা.) গবর্নর নিয়োগের সময় তাদের বেতন ভাতা এবং অন্যান্য শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতেন। যে রাজ্যের তিনি গবর্নর সে রাজ্যের সবাই জানতো তাদের গবর্নর কতো বেতন ভাতা পান। হযরত ওমর (রা.) একবার কুফার লোকদের লিখলেন, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে গবর্নর নিযুক্ত করেছি। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) মুয়াল্লিম পদে নিযুক্তি দিয়ে তার সাথে পাঠিয়েছি। ওসমান ইবনে হানিফকে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত করেছি। এদের তিনজনের জন্যে বেতনভাতা হিসেবে দৈনিক একটি বকরি অথবা বকরির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গবর্নর আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) দৈনিক একটি বকরির অর্ধেক অথবা তার মূল্য পাবেন। অন্য দু'জন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ওসমান ইবনে হানিফ (রা.) উক্ত বকরির বাকি অর্ধেক সমভাবে ভাগ করে নেবেন। এছাড়া দায়িত্বে নিযুক্তির সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হতো। তাদের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হতো। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজের অধীনস্থ বিভাগের জন্যে জবাবদিহি করতে হতো। তাছাড়া সব শ্রেণীর মানুষ এটাও জানতো যে, সরকারীভাবে তাদেরকে কি কি সুবিধা দেয়া হবে। এভাবে দায়িত্ব বন্টনের পর রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদ আত্মসাৎ বা অসদুপায় অবলম্বনের চিন্তাও কারো মনে আসতো না।

হযরত ওমর (রা.) আসেম ইবনে গানামকে হেমসে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, তার বেতনভাতা ছিলো দৈনিক এক দেরহাম এবং শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে দুধ দেয় এমন একটি বকরি। হযরত মোয়াবিয়াকে (রা.) সিরিয়ায় গবর্নর নিযুক্ত করার সময় তার বেতন ভাতা হিসেবে বার্ষিক দশ হাজার দিনার নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিটি কাজের পারিশ্রমিক নির্ধারণের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা ও প্রয়োজন ছাড়াও উক্ত এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হতো। হযরত ওমর (রা.) গবর্নরদের নিয়োগপত্র দেয়ার সময় সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নিয়োগপত্রে গবর্নর এবং সাধারণ মানুষের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য বিস্তারিতভাবে লেখা থাকতো। হযরত ওমর (রা.) প্রশাসন পরিচালনায় এতোটা কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করেছিলেন যে, অর্থ বন্টনের সময় গবর্নর নিজে উপস্থিত থেকে প্রতিটি দিনার দিরহামের পুংখানুপুংখ হিসাব নিতেন। কারণ এ বিষয়ে খলীফার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হতো। একবার গনিমতের মাল বন্টনের সময় একজোড়া জুতোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। গবর্নর নিজে একটি জুতো নেন অন্য একজনকে একটি দেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা হাস্যকর বিষয় মনে হতে পারে কিন্তু গবর্নরের দায়িত্বপূর্ণ পদের নাজুকতা এবং জবাবদিহির কঠোর নিয়ম বোঝার জন্যে এটা এক উত্তম উদাহরণ।

গভর্নরের জবাবদিহিতা শুধু সেই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং গবর্নরের আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ লোকদের প্রতিও নযর রাখা হতো। হযরত আবু বাকরা (রা.) একজন সাহাবী ছিলেন। একবার হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, আবু বাকরা (রা.)-এর অর্ধেক ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বায়তুলমালে জমা করা হোক। হযরত আবু বাকরা (রা.) খলীফার এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বললেন হে আমীরুল মোমেনীন, আমি তো কোনো সরকারী দায়িত্ব কখনো পালন করিনি তবু কেন আমার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে? খলীফা বললেন, তোমার কথা ঠিক, কিন্তু তোমার ভাই বায়তুলমালের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত রয়েছে এবং উটের যাকাত আদায়ের দায়িত্বও পালন করছে। সে বায়তুলমাল থেকে তোমাকে ঋণ দিয়েছে সেই ঋণে তুমি ব্যবসা করেছো। কাজেই তোমার ব্যবসার মুনাফার অর্থের মধ্যে বায়তুলমালের হিস্‌সা পাওনা রয়েছে। এমনি করে হযরত ওমর (রা.) আবু বাকরা (রা.)-এর কাছ থেকে দশ হাজার দেরহাম আদায় করেন এবং সেই অর্থ বায়তুলমালে জমা করেন।

এ ধরনের ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন সরকারী কর্মকর্তা কিভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থসম্পদ জমা করতে পারে? এ রকম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার হরণের পরিবর্তে বরং অধিকার প্রদানেই সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত সবাই তৎপর থাকে। সরকার প্রধানের কঠোর নীতিনিষ্ঠার কারণে প্রশাসনে সৎ লোকদের সততা প্রমাণের সুযোগই থাকে অবারিত। অসৎ লোকদের হাতে ক্ষমতা না থাকার কারণে তাদের অসততা থেকে সাধারণ মানুষ সব সময় থাকে নিরাপদ। এটা হচ্ছে কোরআনের ব্যবস্থা। এটা হচ্ছে ইসলামী আইন। এই আইনের মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁকি বা ক্রটি নেই। সকল কালের জন্যে, সকল যুগের জন্যে এই ব্যবস্থা কল্যাণকর। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তাও করা যায় না।

কবিতা রচনায় অসতর্কতায় একজন গবর্নর অপসারিত

একজন ব্যক্তির বহুমুখী যোগ্যতা বিচার করেই হযরত ওমর (রা.) তাকে গবর্নরের দায়িত্ব প্রদান করতেন। যদি কোনো গবর্নরের দুর্বলতা বা কোনোপ্রকার ক্রটিবিচ্যুতি পরিলতি হতো তখনই তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো। কেননা গবর্নর পদ একটি স্পর্শকাতর দায়িত্বশীল পদ। হযরত ওমর (রা.) তার নিজ গোত্রের একমাত্র নোমান ইবনে আদীকে (রা.) গবর্নর নিযুক্ত

করেছিলেন। তিনি মারসান প্রদেশের গবর্নর ছিলেন। তার স্ত্রী ও পরিবার ছিলো মদীনায়। স্ত্রীর কাছে তিনি একখানা মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে তিনি দুই লাইন কবিতা লেখেন। কবিতায় বলা হয়েছিলো-

আমীরুল মোমেনীন শুনে হয়তো নাখোশ হবেন
এক সময় মদীনায় আমরা থাকতাম
আমাদের পুরনো ভিটের পুরনো ঘরে
একসাথে থেকে মদের মাধ্যমে মন ভুলাতাম।

হযরত ওমর (রা.) কিভাবে যেন এ কবিতার খবর পেয়ে গেলেন। তিনি সাথে সাথে নোমান ইবনে আদীকে চিঠি লিখলেন যে, তোমার কবিতার বক্তব্যে আমি দারুণ মর্মাহত হয়েছি। তোমাকে আমি তোমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি।

হযরত নোমান ইবনে আদী (রা.) ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবা। বরখাস্ত আদেশ পাওয়ার পর তিনি মদীনায় এলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করলেন। বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী আছেন, আমি কখনো মদ পান করিনি। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার আবেগে শুধু উপমা হিসেবে কথাগুলো লিখেছিলাম। প্রকৃত পক্ষে মদ পানের অপরাধ আমার দ্বারা কখনো ঘটেনি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। আমারও ধারণা তুমি মদ পান করোনি। কিন্তু তুমি যা লিখেছো, তোমার পদমর্যাদার সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভবিষ্যতে আমি কখনোই তোমাকে কোনো সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত করবো না।

হযরত ওমর (রা.) তার পরিবার এবং গোত্রের লোকদের কোনো সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন না। তিনি ভালোভাবেই জানতেন আত্মীয়স্বজনকে এ রকম দায়িত্ব দেয়া হলে নানারকম দুষ্কর্মের দ্বার খুলে যায়। একটি সুস্থ শাসন ব্যবস্থায় এ ধরনের স্বজনপ্রীতির কোনো সুযোগ নেই। হযরত ওমর (রা.)-এর এ ধরনের মহান উদ্যোগে এবং অনন্য সাধারণ আদর্শের ফলে বোঝা যায়, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ঠাট্টা-মস্করা বা রসিকতায়ও পরিমিতিবোধ থাকা আবশ্যক। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি সীমা লংঘন করতে পারেন না। সীমা লংঘন করা হলে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আচার আচরণ, কথাবার্তা হতে হবে পরিচ্ছন্ন। তাকে দোষমুক্ত জীবনযাপন করতে হবে। কারণ এ রকম হলে জনসাধারণ এবং নিন্দুক সমালোচকরা নিশ্চিন্ত থাকবে এবং শাসকের দোষ খুঁজতে সচেষ্ট হবে না। ইসলামী খেলাফতে যোগ্যতার মূল্যায়ন অবশ্যই করা হতো। তবে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হতো নির্মল চরিত্র, তাকওয়া এবং দ্বীনী মন মানসিকতার ওপর।

হযরত ওমর (রা.) সব সময় আল্লাহর কাছে জবাবদিহির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন। একই সাথে গবর্নরদের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারেও তার আল্লাহভীতি ছিলো সদা জাগ্রত। গবর্নরদের পর্যবেক্ষণকে তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। যে কোনো শাসন ব্যবস্থায় অধীনস্থ আমলারা দুর্নীতি করতে পারে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যাপারে অসতর্ক থাকলে এই দুর্নীতিপরায়ণ মনোভাব চাঙ্গা হবার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ শিথিল মনোভাবের পরিচয় না দিলে দুর্নীতির কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি যলুম অত্যাচার করে সে তো জালেম এবং অত্যাচারী বটে, কিন্তু যারা তার পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং যুলুম-অত্যাচারের সুযোগ করে দেয় তারাও সমান জালিম, সমান অত্যাচারী। পাপের ভাগ তারা সবাই পাবে। কোরআনের সূরা কাসাসে ফেরাউন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিঃসন্দেহে ফেরাউন, হামান এবং উভয়ের বাহিনী সবাই দুষ্কার্যে লিপ্ত ছিলো।'

ফরমানে নববী (স.)

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের এক লোকমা আহার করেছে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দোযখের লোকমা থেকে আহার করাবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের ধনসম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে ফায়দা নিয়েছে এবং সেই ধনসম্পদ ব্যয় করে পোশাক পরিধান করেছে আল্লাহ তায়ালা তাকে দোযখে আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোনো গোপন বিষয়ে (টিকটিকির মতো) লেগে থাকবে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকবেন।

যে ব্যক্তি অহংকার প্রকাশের জন্যে কোনো আমল করে সে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। রসূল (স.) বলেছেন, অন্য লোকদের দেখানোর জন্যে কোনো নেক আমল করা হচ্ছে গোপনীয় শেরেক।

হযরত কোদামা ইবনে মাজউন (রা.)-এর মদ পান প্রসঙ্গ

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে কোনো কোনো গবর্নর শরীয়তের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কেননা কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান যে ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। হযরত ওমর (রা.) কোদামা ইবনে মাজউনকে (রা.) বাহরাইনের গবর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর মামা এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা। বনু কয়েস গোত্রের নেতা জারুদ বাহরাইন থেকে মদীনায় আসেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! কোদামা মদ পান করেছে। তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখা গেছে। আমি মনে করি, তার ওপর শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা দরকার। আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি আপনি তাকে শাস্তি দিন। হযরত ওমর (রা.) জারুদকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে অন্য আরেকজন সাক্ষী কে? জারুদ বললেন, আবু হোরায়রা (রা.)। হযরত ওমর (রা.) আবু হোরায়রাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোদামার মদপান সম্পর্কে সাক্ষী দিচ্ছ? হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বললেন, আমি কোদামাকে মদপান করতে দেখিনি তবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখেছি। তিনি বমি করছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর তিনি কোদামাকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। কোদামা মদীনায় আসার পর জারুদ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন কোদামাকে শাস্তি দিন। হযরত ওমর (রা.) জারুদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বাদী নাকি সাক্ষী? জারুদ বললেন, সাক্ষী। হযরত ওমর (রা.) বললেন যদি সাক্ষী হয়ে থাকো তবে সাক্ষ্য তো দিয়েছো। একথা শুনে জারুদ চুপ করে থাকলেন। পরদিন পুনরায় জারুদ কোদামার ওপর শাস্তি প্রয়োগের আবেদন জানালেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমিতো বাদী আর তোমার সাথে একজনই সাক্ষী রয়েছে। জারুদ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনাকে আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি কোদামার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। আপনি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি মুখবন্ধ করো, অন্যথায় আমি তোমাকেই শাস্তি দেবো। জারুদ বললেন, হে ওমর! এটা কোনো ইনসাফের কথা নয়। তোমার চাচাতো ভাই মদপান করেছে অথচ তুমি আমাকে শাস্তি দেবে না? হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমার সাক্ষ্যদানে যদি আপনার সন্দেহ থাকে তবে আপনি কোদামার স্ত্রী বিনতে ওলীদকে খবর দিয়ে আনুন এবং তাকে জিজ্ঞেস করুন।

হযরত ওমর (রা.) কোদামার (রা.) স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওলীদকে মদীনায় আনালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। হিন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে মদপানের সাক্ষী দিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন,

এবার আমি কোদামা (রা.)-এর ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর করবো। হযরত কোদামা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি আমার ওপর শাস্তি কার্যকর করতে পারবেন না। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্যে তাদের কোনো পাপ নাই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ তায়ালা সৎ কর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ৯৩)

কোদামার (রা.) যুক্তি শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কোরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছো। যদি তুমি তাকওয়ার অনুসারী হতে তবে আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে দূরে থাকতে। হযরত ওমর (রা.) কোদামার ওপর শরীয়তী শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে সাহাবাদের পরামর্শ চাইলেন। তারা বললেন, কোদামা অসুস্থ। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার শাস্তি দান মুলতবী রাখা হোক। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) কিছুদিন চুপ করে রইলেন। কোদামা (রা.) সুস্থ হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) তাকে শাস্তি দেয়ার কথা চিন্তা করলেন। লোকেরা বললো, কোদামা এখনো দুর্বল, তার দুর্বলতা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত শাস্তি মুলতবী রাখা হোক। হযরত ওমর (রা.) ভৃত্যকে বললেন, চাবুক লও। তারপর নিজ হাতে কোদামাকে শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তি দিলেন। তারপর বললেন, এই চাবুকের নীচে কোদামার প্রাণ চলে যাওয়া আমি এর চেয়ে পছন্দ করি যে, আল্লাহর দরবারে আমি উপস্থিত হওয়ার সময় কোদামার অপরাধ আমার ঘাড়ে থাকবে।

এই ঘটনার পর কোদামা (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। হজ্জের সময় কোদামা (রা.) হজ্জ পালন করতে গেলেন, আমীরুল মোমেনীনও হজ্জ করতে গেলেন। হজ্জ শেষে মদীনায় ফেরার পথে ছাকিয়া নামক জায়গায় তাঁবু খাটানো হলো। হযরত ওমর (রা.) ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি বললেন, কোদামাকে আমার কাছে উপস্থিত করো। আল্লাহর কসম, ঘুমের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কে যেন এসেছে। সে বলেছে, কোদামার সাথে মীমাংসা করে নাও, কারণ সে তোমার ভাই। তাড়াতাড়ি কোদামাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকজন কোদামার (রা.) কাছে হাযির হলে কোদামা আমীরুল মোমেনীনের কাছে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত ওমর (রা.) একথা জেনে বললেন, কোদামাকে টেনে নিয়ে এসো। কোদামা (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে এলেন। হযরত ওমর (রা.) তার সাথে কথা বললেন এবং তার মনের রাগ দূর করলেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত কোদামা (রা.)-এর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রা.)-এর ঈমান উজ্জীবনকারী ঘটনা

হযরত ওমর (রা.) তার কঠোর নীতির কারণে অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলাফেরা করতেন। কিন্তু যারা প্রশংসনীয় কাজ করতো তিনি তাদের পূর্ণ মর্যাদা দিতেন। তার চরিত্রে কঠোরতা, কোমলতার সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) রোমকদের মোকাবেলায় একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। সেই সেনাদলে আব্দুল্লাহ ইবনে হোযাফাও ছিলেন। এক যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ এবং অন্যান্য সাহাবা রোমকদের হাতে গ্রেফতার হন। তাদেরকে রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে উপস্থিত করা হয়। রোম সম্রাট আব্দুল্লাহ ইবনে হোযাফাকে বললেন, তুমি খৃষ্টান হয়ে যাও। আমি তোমাকে আমার শাসন ক্ষমতার অংশীদার করে নেবো। কিন্তু আবদুল্লাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে রোম সম্রাট আবদুল্লাহকে ফাঁসী দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ফাঁসীকাষ্ঠে তোলার পর আবদুল্লাহর প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু তিনি এতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সম্রাটের নির্দেশে আবদুল্লাহকে ফাঁসীর মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনা হলো। তারপর বিরাট এক ডেকচিতে ফুটন্ত

গরম পানি আনা হলো। সেই পানিতে একজন কারাবন্দীকে নিক্ষেপ করা হলো। মুহূর্তে বন্দীর হাড় গোশত আলাদা হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ এ দৃশ্য নির্বিকারভাবে দেখছিলেন।

সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, আবদুল্লাহ যদি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ না করে তবে তাকে বন্দীর মতো ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-কে ফুটন্ত পানির ডেকচির দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। রোম সম্রাট কায়সার বললেন, আবদুল্লাহকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সম্রাটের সামনে আনা হলে তিনি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদলে কেন? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছো? আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এজন্যে যে, যদি আমার একশটি প্রাণ থাকতো তবে একটি একটি করে সবগুলো প্রাণ আমি আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতাম। কিন্তু আমার তো মাত্র একটিই প্রাণ সেই প্রাণটিই আমি আল্লাহর পথে উৎসর্গ করছি।

রোম সম্রাট একথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি আমার মাথায় যদি চুম্বন করো তবে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আবদুল্লাহ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাথায় চুম্বন করলে তুমি কি সব মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দেবে? সম্রাট বললেন, হাঁ। তাই দেবো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রা.) উঠে সম্রাটের মাথায় চুম্বন করলেন। সম্রাট সকল মুসলিম বন্দীদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। এখবর মদীনায় পৌঁছে গেলো। আবদুল্লাহ মদীনায় পৌঁছার পর আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) বললেন, সকল মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে আবদুল্লাহর মাথায় চুম্বন করা। আমি প্রথমে শুরু করছি। একথা বলে হযরত ওমর (রা.) সামনে এগিয়ে আবদুল্লাহর মাথায় চুম্বন করলেন।

সাহাবায়ে কেরাম মাঝে মাঝে আবদুল্লাহকে ঠাট্টা করে বলতেন, তুমি খৃষ্টান সম্রাটের মাথায় চুম্বন করেছো। তিনি জবাবে বলতেন, একটি চুম্বনের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আশিজন মুসলমানের জীবন রক্ষা করেছেন।

যিয়াদ ইবনে ছামিয়া (রা.)-এর অপসারণ

উপরোক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমর (রা.) মানুষের মূল্য দিতে জানতেন। আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন বীর যোদ্ধার জন্যে এ ধরনের মূল্যায়ন বস্তুগত পুরস্কার, পদক, পদবীর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। হযরত ওমর (রা.) তার সঙ্গী সাথী এবং অধীনস্তদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পন্ন করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) পদমর্যাদার চেয়ে সুনাম সুখ্যাতিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ পছন্দ করতেন। যিয়াদ ইবনে ছামিয়া হযরত মুগিরা ইবনে শোবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মুগিরার (রা.) নামে দেয়া অপবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। ফলে হযরত ওমর (রা.) যিয়াদকে তার পদ থেকে অপসারণ করলেন এবং হযরত মুগিরা (রা.)-কে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিলেন। যিয়াদ দায়িত্ব পালন করার সময় প্রশংসনীয় বহু কাজ করেছিলেন। এ কারণে তিনি চিন্তা করলেন, তার বরখাস্ত হওয়ার ঘটনায় জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে তিনি এ আশংকার কথা ব্যক্ত করলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তো তোমাকে দুর্নীতি বা অসদাচরণের জন্যে বরখাস্ত করিনি।

হযরত শরহাবিল ইবনে হাসানা (রা.)

সিরিয়ার ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালারদের মধ্যে হযরত শরহাবিল ইবনে হাসানা (রা.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত সেনানায়ক। হযরত ওমর (রা.) তাকে বরখাস্ত করে তার স্থলে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে নিয়োগ করেন। হযরত শরহাবিল জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল

মোমেনীন, আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে আমাকে বরখাস্ত করেছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, না, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নই। তুমি আমার পছন্দনীয় লোকদের অন্যতম। কিন্তু আমি তোমার পদে অধিক শক্তিশালী কাউকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলাম। হযরত শরহাবিল (রা.) বললেন, মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে, কাজেই আপনি যে কথা বলেছেন সেকথা সাধারণ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছি। হযরত ওমর (রা.) সে রকম ব্যবস্থা করলেন। হযরত শরহাবিল (রা.) নিশ্চিত হলেন যে, তার সুনাম সুখ্যাতির কোনো ক্ষতি হবে না।

গভর্নরদের সাথে হযরত ওমর (রা.) সলা-পরামর্শ করতেন। তাদের সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করতেন, ভুল পরামর্শ যুক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতেন। এতে করে গবর্নরদের সবাই মনে করতো যে, তারা খলীফার অধীনস্থ কর্মচারী নয় বরং তারাও সরকারের অংশ। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাদের বক্তব্য শোনা হয় এবং প্রয়োজনে সংশোধন ও শোধরানোর দায়িত্বও আমীরুল মোমেনীন পালন করেন।

সাঈদ ইবনে আমের (রা.)

হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান মোত্তাকী সাহাবী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে হযরত ওমর (রা.) কে নসিহত করতেন। একবার তিনি নসিহত করলে হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ কিভাবে হতে পারে? তিনি বললেন আমীরুল মোমেনীন, আপনার জন্যে কি অসম্ভব বলে কিছু আছে? আপনি শুধু আদেশ দিবেন, মানুষ সে আদেশ পালন করবে।

হযরত ওমর (রা.) সাঈদ ইবনে আমেরকে সিরিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত ওমর (রা.) একবার খবর পেলেন যে, হযরত সাঈদ (রা.) রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সে রোগের প্রকোপে তিনি হঠাৎ করে বেহুঁশ হয়ে যান। কেউ কেউ বললেন, এটা মৃগী রোগ। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত এবং দুর্বল হবেন, এটা হযরত ওমর (রা.)-এর পছন্দ ছিলো না। সাঈদ ইবনে আমের (রা.)-কে তিনি ভালোভাবেই জানতেন। তবু অবস্থার সঠিক পর্যালোচনার জন্যে সাঈদকে মদীনায় আসতে বললেন। হযরত সাঈদ (রা.) ছিলেন এবাদাতগুযারী এবং সাধক পুরুষ। পার্থিব দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি তার আকর্ষণ ছিলো না। মদীনায় আসার পর দেখা গেলো তার কাছে একটি পেয়ালা একখানি চাদর রয়েছে। এছাড়া একটি কাপড়ের থলের ভেতর কিছু প্রয়োজনীয় পাথেয় রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি শুধু এ জিনিসই রয়েছে? তিনি জবাবে বললেন, এর চেয়ে বেশী জিনিস কি দরকার? পেয়ালা আছে, এতে পানি পান করি। চাদর আছে এটি গায়ে দিই, আবার বিছিয়ে শুই। এই থলের মধ্যে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। এসব জিনিস কি কম?

অসুখের কথা জিজ্ঞেস করায় সাঈদ (রা.) বললেন, আমীরুল মোমেনীন, আমার কোনো অসুখ নেই। কোরায়শদের ভরা মজলিসে হযরত খোবায়েব ইবনে আদী (রা.)-কে যেসময় ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো, সে সময় আমিও সেখানে ছিলাম। তিনি শত্রুদের জন্যে বদদোয়া করেছিলেন। সেই দৃশ্যের কথা চোখের সামনে ভেসে উঠলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যাও নিজের দায়িত্ব পালন করোগে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত সাঈদ হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে দায়িত্ব পালন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে খলীফা তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের কাছে ভালো কিছু আশা করা বৃথা

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলের এসব ঘটনার সাথে বর্তমান কালের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকদের তুলনা করলে আমরা কি দেখতে পাই? বর্তমানে শাসকদের দায়িত্বানুভূতিও নেই,

আল্লাহভীতিও নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না এবং আখেরাতে জবাবদিহির ওপর বিশ্বাস করে না, তার কাছ থেকে কি কোনো প্রকার কল্যাণ আশা করা যায়? মদ্যপ, দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করছে সেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে ভালো কিছু কি করে আশা করা যায়? আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়া-কৌতুকে যারা লিপ্ত, যারা নারীদের নিয়ে মেতে থাকে এবং যদি দেশশাসনের দায়িত্ব পায় তবে তারা কিভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থার খবর নেবে? যেসব শাসক জুয়াখেলায় অভ্যস্ত তাদের হাতে জনগণের ধনসম্পদের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে?

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা শয়তানী প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে তারা তো সদা তৎপর। মানসিক হীনমন্যতা, চিন্তার নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করবে না। একটি নতুন ফেতনা হচ্ছে এটা যে, শাসক যদি শাসন কাজে দাতার পরিচয় দিতে পারেন তবে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার কি দরকার? আপাতদৃষ্টিতে কথাটা শুনতে ভালোই মনে হয়। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে গভীর বিপদের আশংকা। চারিত্রিক রোগ শারীরিক রোগের চেয়ে অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক। একটি রোগ যেমন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে আরেকটি রোগের জন্ম দেয়, তেমনি চারিত্রিক দোষও মানুষের সকল সুকৃতি বিনষ্ট করে ফেলে। ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, চরিত্রবান একজন মানুষই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সততা ও ন্যায়নীতির প্রকাশ ঘটাতে পারে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। হযরত ওমর (রা.) একজন গবর্নরকে মদের উল্লেখ করে কবিতা লেখার অপরাধে বরখাস্ত করেছিলেন। অথচ খলীফা নিজেও জানতেন যে, উক্ত গবর্নর মদ নিজে পান করেন না, কাউকে পান করাতেও অভ্যস্ত নন।

পাশ্চাত্যের চারিত্রিক অবস্থা

পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজের সভ্যতা নিয়ে বিশেষ গর্ব করে। মুসলমানরাও তাদের অনুসরণ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের চারিত্রিক অবস্থা কি রকম? সেটাতো কারো অজানা নয়। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে পাশ্চাত্য বিশ্বের দায়িত্বশীল নেতাদের কর্মকান্ডের খবর সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৭শে অক্টোবর সংখ্যায় আল আহরাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সহকারী অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার গিনোভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের যদি কিছু হয়ে যায় তবে ভাইস প্রেসিডেন্টই ক্ষমতা গ্রহণ করবেন অথচ তিনিই দুর্নীতিবাজ।

আল আহরাম পত্রিকায় ১৯৭৩ সালের ১১ই অক্টোবর সংখ্যায় লেখা হয়েছে, গিলোভার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি, প্রতারণা এবং দুর্নীতির কয়েকটি অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। আদালত তাকে তিন বছরের কারাদন্ড এবং দশ হাজার ডলার জরিমানার শাস্তি প্রদান করেছে।

বৃটেনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকান্ডের ওপর আল আহরাম ৭ই অক্টোবর সংখ্যায় একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টের মূলকথা হচ্ছে, সরকারের সাতজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে চারিত্রিক অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ আদালতের সামনে পেশ করেছে। তার নাম পরিচয় এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিবরণও সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। অন্য অফিসারের স্ত্রীদের সাথে এদের অবৈধ সম্পর্কের বিবরণও প্রকাশ করা হয়েছে। আদালতের বিবরণে বলা হয়েছে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন উপেক্ষা করার মতো নয়। কারণ তাদের কাজের কারণে প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট জনগণ প্রভাবিত হয়। বর্তমান যুগে ঘুষ, দুর্নীতি সার্বজনীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সাধারণ কর্মচারীরাও ঘুষ ছাড়া কাজ করতে চায় না। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির ব্যাপকতা দেখে অবাক হতে হয়। শাসক শ্রেণীর দুর্নীতি এবং অপকর্মের খবর প্রায়ই গোপন থাকে। মাঝে মধ্যে ছিটেফোটা খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

আল আহরাম পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী সংখ্যায় লেবাননের সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল আম্মাদ বাসতানির ওপর রঙিন কালিতে মোটা অক্ষরে প্রধান শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে যে, তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং চৌদ্দ লাখ ষাট হাজার পাউন্ড স্টার্লিং জরিমানা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তিনি ফ্রান্সের একটি কোম্পানীর কাছ থেকে মহাশূন্যে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ে মোটা অংকের ঘুষ নিয়েছেন। কোরাতাল নামের এ ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ে দুর্নীতির কারণে সংবাদপত্রসমূহ উক্ত বিষয়টিকে কোরাতাল স্ক্যান্ডাল বলে উল্লেখ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যারা অসৎ তারা তো দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে সামাজিক জীবনে এ ধরনের অসততারই প্রমাণ দেবে।

১৯৭৩ সালের ১৩ই জুলাই সংখ্যায় আল আহরামে প্রকাশিত হয়েছে আরো একটি কেলেংকারির খবর। বৃটেনের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কমিটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী লর্ড লানটুনকে অভিযুক্ত করেছে। উক্ত মন্ত্রী নেশায় অভ্যস্ত এবং যৌন কেলেংকারিতে জড়িত। তার বেলেল্লাপনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিটি এ সন্দেহও প্রকাশ করেছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন।

বৃটিশজাতি তাদের দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের জন্যে সুপরিচিত। সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কতো হীন, কতো ঘৃণ্য কাজে নিজেকে জড়িত করেছেন। সমগ্র জাতি এতে থমকে গেছে। প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মেধাভিত্তিক মূল্যায়নে একজন মানুষকে মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। চারিত্রিক ভালোমন্দের বিষয়টি কোনোই গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এক সময় ঘটতে থাকে অনাকাংখিত সব ঘটনা।

এ ক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাও নিজেদের সাবেক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছেন। তারা এখন বলছেন, সততা, ন্যায়নীতি, আমানতদারি, চারিত্রিক শক্তি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। মানব জীবনের মূল বিষয়ই হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মানুষের চরিত্রশক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু অন্যের গোপনীয় বিষয়ে অনুসন্ধানকে অপছন্দনীয় বিষয় বলে অভিহিত করেছে। চরিত্র যদি পরিশুদ্ধ এবং নির্মল হয় তবে গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজনই থাকে না।

হযরত ওমর (রা.) জনগণের কাজের গুরুত্ব দিতেন এবং সে কাজের জন্যে দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিচরিত্রের দৃঢ়তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। তার মনোনীত গবর্নররা হযরত ওমর (রা.)-এর চারিত্রিক শক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এটা কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা প্রদর্শনবাদিতার কারণে নয় বরং এসব গবর্নর ঈমান ও এখলাছের ধনে এমনিতেই ধনী ছিলেন।

হেমস প্রদেশ সফরের সময় হযরত ওমর (রা.) গভর্ণরের কাছে জনসাধারণের অবস্থার কথা জানতে চান। তারপর সে দেশের গরীব মেসকিনদের একটি তালিকা তৈরির জন্যে গবর্নরকে নির্দেশ দেন। সাঈদ ইবনে আমের (রা.) তখন ছিলেন হেমস-এর গভর্নর। তালিকা তৈরির পর লক্ষ্য করা গেলো যে, তালিকায় প্রথম দিকেই রয়েছে সাঈদ ইবনে আমর (রা.)-এর নাম। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এই সাঈদ ইবনে আমের কে? তাকে জানানো হলো যে, ইনি আমাদের গবর্নর। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমাদের গবর্নর কি এতোই দরিদ্র যে, মেসকিনদের তালিকায় তার নাম স্থান পায়? সহকর্মীরা জানালো, জ্বী হাঁ, হে আমীরুল মোমেনীন। তিনি কোনো বেতনভাতা নেন না, রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদের কিছুই নিজের কাছে রাখেন না।

সাঈদ ইবনে আমের (রা.)-এর তাকওয়া

হযরত ওমর (রা.) সাঈদ ইবনে আমের (রা.)-এর তাকওয়া এবং পরহেযগারি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। গরীব মেসকিনদের তালিকায় তার গবর্নরদের নাম রয়েছে দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর একটি থলের ভেতর এক হাজার দিনার রেখে হযরত সাঈদ (রা.)-এর বাসায় দূত মারফত পাঠিয়ে দিলেন। হযরত সাঈদ থলে খুলে দিনার দেখে বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমীরুল মোমেনীনের কোনো খারাপ খবর আছে নাকি? সাঈদ বললেন, তার চেয়ে গুরুতর ব্যাপার। স্ত্রী বললেন, কোনো অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে বুঝি? হযরত সাঈদ বললেন, এর চেয়ে বড় বিষয়। স্ত্রী বললেন, কেয়ামতের কোনো আলামত কি প্রকাশ পেয়েছে? সাঈদ বললেন, তার চেয়ে বড়ো ব্যাপার। স্ত্রী বললেন, কি হয়েছে খুলে বললেই পারেন। হযরত সাঈদ বললেন, ফেতনা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে। দুনিয়া আমার দিকে ছুটে আসছে। এরপর সব কথা ব্যক্ত করলেন। স্ত্রী বললেন ভালোই হয়েছে। এই দিনার দিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে পারবো।

হযরত সাঈদ (রা.) দিনার হাতের তালুতে নিয়ে টশকি মারলেন। কিছুক্ষণ দিনারের প্রতি বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর থলের ভেতর ঢুকিয়ে ঘরের এককোণে রেখে দিলেন। সকালে একদল মুসলমানের মধ্যে সেই দিনার বিতরণ করে দিলেন। স্ত্রী এ খবর জেনে স্বামীকে বললেন, আপনি যদি কিছু দিনার রেখে দিতেন তবে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে পারতাম। হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.) বললেন, রসূল (স.)-এর কাছে আমি এ হাদীস শুনেছি যে, বেহেশতের একজন হূর যদি দুনিয়ায় আসে তবে সমগ্র বিশ্বজগত সেই হূরের সুবাসে সুবাসিত হয়ে উঠবে। আমি দুনিয়ার মোকাবেলায় জান্নাতকে প্রাধান্য দিচ্ছি।

হযরত ওমর (রা.) তার শাসনাধীন প্রদেশসমূহের দুখীদরিদ্র গরীব মেসকিনদের খবর নিতেন। ওপরে উল্লেখিত ঘটনায় একদিকে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বানুভূতির কথা জানা যায় অন্যদিকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে. একজন মোমেন বান্দা দারিদ্র্যের কষ্টের চেয়ে ধনদৌলতকে বেশী ভয় পায়। দেরহাম দিনারের পেছনে ছোটার পরিবর্তে তারা ওসব থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করে। এসব ঘটনা আমি এ কারণেই উল্লেখ করছি, যাতে প্রতিটি মুসলমান এসব ঘটনা থেকে অনুসরণযোগ্য শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়।

হে মুসলমানেরা! তোমরা কোরআন সুন্নাহ এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবান মানুষদের নেক আমলের প্রতি মনোযোগী হও। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে কোরআনসুন্নাহ এবং মুসলিম মনীষীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করো, জীবনকে সেই ছাঁচে ঢালাই করো। ফাসেক মতাদর্শ এবং বিপজ্জনক চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে।

আমিনুল উম্মত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)

হযরত ওমর (রা.) একবার সিরিয়া সফরে গেলেন। সেখানে সেনাবাহিনীর সকল কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু প্রধান সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) উপস্থিত হননি। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই আবু ওবায়দা কোথায়? তাকে বলা হলো, তিনি এখনই আসবেন। কিছুক্ষণ পর হাওদাবিহীন অবস্থায় একটি উটের খালি পিঠে বসে আবু ওবায়দা (রা.) এসে হাযির হলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি আমীরুল মোমেনীনকে তার বাসায় দাওয়াত দিলেন। হযরত ওমর (রা.) রাযি হলেন। আবু ওবায়দার (রা.) বাসায় যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন, আবু ওবায়দার ঘরে তলোয়ার, বর্শা, টার্কিশ

এবং বর্ম ছাড়া অন্য কিছু নেই। হযরত ওমর (রা.) অবাক হয়ে বললেন, দৈনন্দিন জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তো আপনি রাখতে পারেন।

আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমার যেসব জিনিস প্রয়োজন সেসব জিনিস আমার কাছে রয়েছে। আমার তো যা আছে এগুলোই কাজে লাগে। দুনিয়ার সাজ সরঞ্জামতো জীবনে চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

হযরত আবু ওবায়দার (রা.) মধ্যে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিলো না। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের আগমন উপলক্ষে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকে উপস্থিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করেননি। তিনি অন্য জরুরী সরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) এতে কিছুমাত্র বিরক্ত হননি। ফলে আবু ওবায়দাকেও কোনোপ্রকার কৈফিয়ত দিতে হয়নি। আবু ওবায়দা ঘরোয়া জীবনেও সরলসহজ, সাদামাটা নির্বিলাস সময় কাটাতেন। তার উটনীর লাগাম ছিলো গাছের বাকলের তৈরি রশিতে প্রস্তুত। এ রকমের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন সত্ত্বেও দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদের মোকাবেলা করতে পারেনি। একনায়ক বা ডিক্টেটরশীপের কারণে মানুষ ভয় পেতে পারে, ভয়ে কৃত্রিমভাবে কাজকর্মে মনোযোগ দিতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়া সত্যিকার দায়িত্বশীলতা সম্ভব নয়, সত্যিকার চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়।

সৈনিকের আত্মসম্মানবোধ

গবর্নরদের নামে মদীনায় বসে হযরত ওমর (রা.) যেসব নির্দেশ প্রদান করতেন, দূরদুরান্ত এলাকায় সেসব নির্দেশ যথাযথ পালিত হতো। তার আদেশ লংঘন করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। জনগণের কল্যাণ এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর সব সময়ের প্রচেষ্টা। আবু ওসমান (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রা.) ওতবা ইবনে ফারকাদের নামে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটির সারমর্ম নিম্নরূপ। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের যে ধনসম্পদ দান করেছেন এসব তোমার নয়, তোমার মায়েরও নয়। তুমি যেভাবে আহার করো ঠিক সেভাবে প্রত্যেক সৈনিকের তাঁবুতে এবং প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ভালো খাবার পৌছাতে হবে। সে সময় ওতবা ইবনে ফারকাদ ছিলেন আজারবাইজানের গবর্নর।

সামরিক বাহিনীর লোক এবং সাধারণ মানুষের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকানোর চেয়ে নিজের ঘরে বসে নিজ নিজ অংশ উসুল করার মধ্যে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়- সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এরূপ অবস্থায় সামরিক বাহিনীর লোকদের প্রতি প্রথাগত লোক দেখানো শ্রদ্ধা না করে মানুষ অন্তরের গভীর থেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এদের কীর্তি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে।

গোয়েন্দা ব্যবস্থা

হযরত ওমর (রা.)-এর দূরদর্শিতা, মেধা, প্রশাসনিক দাতার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। শাসন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্যে হযরত ওমর (রা.) চমৎকারভাবে গোয়েন্দা বাহি-নী গঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সংস্থা দূরদূরান্তের প্রদেশসমূহের সত্যিকার অবস্থা জেনে দ্রুত খলীফাকে জানাতেন। এ সংস্থার প্রতি খলীফা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। হযরত ওমর (রা.) এ আদর্শে বিশ্বাস করতেন যে, অসুখ বাধিয়ে সুস্থ করার চেষ্টার চেয়ে অসুখ যেন না হয় সে চেষ্টাই উত্তম। গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমা। কোনো গবর্নর সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেলে খলীফার নির্দেশে মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমা সেই প্রদেশে যেতেন। তিনি খলীফার নির্দেশে কয়েকজন গবর্নরের অর্থসম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এবং কয়েকজন গবর্নরের বাসগৃহ ভস্মীভূত করেছিলেন। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাজ করার দায়িত্ব নেয় তারপর মানুষ এবং নিজের মধ্যে দূরত্বের দেয়াল তৈরি করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমত থেকে সে ব্যক্তিকে দূরে রাখবেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে কুফার গবর্নর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের বাসগৃহ আগুনে ভস্মীভূত করা হয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) তার গবর্নরদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলেও তাদের কল্যাণের জন্যেই করতেন। গবর্নরদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। নানারকম যোগ্যতায় হযরত ওমর (রা.)-এর পছন্দনীয় ব্যক্তিরাই গবর্নর হওয়ার সুযোগ পেতেন। হযরত ওমর (রা.) তাদের ভালোবাসতেন বলেই কেয়ামতের দিনে তারা বিপদে পড়ুক তা চাইতেন না। উপরের হাদীস থেকে বোঝা যায়, হযরত ওমর (রা.) চাইতেন না যে, কেয়ামতের দিন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুন। সা'দ (রা.) মহল তৈরী করে জনগণ থেকে দূরে থাকার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন।

মযলুমের ফরিয়াদে সাড়া দেয়া শাসকের প্রথম দায়িত্ব

মযলুমের ফরিয়াদে সাড়া দেয়া শাসকের প্রথম দায়িত্ব। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) মযলুম বা অত্যাচারিত এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব সৃষ্টি হতে দিতেন না। বর্তমান কালে মযলু-মরা দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সুবিচার পায় না। তাদের ফরিয়াদ শোনার মতো যেন কেউ নেই। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বিচারপ্রার্থী বা ফরিয়াদীর ন্যায় বিচার পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টির সাহস কোনো গবর্নরের ছিলো না। তদারকি কর্মকর্তা বা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কোনো কাজেও কেউ বাধা সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলো না।

হযরত ওমর (রা.) মানুষ চিনতেন। সিরিয়া সফরের সময় আমীর মোয়াবিয়াকে দেখে বললেন, তুমিতো আরবের কিসরা। আমীর মোয়াবিয়ার শান শওকত দেখে তিনি একথা বলেছিলেন। তিনি একজন মুসলিম শাসকের আড়ম্বর দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমীর মোয়াবিয়া যুক্তি দেখালেন, হে আমীরুল মোমেনীন, এমন জায়গায় আমি থাকি যেখানে শত্রুদের গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে। ইসলাম মানে শুধু দারিদ্র্য নয়, শুধু গরীবী নয় এটা ইসলামের শত্রুদের বোঝানোর জন্যেই আমি শানশওকতের ব্যবস্থা করেছি। কঠোর সংযম সাধনার মধ্যে দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন যাপনও আমি করতে সক্ষম। আপনি যদি চান তবে আমি বর্তমান জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করবো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমাকে আদেশও দেবো না, নিষেধও করবো না, তুমি নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

যিম্মিদের অধিকার রক্ষায় হযরত ওমর (রা.) সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে যিম্মিরাও নিয়োগ লাভ করতো। যোগ্যতা অনুযায়ী পদমর্যাদায় যিম্মিদের নিয়োগ করা হতো। রসূল (স.) তার হিযরতের সফরে একজন কাফেরের কাছ থেকে পথ চেনার উপকার গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) অর্থ ও হিসাব বিভাগে কয়েকজন যিম্মিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হারেস ইবনে কালদাহ ছিলেন অমুসলিম, কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যায় তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) অসুখের সময় তাকে নিজের চিকিৎসার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন।

নাগরিক অধিকার

বিশ্বের যে কোনো এলাকার ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাসের অধিকার যদিও ইসলাম দিয়েছে কিন্তু হারামাইন শরীফাইনের সীমানায় কোনো অমুসলিমের প্রবেশাধিকার নেই। ইসলাম এটাকে নাজায়েয ঘোষণা করেছে। এটা আল্লাহর আদেশ এবং এর মধ্যে যথেষ্ট হেকমত রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এমন কিছু সংরক্ষিত স্থান থাকে যেখানে সবাই প্রবেশ করতে পারে না। সংরক্ষিত প্রবেশাধিকারের সেই এলাকায় প্রবেশের জন্যে কিছু শর্ত থাকে। হারামাইন শরীফাইনে প্রবেশের জন্যে শর্ত হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমান হয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

রোম সম্রাট কায়সারের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর পত্র বিনিময়

রোম সম্রাট কায়সার একবার হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, দূতদের মাধ্যমে আমি খবর পেয়েছি আপনাদের দেশে এক প্রকার গাছ রয়েছে, সেই গাছের রয়েছে বহুগুণ।

মাটি থেকে সেই গাছ উদ্‌গত হওয়ার সময় সেই গাছ থাকে গাধার কানের মতো। তারপর সেটি মুক্তার মতো ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গার পরে জামরুদের মতো সবুজ হয়ে যায়। তারপর লাল ইয়াকুতের মতো তার রঙ চমকাতে থাকে। তারপর সেটি পেকে যায় এবং মিষ্টি ও সুস্বাদু হয়। তারপর শুকিয়ে যায় এবং মুকিমের জন্যে খাদ্যদ্রব্য, মোসাফেরের জন্যে পাথেয় হয়ে ওঠে। দূতদের দেয়া তথ্য যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আমার ধারণা, এটি জান্নাতের কোনো বৃক্ষ।

হযরত ওমর (রা.) রোম সম্রাট কায়সারের চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, আপনার দূতদের দেয়া তথ্য নির্ভুল। প্রকৃতপক্ষে এ বৃক্ষ আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সময় তার মা মরিয়ম (আ.)-এর মাথার ওপর এই বৃক্ষ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ছায়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে আল্লাহ তায়ালা এ বৃক্ষ তৈরী করেছেন আপনি তাকে ভয় করুন। তিনিই এ বৃক্ষের স্রষ্টা। তিনি ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে আমি চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি আল্লাহর একত্বের তথা তাওহীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করুন, ঈসাকে ইলাহ মানবেন না।

হযরত ওমর (রা.)-এর এ চিঠির মধ্যে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, দ্বীনের দাঈ সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন এবং পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী দাওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

খেলাফতের মহান দায়িত্ব

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে অনেক কথাই আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। কিন্তু তার সীরাতের পরিচয় পরিপূর্ণ তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত ওমর (রা.) যা কিছু করেছিলেন সেটা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব ছিলো। অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হতো না। তিনি মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণের জন্যে এমন অবিস্মরণীয় ব্যবস্থা করেছেন যা মানব ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। এমন বহুমুখী খেদমত সত্ত্বেও তিনি বিনীতভাবে প্রায়ই বলতেন, খেলাফতের এই মহান দায়িত্ব যদি আমার ওপর অর্পণ না করা হতো! কখনো কখনো তাকে বলতে শোনা গেছে, হায় আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন! আহকামুল হাকেমিনের সামনে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কথা ভেবে হযরত ওমর (রা.) ভয়ে কেঁপে উঠতেন। একবার তিনি বললেন, খেলাফতের দায়িত্ব বহন করা আমার জন্যে এতো কঠিন মনে হয় যে, এর চেয়ে কেউ যদি আমার শিরচ্ছেদ করতো সেটাও সহনীয় হতো। শাহাদাতের সময় হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, আমার পরে যিনি খলীফা হবেন তিনি জেনে রাখুন খেলাফতের এই কাজে কঠোরতা দরকার। তবে সেই কঠোরতা যেন নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া কোমলতার দরকার, কিন্তু সেই কোমলতা যেন দুর্বলতার পর্যায়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত ওমর (রা.) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাংখা করতেন না। তবে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় একবার তিনি শাসন ক্ষমতা পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। সে ঘটনা তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। জবাবদিহির চিন্তার কারণে তিনি খেলাফতের দায়িত্বকে যেমন ভারি মনে করতেন তেমনি ক্ষমতা পাওয়ার আগ্রহ তিনি আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার আশাতেই ব্যক্ত করেছিলেন। সুনাম, সুখ্যাতি বা লোভ লালসার কারণে তিনি ক্ষমতাসীন হতে চাননি। রসূল (স.) বনু ছকিফ প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন, তোমরা ইসলামের অনুসারী হও। যদি না হও তবে আমি তোমাদের কাছে এমন একজনকে পাঠাবো, যে ব্যক্তি তোমাদের শিরচ্ছেদ করবে, তোমাদের স্ত্রীপুত্রদের বন্দী করবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেবে।

হযরত ওমর (রা.) বলেন আল্লাহর কসম, শাসন ক্ষমতার আকাংখা আমার মনে কখনো জাগেনি। কিন্তু সেদিন রসূল (স.)-এর উপরোক্ত কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, এই দায়িত্ব

যদি আমাকে দেয়া হতো। আমি আপন মনে চিন্তামগ্ন ছিলাম, এমন সময় রসূল (স.) হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরে বললেন, এই হচ্ছে সে ব্যক্তি, এই হচ্ছে সে ব্যক্তি।

মৌলিক মানবাধিকার

যে দেশে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয় সেখানে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের আত্মমর্যাদা থাকে না, তারা মানবতা থেকেই বঞ্চিত থাকে। তাদের জীবন মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন মানুষ মৃত্যু মেনে নিতে পারে, কিন্তু মর্যাদাহীনভাবে বেঁচে থাকতে চায় না। রসূল (স.) ব্যক্তি মানুষের অধিকার এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘরে শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যার শরীর সুস্থ এবং যার কাছে পেট ভরে খাওয়ার মতো খাদ্য আছে সে যেন দুনিয়ার সকল নেয়ামতই পেয়ে গেছে।

সূরা তাকাছুর-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এরপর কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, নেয়ামত মানে হচ্ছে শান্তি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য।

এতে বোঝা যায় এ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা কতো বড়ো নেয়ামত। রসূল (স.) শান্তি ও নিরাপত্তার কথা স্বাস্থ্যের আগে উল্লেখ করেছেন।

ইসলামে চুরির শাস্তি হচ্ছে হাত কাটা। অথচ ধোঁকা, প্রতারণা বা ফটকাবাজি করে কারো অর্থসম্পদ আত্মসাতের শাস্তি কিন্তু হাত কাটা নয়। এর কারণ হচ্ছে চুরির ফলে একজন মানুষ যে তার ধনসম্পদ হারায় তাই শুধু নয় বরং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা থেকেও সে বঞ্চিত হয়।

ইসলামে মৌলিক অধিকার এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর এতো বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, ফেকাহবিদরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হচ্ছে যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে মানুষের নিজের অস্তিত্ব এবং ধনসম্পদ রক্ষার ও ব্যবহারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। যেখানে এ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয় সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

শাসক হিসেবে হযরত ওমর (রা.) এমন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ রেখে গেছেন যে, ন্যায়পরায়ণ শাসকদের জন্যে এখন পর্যন্ত তিনি অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। হযরত ওমর (রা.)-কে আল্লাহ তায়ালা বেহিসাব নেয়ামত দিয়েছেন। তিনি আরবের মাটি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলেন কিন্তু তার রূহ ছিলো অনেক মহান, সম্মানিত এবং পূর্ণাঙ্গ। আমাদের জন্যে তার জীবনে বহু আদর্শ ও শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি ছিলেন হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ধরনের লোকদের অনুসরণ করারই নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত খালেদের মধ্যে কতোটা আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো সেটা হযরত খালেদের ওসীয়ত থেকেই বোঝা যায়। মৃত্যুকালে হযরত খালেদ (রা.) ওসীয়ত করেছিলেন যে, তার সন্তানদের তত্ত্বাবধান এবং তার সম্পত্তির বন্টন-বিতরণের দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.) পালন করবেন। এত্তোসব প্রমাণ সত্ত্বেও যারা হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত খালেদ (রা.)-এর মধ্যে তুলনা করে এবং একজনকে অন্যজনের প্রতিপক্ষ করার চেষ্টা করে তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং বুদ্ধির স্বল্পতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকেনা।

হযরত ওমর ও খালেদ বিন ওলীদ (রো.)

৭

সপ্তম অধ্যায়

হযরত ওমর ও খালেদ বিন ওলীদ (রা.)

হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফত আমলে বহু এজতেহাদী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোনো কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা বহু কিছু লিখেছেন। প্রত্যেক লেখক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে তার পদ থেকে বরখাস্ত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেউ কেউ হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচনা করেছেন, আবার কেউ কেউ হযরত খালেদ (রা.)-এর কোনো কোনো কাজের সমালোচনা করেছেন। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে সমালোচনা এমন হওয়া উচিত যাতে এই দুই মহান সাহাবার মর্যাদা ও গুরুত্ব বিবেচিত হবে।

আমি এ বিষয়ে কলম ধরেছি। কিন্তু আমি উভয়ের তুলনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা চিন্তা করিনি। উভয় সাহাবার কৃতিত্ব এতো উচ্চমানের যে, বর্তমানকালের মুসলমানদের সাথে তাদের তুলনা করার মতো যোগ্যতাই নেই। আমার কথায় কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মনে কোনো কষ্ট দিতে চাই না। রসূল (স.)-এর সকল সাহাবাকে এবং দ্বীন ইসলামকে আমি এতো ভালোবাসি যে, এই ভালোবাসার মোকাবেলায় দুনিয়াবী এবং পার্থিব স্বার্থের কানাকড়ি মূল্যও নেই। আমি যেসব ঘটনার কথা এখানে আলোচনা করবো সেসব ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যামান রয়েছে এবং ইসলামের ইতিহাসের সকল শিক্ষার্থী সে সম্পর্কে অবগত। এসব কোনো নতুন কথা নয় এবং আজ প্রথমবার এসব কথা আলোচিত হচ্ছে না।

ঘটনাগুলো আমি এ কারণে আলোচনা করতে চাই যাতে উভয় সাহাবীর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। সকল সাহাবাই একে অন্যকে শুধু সম্মানই করতেন না বরং তারা সে সম্মানের কথা অন্যদের কাছে প্রকাশও করতেন।

মতামতের পার্থক্য মানে শত্রুতা নয়

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.) একে অন্যের প্রতি শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। এ ধরনের মহৎ মানুষেরা ছোটখাট বিষয়ের চেয়ে বৃহত্তর লক্ষ্যের প্রতি নযর রাখতেন। তারা যে মতামতই গ্রহণ করুন না কেন সেটা ঈমান এবং দ্বীনী বিবেচনার আলোকে করতেন।

হযরত ওমর (রা.) কিছু কিছু ক্ষেত্রে হযরত খালেদ (রা.)-কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কথা বলেন। কিন্তু হযরত খালেদ নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সঠিক মনে করেন এবং অসন্তোষ বা প্রতিবাদ না জানিয়ে পদত্যাগ করা সমীচীন মনে করেন। ঈমানদার এবং উচ্চ সাহসী লোকদের জন্যে পদমর্যাদা ত্যাগ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই, উভয় মহৎ সাহাবীর মতামতকে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের বিষয় বলে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। তারা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে উভয়ে এজতেহাদ করেছেন এবং উভয়েই এজতেহাদের কারণে সওয়াব পাবেন।

সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত খালেদ (রা.) উভয়েই মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। হযরত ওমর (রা.) এলহামের অধিকারী ছিলেন এবং মোহাদ্দেস ছিলেন। তিনি আল্লাহর যমীনে ন্যায়বিচার, ইনসাফ, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্যদিকে হযরত খালেদ (রা.) ছিলেন মহান সিপাহসালার। তিনি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেননি। ওহুদের যুদ্ধে তিনি কাফেরদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। সেই যুদ্ধে হযরত খালেদের (রা.) হামলার কারণে মুসলমানদের অর্জিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। তার সম্পর্কে রসূল (স.) বলেছেন, তিনি আল্লাহর শাণিত তলোয়ার। মোতার যুদ্ধে তিনি এ খেতাব পেয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে তার হাতে নয়খানা তলোয়ার ভেঙ্গেছিলো।

উল্লেখিত দু'জনের মধ্যে একজনের সমালোচনা করা মানে দুজনেরই সমালোচনা করা। সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে আমাদের খুব সতর্কভাবে কথা বলতে হবে। তাদের এখলাছ এবং নেক নিয়ত সম্পর্কে আমাদের সামান্য সন্দেহ করাও ঠিক হবে না। খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে আমরা ভালোবাসি, কেননা তিনি সিপাহসালারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মোরতাদদের উৎখাতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা বোঝানো যাবে না যে, হযরত ওমর (রা.)-এর ভূমিকাকে গৌণ মনে করা হচ্ছে। খলীফা এবং সেনা অধিনায়কের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে খলীফা যে রকম সিদ্ধান্ত দেবেন সেটাই মেনে নিতে হবে। এটাই ইসলামের রীতি। এ ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদীসে সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া না গেলে খলীফার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

রসূল (স.) সাহাবাদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের সম্মান করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা ব্যয় করো তবু কোনো সাহাবার সমপরিমাণ তো দূরে থাক তার অর্ধেক মর্যদায়ও পৌঁছুতে পারবে না। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার সাথীদের আমার জন্যে মনোনীত করেছেন। তারা আমার সাহায্যকারী এবং পরামর্শদাতা। যারা সাহাবাদের মন্দ বলবে, তাদের ওপর আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের এবং দুনিয়ার সব মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে রসূল (স.)-এর সাথী হিসেবে মনোনীত করেছেন। সাহাবাদের যারা সমালোচনা করে এবং একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেয় তারা খুব সূক্ষ্মভাবে, সতর্কভাবে মুসলমানদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে।

সাহাবায়ে কেরামের নিয়তের এখলাছ সম্পর্কে উম্মতের ঐকমত্য

বলা হয়ে থাকে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং রসূলরা বাদে অন্য কেউ নিষ্পাপ নেই। সাধারণ মানুষ নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করতে পারে কিন্তু সাহাবাদের ন্যায়পরায়ণতা এবং নিয়তের এখলাছ সম্পর্কে উম্মতের এজমা বা সম্মিলিত ঐকমত্য রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) খালেদ (রা.)-কে কোনো প্রকার সন্দেহ অথবা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে বরখাস্ত করেননি। একইভাবে হযরত খালেদ (রা.) তার মতামতের ব্যাপারে যে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছিলেন সেটা নেতৃত্বের লোভে অথবা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহে করেননি।

রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় হযরত খালেদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করায় রসূল (স.) সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। রসূল (স.) আল্লাহর এই তলোয়ারকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের(রা.) খেলাফতের সময় মোশরেক এবং মোরতাদদের বিরুদ্ধে এই তলোয়ার ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। এই তলোয়ারের মাধ্যমে আল্লাহর বহু দুশমন জাহান্নামে পৌঁছে গিয়েছিলো। মুসায়লামা কায্যাবও ছিলো তাদের মধ্যে অন্যতম।

এই শাণিত তলোয়ারকে কিছুকালের জন্যে হযরত ওমর (রা.) কেন খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন? এর কয়েকটি কারণই ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। দীর্ঘকাল যাবত এসব কারণই বিবৃত হয়ে আসছে। আমি মনে করি উল্লেখিত কারণসমূহ বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়, হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে আমি কোনো যুক্তি প্রদর্শন করছি না। যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তবে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।

তাওহীদ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি

তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেলে ইসলামের এমারত টিকে থাকতে পারে না। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মুসলমান যদি অন্য কোনো সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন মুসলমান তার মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত অটল এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি যদি কারো ক্ষতি করতে চান তবে কোনো শক্তি তাকে সে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি যদি কারো উপকার করতে চান, কোনো শক্তি উপকার করা থেকে তাকে ফেরাতে পারে না। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম, তিনি সর্বশক্তিমান।

মুসলমানরা তাওহীদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলো। আল্লাহর জাতের ওপর তাদের ছিলো অদৃশ্য বিশ্বাস। হযরত ওমর (রা.) তাওহীদের এ বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং এমন কিছু কাজও করেন যেসব কাজ হযরত আবু বকর (রা.) করেননি। হযরত ওমর (রা.)-এর এসব কাজে সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। হযরত ওমর (রা.)-এর সেসব সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে খেলাফতে রাশেদার সিদ্ধান্ত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ফেকাহ ও ইসলামী আইনের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বৃক্ষ কেটে ফেলা

পবিত্র কোরআনে যে গাছটির উল্লেখ রয়েছে হযরত ওমর (রা.) সে মহান গাছটি কেটে ফেলেছিলেন। সেই গাছের নীচে বসে সাহাবারা রসূল (স.)-এর হাতে বাইয়াতে রেযোয়ান-এ অংশ নিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) সেই গাছকে অবশ্যই সম্মান করতেন। হযরত ওমর (রা.) গাছটি গুরুত্বহীন মনে করেও কাটেননি। বরং তার কাছে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিলো সবচেয়ে মারাত্মক। উম্মতকে তিনি আকীদার ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা জরুরী মনে করেছিলেন। বরকত লাভের জন্যে সেই গাছের নীচে গিয়ে বসে থাকা একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিলো। রসূল (স.) উক্ত গাছ সম্পর্কে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি বদরের প্রান্তরে অংশ নিয়েছে এবং বাইয়াতে রেযোয়ানের সময় গাছের নীচে উপস্থিত ছিলো তারা দোযখে যাবে না।

হাজরে আসওয়াদ

হাজরে আসওয়াদ একটি পবিত্র পাথর। কাবাঘরের এক কোণে এ পাথর স্থাপন করা হয়েছে। একবার হযরত ওমর (রা.) তওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদে গাল রেখে কাঁদছিলেন। তারপর নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে ওমর! এটাই সেই জায়গা যেখানে চোখের পানি ফেলা হয়। হযরত ওমর (রা.) হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করেন এবং তার পাশে চোখের পানি ফেলেন। এটা ছিলো তার ঈমান এবং রসূল (স.)-এর অনুসরণের উদাহরণ। এ পাথরের বরকত সত্ত্বেও মুশকিল আসান এবং প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে উক্ত পাথরকে কোনো কৃতিত্ব দিতে রাযি ছিলেন না। এ কারণে একবার হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম আমি জানি তুমি শুধু একটি পাথর, তুমি কারো উপকারও করতে পারো না, ক্ষতিও করতে পারো না। রসূল

(স.) তোমাকে চুম্বন করেছিলেন, যদি সেই দৃশ্য আমি না দেখতাম তবে আমি কখনোই তোমাকে চুম্বন করতাম না।

হযরত ওমর (রা.)-এর মনে তাওহীদের যে দৃঢ়তা ছিলো তিনি সব মানুষের মনে সে রকম তাওহীদ বিশ্বাস দেখতে চাইতেন। মানুষ এক দুর্বল সৃষ্টি। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কিছুই করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যা চান সেটাই হয়ে থাকে। তিনি বিজয়ী, তিনি শক্তিশালী, তিনি কাদের, তিনি কাহ্হার।

হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রমাগত বিজয় লাভের ফলে ইসলামের শক্তি বেড়েছিলো ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি এ রকম একটা আশংকাও দেখা দিয়েছিলো যে, মানুষ কোনো রকম ফেতনায় জড়িয়ে যাবে।

হযরত ওমর (রা.) জানতেন যে, ফেতনার শুরুতেই তার মূল উৎপাটন করতে হয়। তা না হলে সেই ফেতনা প্রতিরোধ করা যায় না। মানুষ এমন বলাবলি করতে শুরু করেছিলো যে, যেখানে খালেদ সেখানে বিজয় অবধারিত, অথচ বিজয় ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহর হাতে। খালেদের (রা.) যুদ্ধ বিশারদ হওয়া, রণকৌশল, বীরত্বের ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু খালেদ ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। মানুষতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ হাইয়্যুল কাইয়্যুম মোসাব্বেবুল আসবাব। তিনি যা চান তাই হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.) খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে বরখাস্ত করে বুঝিয়েছিলেন যে, যেখানে খালেদ সেখানেই বিজয় অবধারিত এই মনোভাব মেনে নেয়া যায় না।

হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তে সাহাবাদের নিশ্চিন্ত মনোভাব

সব মুসলমানই একথা জানেন যে, হযরত ওমর (রা.) ব্যক্তিগত খাহেশাতের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতেন না। তার সামনে আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিলো মুখ্য বিষয়। হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করার ঘটনায় সাহাবারা কোনো প্রতিবাদ করেননি। তার বিরুদ্ধে সোচ্চারও হননি। কারণ তাদের হযরত ওমর (রা.)-এর নেক নিয়ত বা উদ্দেশ্যের সততা, দূরদর্শিতা এবং এখলাছের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো। হযরত ওমর (রা.) নাখোশ হবেন ভেবে তারা চুপচাপ ছিলেন এমন কথাও বলা যাবে না। কেননা অন্যায় কাজে নীরব দর্শক হয়ে থাকা তাদের দৃষ্টিতে শুধু কাপুরুষতাই ছিলো না বরং তা ছিলো অপরাধ। এমনকি ওমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে না পেরে তাদের মধ্য থেকে একজন ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেও ফেললেন, হে ওমর আমরা আপনার কোনো কথা শুনব না, কোনো বিষয়ে আনুগত্য করব না, যতোক্ষণ আপনি আমাদের এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত না করবেন।

অন্য একজন সাহাবী একবার বলেছিলেন, আমরা যদি আপনার মধ্যে কোনো বক্রতা লক্ষ্য করি তবে তলোয়ার দিয়ে সোজা করে দেবো।

সে সময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে এবং বাইরে বহু লোক এমন ছিলেন যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কাউকে ভয় পেতেন না। কাজেই যে বিষয়ে তারা নীরবতা অবলম্বন করেছেন, বুঝে নিতে হবে যে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তারা নীরব থেকেছেন। কারো ভয়ে বা পরিস্থিতির প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে তারা নীরব থাকেননি।

হযরত খালেদের (রা.) বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত খালেদ (রা.) তার বরখাস্ত আদেশের কোনো প্রতিবাদ করেননি। এ ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিলো প্রশংসনীয় এবং অনুসরণযোগ্য। তিনি আনুগত্যের এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যাতে ইসলামের অনুসারীরা গর্ব করতে পারে। আমীরুল মোমেনীনের আদেশ খালেদ (রা.)-এর কাছে যে সময় পৌঁছেছিলো তখন তিনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। তিনি ছিলেন রোমক বাহিনীর সাথে

যুদ্ধরত। সেই নাজুক সময়ে খলীফার প্রেরিত বরখাস্ত আদেশ তিনি পাঠ করলেন এবং কাউকে কিছু না বলে পকেটে রেখে দিলেন। মুসলিম বাহিনী শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের পর হযরত খালেদ (রা.) খলীফার চিঠি আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর হাতে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) জনমতের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। যে ঈমান এবং দ্বীনী চিন্তা খলীফার মনমগযে জাগ্রত ছিলো হযরত খালেদ (রা.)-এর মনে মগজেও ছিলো সেই একই চিন্তার অনুরণন। কোরআনে করীমে মোমেনের গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তারা পরস্পরের প্রতি দয়ালু এবং করুণাপ্রবণ।'

দু'জন সেনা অধিনায়কের অপসারণ

হযরত ওমর (রা.) খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর উচ্চতর খেদমত সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। তাকে বরখাস্ত করার পর হযরত ওমর (রা.) জনগণের সামনে এ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া জরুরী মনে করলেন। কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হোক সেটা তিনি চাচ্ছিলেন না।

হযরত ওমর (রা.) মেম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, আমি খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এবং মুসান্না শায়বানিকে বরখাস্ত করবো। তাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি রয়েছে বা তাদের কোনো দোষ পাওয়ার কারণে নয় বরং অন্য উদ্দেশ্য আছে। তারা জানুক এবং সমগ্র মুসলিম জাতি জানুক যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁর বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন, আল্লাহর সাহায্য শুধু খালেদ এবং মুসান্না নামক দুই ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হযরত ওমর (রা.) এ রকম কোনো ঘোষণা দিতে বাধ্য ছিলেন না। খলীফা হিসেবে তিনি যাকে ইচ্ছা নিয়োগ করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন না যে, মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার অস্থিরতা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হোক। হযরত খালেদ এবং মুসান্না (রা.)-কে একই সাথে বরখাস্ত করার কারণে এ রকম সন্দেহের অবকাশ থাকলো না যে, হযরত খালেদকে হযরত ওমর (রা.) ব্যক্তিগত আক্রোশে বরখাস্ত করেছেন। মুসান্না ইবনে হারেসাও ছিলেন একজন সফল সেনা অধিনায়ক। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সব যুদ্ধেই জয়লাভ করেছিলেন। মুসান্নাকেও হযরত খালেদের মতোই সেনা অধিনায়ক মনোনীত করা হয়েছিলো। তাকে মনোনীত করেছিলেন প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)। ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত খালেদ (রা.)-এর দায়িত্ব গ্রহণের আগে সেনা অধিনায়ক হিসেবে হযরত মুসান্নাই দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইরানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে মানসিকভাবে হযরত মুসান্নাই প্রস্তুত করেছিলেন। মুসান্নার বীরত্ব এবং উদ্দীপনামূলক বক্তব্যের ফলে ইরানী সৈন্যদের সম্পর্কে সৃষ্ট আতংক মুসলমানদের মন থেকে কেটে গিয়েছিলো। ইরানী যুদ্ধ ফ্রন্টে হযরত মুসান্না (রা.) প্রশংসনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একজন দূত খালেদের বরখাস্তের চিঠি নিয়ে যেসময় মদীনা থেকে রোম যুদ্ধ ফ্রন্টে যাচ্ছিলো ঠিক সেই সময়েই অন্য একজন দূত মুসান্নার বরখাস্তের আদেশ নিয়ে ইরানী সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। উভয় জেনারেল উভয় সেনা অধিনায়কই চূড়ান্ত আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা তারা জানতেন খলীফা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত খালেদ (রা.) উভয়েরই নিজ নিজ মতামতের পক্ষে যুক্তি রয়েছে। উভয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মুসলমানদের কল্যাণ প্রত্যাশী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)- কে বরখাস্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে আমি শুধু একথা বলতে চাই যে, আমীরুল মোমেনীন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সেনাবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক ছিলেন অর্থাৎ সুপ্রীম কমান্ডার ছিলেন। সিপাহসালারদের কাজ হচ্ছে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন। কিন্তু খলীফা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কারণে সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং জনগণেরও প্রধান। সকলের কাছেই তাকে জবাবহিহি করতে হয়।

হযরত খালেদ (রা.) শাহাদাত প্রত্যাশী ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু তিনি কামনা করতেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি অশ্রুসজল চোখে বলেছিলেন, আমি একশ'রও বেশী যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমার সারাদেহে তীর তলোয়ারের জখম রয়েছে। অথচ আফসোস, আজ আমি শাহাদাত থেকে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছি। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া ভরসা করার মতো কোনো আমল আমার নেই। আমি আল্লাহর রহমত আশা করি। একথা বলে তিনি কাঁদলেন। শাহাদাত থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তার আফসোস ছিলো। যুদ্ধের ময়দানে হযরত খালেদ (রা.) টুপির নীচে রসূল (স.)-এর মাথার চুল রাখতেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত আমলে একবার সৈন্যদের মধ্যে গনিমতের মাল বন্টন করেছিলেন, কিন্তু খলীফার কাছে তার হিসাব প্রেরণ করেননি। তার সততায় কারো কোনো সন্দেহ ছিলো না। প্রথম খলীফার কাছে গনিমতের মাল বন্টনের হিসাব না পাঠালেও খলীফা এ সম্পর্কে তাকে কোনো প্রশ্ন করেননি। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অন্যরকম। তিনি মনে করতেন প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক রাখার জন্যে খলীফার কাছে সব হিসাব পেশ করতে হবে

হযরত খালেদ (রা.) মনে করতেন যে, সৎভাবে গনিমতের মাল বন্টন করাই যথেষ্ট, খলীফার কাছে হিসাব পাঠাতে হবে কেন? হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত ছিলেন না। হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিই এ ক্ষেত্রে ছিলো সঠিক। কেননা আমীরুল মোমেনীন হিসেবে রাষ্ট্রের সকল আর্থিক আয়ব্যয়ের হিসাব খলীফার জানা দরকার। খালেদের বরখাস্তের কারণ অবশ্য এটা ছিলো না। তবে উল্লেখিত বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিই ছিলো সঠিক।

মালেক ইবনে নুয়াইরার ঘটনায় হযরত আবু বকর (রা.)ও হযরত খালেদ (রা.)-এর সমালোচনা করেছিলেন। আবুবকর খালেদকে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন মালেক ইবনে নুয়াইরার বিধবা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। সেই সময়েও হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেছিলেন, খালেদকে বরখাস্ত করা হোক। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন নরম মনের মানুষ।

মজলিসে শূরার পরামর্শ গ্রহণ

হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করার জন্যে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বারবার অনুরোধ করেন। আবু বকর (রা.) ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি কি খালেদের জায়গায় সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ। সাহাবারা এ খবর পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ আপনার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। কাজেই তাকে মদীনার বাইরে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। আবু বকর (রা.) পরামর্শ চাইলে মজলিসে শূরার সদস্য সাহাবারা বললেন, খালেদকে তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালনের তাকিদ দিন। ওমরকে আপনার কাছে রাখুন। আবু বকর (রা.) তাই করলেন।

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় হযরত ওমর (রা.), খালেদ (রা.)-এর ব্যাপারে প্রথম খলীফাকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে প্রস্তাব গ্রহণ করে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.)-কে সেনাবাহিনীর অধিকানয়ক মনোনীত করেন।

হযরত ওমর (রা.) দায়িত্ব পালনের জন্যে যেতে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু সাহাবারা যেতে দিলেন না। হযরত ওমর (রা.) এতে কোনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং মদীনায় থেকে গিয়েছিলেন।

মজলিসে শূরার সদস্য সাহাবারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো হযরত ওমর (রা.)-কেও বলতে পারতেন আপনি মদীনায় থাকুন। যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে খালেদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার

আপনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা তা বলেননি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের সময় হযরত ওমর (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে খলীফাকে পরামর্শ দিতেন, মতামত দিতেন। কিন্তু তার মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হলেও তিনি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। কোনো বিরক্তি বা প্রতিবাদ করতেন না। এ রকম বহু উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। সাহাবাদের জীবনে সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণের বহু উদাহরণ বিদ্যমান। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো সাহাবা কথা বলতেন না। নিজের মতামত প্রত্যাখ্যাত হলেও তারা বিরক্ত হতেন না বা প্রতিবাদ করতেন না।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে খলীফার ভূমিকা

ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত প্রত্যাখ্যান করা হলেও তিনি খলীফার নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। তাদের মনে একথা দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিলো যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠার নীতিই হচ্ছে খলীফার আদেশ সবাই নির্বিবাদে মেনে চলবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশ যেভাবে সবাই মেনে নিতেন একইভাবে হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশও সবাই মানবেন এটাই ধরে নেয়া যায়। আনুগত্য পাওয়ার ক্ষেত্রে খলিফা হিসেবে তারা উভয়েই সমান।

মালেক ইবনে নুয়াইরার ঘটনা

মালেক ইবনে নুয়াইরার ঘটনা হচ্ছে, তার মুসলমান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিলো। হযরত খালেদ যখন হামলা করেছিলেন তখন কাতাদা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উভয়েই হযরত খালেদ (রা.)-এর বাহিনীতে ছিলেন। উভয়ে এ সাক্ষী দিলেন যে, মালেক ইবনে নুয়াইরা এবং তার গোত্রের লোকেরা মুসলমান ছিলো। হযরত খালেদের (রা.) অভিমত ছিলো যে, তিনি মুসলমান ছিলেন না। মালেক ইবনে নুয়াইরা এবং তার এক সাথীকে হত্যা করার খবর জেনে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন, খালেদের তলোয়ার মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আপনি তাকে বরখাস্ত করুন। হযরত ওমর (রা.) খালেদ (রা.)-কে বললেন, হে খালেদ তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করেছো এবং তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছো। আমি তোমাকে অবশ্যই সংগেসার অর্থাৎ পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবোই। বিষয়টি ছিলো খুবই নাজুক। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদের সাথে কথা বললেন। তারপর জানালেন, খালেদের ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু যে তলোয়ারকে রসূল (স.) খাপমুক্ত করেছেন আমি সেই তলোয়ার খাপের মধ্যে ঢোকাতে চাই না। মালেক ইবনে নুয়াইরার রক্তের ঋণ আমি অর্থমূল্যে পরিশোধ করবো। হযরত খালেদ (রা.)-এর ভুলের কারণে সেই যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত বন্দীদের দাসদাসীতে পরিণত করার পরিবর্তে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হলো। তাদের কাছ থেকে নেয়া অর্থসম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং নিহতদের হত্যার ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো। সে সময় ঘটনার নিয়ন্ত্রণ ছিলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে। এ কারণে হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করার জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন।

হযরত খালেদের (রা.) বরখাস্তের ঘটনা

হযরত ওমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর হযরত খালেদ (রা.)-কে চিঠি লিখলেন, তিনি যেন খলীফার অনুমতি ছাড়া মানুষকে কোনো দান না করেন। বায়তুলমাল থেকে যদি কাউকে একটি বকরি বা একটি ভেড়াও দিতে হয় তবে যেন খলীফার দরবার থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রথম খলীফার সময়ে হযরত খালেদ (রা.) বায়তুলমাল থেকে যে নিয়মে দান করতেন সে নিয়ম পরিবর্তন করতে রাযি হলেন না। ফলে হযরত ওমর (রা.) খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর ওপর অসততা অথবা দুর্নীতির কোনো অভিযোগ আনেননি,

অপবাদ দেননি, অথবা কোনো প্রকার সন্দেহও করেননি। দান করাও ইসলামী রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজেরই একটা অংশ। দানের ক্ষেত্রে খলীফার অনুমোদন নেয়াও ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণেই প্রয়োজন। খলীফা এবং সেনা অধিনায়কের মতামতের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিলে খলীফার মতকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজেই হযরত খালেদ (রা.) বরখাস্তের আদেশ কোনো বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো না। হযরত খাদের (রা.) বরখাস্তের আদেশ দেয়ার সময় সকল কর্মকর্তাই উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সবাই খলীফার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানান।

সেনা অধিনায়ক পদ থেকে অপসারণে হযরত খালেদ (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া

হযরত খালেদ (রা.) বরখাস্তের বা অপসারণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এরপর কি হয়েছিলো? তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়েছিলো? গৃহে অন্তরীণ করা হয়েছিলো? তার গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিলো? তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো? তার কর্মপরিধিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিলো? না এসব কিছুই করা হয়নি। হযরত খালেদ (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া কী ছিলো? তিনি কি কারো ওপর হামলা করেছিলেন? আমীরুল মোমেনীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? কোনো গোপন সংগঠন তৈরি করেছিলেন? কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্জন বাস শুরু করেছিলেন? না, কিছুই হয়নি।

হযরত খালেদ (রা.)-এর অপসারণে সাধারণ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কেনম ছিলো? তারা কি খলীফার বিরোধিতায় অথবা পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলো? খালেদের নিন্দায় অথবা প্রশংসায় জনসমাবেশের আয়োজন করেছিলো? তারা কি খালেদের পুনর্বহালের জন্যে অথবা তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্যে দাবী করেছিলো? না, এসব কিছুই হয়নি। কারো মনে এ রকম চিন্তাও আসেনি। সবকিছু শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশেই সম্পন্ন হয়েছিলো। ঘটনাটিকে কোনো দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি বরং স্বাভাবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে সবাই মেনে নিয়েছিলো। এর বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ ঘটেনি, বিক্ষোভের প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায়নি।

মদীনায় আগমন এবং খলীফার দরবারে উপস্থিতি

হযরত খালেদ (রা.) ছিলেন কর্মবীর। তিনি মদীনায় আসেন এবং খলীফার সাথে দেখা করেন। এ সময় তারা উভয়ে একে অন্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। হযরত খালেদ (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর মজলিসে বসেন এবং একে অন্যের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ দেন। এমনকি মদীনা থেকে হজ্জ সফরে উভয়ে মক্কায় একত্রে যান।

হযরত খালেদের অপসারণের ঘটনার পরও মুসলিম বাহিনীর বিজয় অভিযানের ধারা অব্যাহত থাকে। সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়নি, কোথাও তারা পরাজিতও হয়নি। মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, বিজয় আল্লাহর রহম ও সাহায্যেই হয়ে থাকে। কোনো সেনা অধিনায়কের বীরত্বের কারণে হয় না। হযরত ওমর (রা.) পরে পুনরায় হযরত খালেদ (রা.)-কে সেনা অধিনায়কত্বের পদ গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন। খালেদ (রা.) তখন কিছু শর্ত দেন। হযরত ওমর (রা.) সেসব শর্ত গ্রহণে রাযি হননি। ফলে হযরত খলেদ (রা.) সেনা অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তবে একজন সৈনিক হিসেবে জেহাদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। মতবিরোধ সত্ত্বেও সাহাবারা একে অন্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। হযরত খালেদ (রা.) যদি সেনা অধিনায়ক বা সিপাহসালার হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন না হতেন তবে কিছুতেই হযরত ওমর (রা.) পুনরায় তাকে উক্ত পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করতেন না। তারা উভয়েই অহংকার এবং কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হযরত খালেদ (রা.)-এর মৃত্যু

সাইফ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, পুনরায় সিপাহসালার পদ গ্রহণের প্রস্তাব পাওয়ার কিছুকাল পরেই হযরত খালেদ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন। খালেদ (রা.)-এর মৃত্যুর পরও খলীফা একাধিকবার হযরত খালেদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং ইসলামের জন্যে তার বীরত্ব ও ত্যাগের প্রশংসা করেন।

কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সজীব জাতি তার বীর সন্তানদের মৃত্যুর পর ভোলে না। বরং তাদের স্মরণ মানুষের মনে চির জাগরুক থাকে। হযরত খালেদ (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রা.)-কে জানানো হয়েছিলো যে, খালেদের মৃত্যুতে কোরায়শ মহিলারা কাঁদছেন। আপনি কি তাদের কাঁদতে নিষেধ করবেন? হযরত ওমর (রা.) অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আবু সোলায়মানের মৃত্যুতে কোরায়শ মহিলাদের কাঁদতে দাও। তবে সে কান্নায় বাড়াবাড়ি বা কৃত্রিমতা যেন না থাকে। হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর জানাযার জন্যে বেরোলে শুনলেন তার বৃদ্ধা মা বলছেন, হে খালেদ, তুমি ছিলে সর্দার। লাখো সৈন্যের বিরুদ্ধেও তুমি ছিলে আতংক, কোটি মানুষের মধ্যে তুমি ছিলে ভালো মানুষ। হযরত ওমর (রা.) মন্তব্য করলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। নিঃসন্দেহে খালেদ এ রকম মানুষই ছিলো।

মত পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব

হযরত ওমর (রা.) এবং হরত খালেদ (রা.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য ছিলো। কিন্তু ক্রোধ, জিঘাংসা শত্রুতা থেকে উভয়ের মন ছিলো পরিচ্ছন্ন। হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করার পরও মক্কায় যাওয়ার হজ্জ সফরে উভয়ে একই সাথে ছিলেন। হজ্জ-এর গুরুত্ব তারা জানতেন, হজ্জ-এর আনুষ্ঠানিকতায় আল্লাহর প্রতি নিবেদিত চিত্ততা, তাকওয়ার প্রকাশ ঘটানোর কথাও তাদের অজানা ছিলো না। এসব কিছু তারা একত্রে সম্পন্ন করেন। কারো প্রতি কারো মনে ঘৃণা, ক্রোধ, বিরক্তি বা জিঘাংসার মনোভাব বজায় থাকলে এ রকম এবাদাতে একত্রে পাশাপশি থাকা যায় না। যদি ওসব মনোবৃত্তি থাকতো তবে তারা একত্রে সফরই করতেন না কিংবা একত্রে এবাদাতই করতেন না। অথবা একত্রে বের হলেও মদীনায়ই পরস্পরিক শত্রুতা সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করতেন। কিন্তু তারা উভয়েই ছিলেন পরিচ্ছন্ন মনের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ।

হযরত খালেদ (রা.)-এর মৃত্যুতে হযরত ওমর (রা.)-এর কান্না

হজ্জ পালনের পর হযরত খালেদ (রা.) আগেই মদীনায় ফিরে চলে যান। হযরত ওমর (রা.)-এর পথে এক ব্যক্তির কাছে খবর পান যে খালেদ (রা.) গুরুতর অসুস্থ। এ খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) তিন দিনের সফর একদিনে সম্পন্ন করেন। মদীনায় পৌঁছে খবর পেলেন যে, কিছুক্ষণ আগে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। হযরত ওমর (রা.) খালেদের (রা.) মৃত্যুর কথা শুনে কাঁদেন এবং বারবার 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করেন।

হযরত খালেদ (রা.)-এর সততার সাক্ষ্য প্রদান

হযরত ওমর (রা.) জাবিয়া নামক জায়গায় মুসলিম সৈন্যদের সমাবেশে এক ভাষণে বলেন, খালেদকে আমি আদেশ দিয়েছিলাম তিনি যেন মোহাজেরদের দুর্বল লোকদের মধ্যে অর্থসম্পদ বিতরণ করেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য লোক এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। খালেদের এ তৎপরতার কারণে আমি তাকে বরখাস্ত করেছিলাম। তার কোনো অসততার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়নি। খালেদের স্থলে আবু ওবায়দাকে আমি সিপাহসালারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলাম।

হযরত ওমর (রা.) জানতেন প্রশাসনিক নির্দেশের আনুগত্য খেলাফতের জন্যে কতো জরুরী। রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ কেউ একবার লংঘন করলে আইনের শাসন শিথিল হয়ে পড়ে, সরকারের প্রশাসন বলে কিছু থাকে না। এ ধরনের আদেশ লংঘনের রেওয়ায চালু হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেন। অন্যান্য কারণ ছাড়াও উল্লেখিত কারণেই খালেদ এবং মুসান্না (রা.)-কে বরখাস্ত করা হয়েছিলো। এটা ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশাসনিক দৃঢ়তা এবং আইনের শাসনের স্বচ্ছতার প্রমাণ।

হযরত ওমর (রা.)-এর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার প্রতীক। হযরত খালেদ (রা.)-এর বরখাস্তের পর হযরত খালেদের (রা.) চাচাতো ভাই আমর ইবনে হাযাম ক্রুদ্ধভাবে বললেন, হে ওমর, আল্লাহর কসম তুমি সুবিচার করোনি। তুমি এমন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছো যাকে স্বয়ং রসূল (স.) নিয়োগ করেছিলেন। তুমি সেই তলোয়ারকে খাপবদ্ধ করেছো যে তলোয়ার রসূল (স.) খাপমুক্ত করেছিলেন। তুমি শত্রুতার পরিচয় দিয়েছো এবং নিজের ভাইয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করেছো।

এটা ছিলো একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ। হযরত ওমর (রা.) শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি তার নিকটআত্মীয় যুবক, চাচাতো ভাইয়ের প্রসঙ্গে আবেগপ্রবণ, একারণে ক্রোধে অধীর হয়ে গেছো কিন্তু তোমার কথার মধ্যে কোনো সততা নেই। হযরত ওমর (রা.) ইচ্ছে করলে যুবকের কথার কড়া জবাব দিতে পারতেন, এমনকি তার নামে অপবাদ দেয়ার কারণে সাজাও দিতে পরাতেন। কিন্তু তিনি ইসলামের ক্ষমাশীলতাপূর্ণ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং ক্রুদ্ধ কথার জবাব শান্ত কণ্ঠে সহিষ্ণুতার সাথে দিয়েছিলেন।

হযরত খালেদ (রা.)-এর বোনকে হযরত ওমর (রা.)-এর বিয়ে

মানুষের স্বভাব হচ্ছে যার সাথে মনের নৈকট্য থাকে না মানুষ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদকে (রা.) খুবই পছন্দ করতেন। তার বোন হারেস ইবনে হিশামের (রা.) স্ত্রী ছিলেন। তিনি বিধবা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) তাকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের উদ্দেশ্য ছিলো হযরত খালেদের (রা.) সাথে আত্মীয়তা এবং তার সাথে নিকটতর সম্পর্ক গড়ে তোলা। এতে বোঝা যায় তার প্রতি ওমর (রা.)-এর ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভ ছিলো না বরং তিনি যা করেছেন তা প্রাশাসনিক কারণে দ্বীনী দৃষ্টিভংগি নিয়েই করেছেন।

খালেদের গুণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা

হযরত খালেদ (রা.)-কে তার পদ থেকে বরখাস্ত করার পরও যখনই তার সম্পর্কে আলোচনা হতো হযরত ওমর (রা.) তার প্রশংসা করতেন। খালেদর গুণবৈশিষ্ট আলোচনায় হযরত ওমর (রা.) কখনো কার্পণ্য করেননি। একদিন তিনি এও বলেছিলেন যে, আবু বকর (রা.)-এর প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করুন। মানুষ চেনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমার চেয়ে যোগ্য।

শাহাদাতের জন্যে হযরত খালেদ (রা.)-এর আগ্রহ

হযরত ওমর (রা.) খুব তাড়াতাড়ি মানুষ চিনতে সক্ষম ছিলেন। ইসলামের জন্যে যারা আত্মত্যাগ ও কোরবানী করেছিলেন এবং ইসলামের কারণে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছিলেন হযরত ওমর (রা.) তাদের বিশেষ সম্মান করতেন।

ইসলামের পতাকা বুলন্দ করার জন্যে হযরত খালেদ (রা.) যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছিলেন সেটা কেন গোপনীয় বিষয় ছিলো না। হযরত ওমর (রা.) হযরত খালেদের আত্মত্যাগের কথা প্রায়ই বলতেন। জীবনের শেষদিকে বলা হযরত খালেদ (রা.)-এর কথাগুলোকে

হযরত ওমর (রা.) বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। হযরত খালেদ (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে জেহাদের চেয়ে প্রিয় কোনো কাজ নেই। সেই রাত আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মনে হয় যখন প্রচন্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে মোজাহেদরা ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলার জন্যে অপেক্ষা করছে। কষ্টকর অপেক্ষার পরদিন সকালে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা হলো। তোমরা জেহাদকে তোমাদের জন্যে অত্যাবশ্যক করে নাও।

আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য

হযরত ওমর (রা.) যে সময় হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করেছিলেন সে সময় হযরত খালেদ (রা.)-এর জনপ্রিয়তা ছিলো তুঙ্গে। হযরত ওমর (রা.) যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করতেন এ কারণে পার্থিব কোনো কারণকে তিনি গুরুত্ব দেননি। দুনিয়াদার কোনো শাসক হলে প্রথমে অমন জনপ্রিয় সমর নায়কের জনপ্রিয়তায় চিড় ধরানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু ইসলামী খেলাফতে ওরকমের দুনিয়াদারী বিষয়ের চিন্তা করার প্রশ্নই ওঠে না।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা। তিনি নিজের সাথেও সুবিচার করতেন, অন্যের সাথেও সুবিচার করতেন। হযরত খালেদ (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি তার জন্যে রহমত ও মাগফেরাতের দোয়া করেন। তার যোগ্যতা ও গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেন এবং তার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করেন।

হযরত খালেদ (রা.)-এর ওসীয়ত

সাধারণ মানুষ তার সন্তানদের সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। সন্তানের জন্যে মানুষ সব সময়ই ভালো কিছু চিন্তা করে। তাদের কল্যাণে আন্তরিক চেষ্টা চালায়। নিজের মৃত্যুর পরে সন্তানের কল্যাণের জন্যে কেউই এমন কাউকে পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করে না যার ওপর পূর্ণ আস্থা না থাকে। হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত খালেদের মধ্যে কতোটা আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো সেটা হযরত খালেদের ওসীয়ত থেকেই বোঝা যায়। মৃত্যুকালে হযরত খালেদ (রা.) ওসীয়ত করেছিলেন যে, তার সন্তানদের তত্ত্বাবধান এবং তার সম্পত্তির বন্টনবিতরণের দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.) পালন করবেন। এতোসব প্রমাণ সত্ত্বেও যারা হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত খালেদ (রা.)-এর মধ্যে তুলনা করে এবং একজনকে অন্যজনের প্রতিপক্ষ করার চেষ্টা করে তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং বুদ্ধির স্বল্পতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকেনা।

মামা ও ভাগ্নে

হযরত ওমর (রা.)-এর মা হানতামা বিনতে হিশাম ইবনে মুগিরা ছিলেন আবু জেহেল এবং হযরত খালেদ (রা.)-এর চাচাতো বোন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উভয়ের মধ্যে ছিলো মামা ভাগ্নের সম্পর্ক। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বৃহত্তর জনস্বার্থের কারণে এ সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতেন না। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে উপরোক্ত তথ্যাবলী আমি উল্লেখ করেছি। হযরত ওমর (রা.)কে আমি উর্ধে তুলে ধরার বা অহেতুক তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পক্ষে ওকালতি করছি না। কারণ ওরকম কিছুর তিনি মুখাপেক্ষীও নন। হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে আমি তার সম্পর্কে রটানো বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করছি। সাহাবারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারা আমাদের জন্যে শিক্ষা ও আদর্শের অসাধারণ উদাহরণ রেখে গেছেন। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের নেই। সে রকম যোগ্যতাও নেই।

কোনো ব্যক্তির সমালোচনা সেই ব্যক্তির চেয়ে যোগ্য কারো পক্ষেই শোভনীয়। অথবা দ্বীনী জ্ঞান, চরিত্র, শক্তি, তাকওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির সমকক্ষ হলেই সমালোচনার চিন্তা করা

যায়। কোথায় সাহাবায়ে কেরামদের মতো পবিত্রপরিচ্ছন্ন আদর্শ মানুষ আর কোথায় আমরা গুনাহগারেরা। ইসলামের শক্রুরা মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্যে যেসব কৌশল গ্রহণ করে থাকে তার মধ্যে একটি মারাত্মক অপকৌশল হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দোষক্রুটি খুঁজে বের করা। তারা বিশেষ ভংগিতে, কোনো কোনো সাহাবার প্রশংসা করে, এরপরই অন্য সাহাবাদের সমালোচনা করতে শুরু করে। এসব অপকৌশল সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আসলে তারা সমালোচনাকে বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়ার জন্যেই বাধ্য হয়ে কারো কারো প্রশংসা করে। প্রকাশ্যে ইসলামের সমালোচনা করার সাহস কেউ পায় না। পর্দার আড়ালে বসে তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। ইসলামের শক্রুদের ষড়যন্ত্রের সেই পাহাড়কে আমি ভয় করি না যে পাহাড় দেখা যায়, আমি ভয় করি ষড়যন্ত্রের সেই কলংককে যে কলংক আমাদের পায়ের নীচে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

মুসলমান হিসেব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা সেসব বিষয় সম্পর্কে সচেতন হবো যেসব বিষয়ে সাহাবাদের সমালোচনা করা হয়। কোনো কোনো লোক স্বাধীনতার কথা বলে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। স্বাধীনতার সীমা নির্ধারিত রয়েছে। যা খুশী তা করার নাম কিছুতেই স্বাধীনতা হতে পারে না। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মনোভাবের মূল্যায়ন করা স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের অংশ।

আমি আশা করি, পাঠকদের সামনে আমি যা কিছু উল্লেখ করেছি এসব কিছু আমার জন্যে এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনবে। হে আল্লাহ তায়ালা! আমরা যা কিছু প্রকাশ করি এবং যা কিছু গোপন করি সবই তোমার জানা আছে। আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর দৃষ্টি থেকে গোপন নেই।

হযরত ওমর (রা.) তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনেকটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরাকে কিছু সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে সরকারী খাস জমি বন্টন করা হয়েছিলো। এরপর হযরত ওমর (রা.) নতুন ভূমিনীতি ঘোষণা করেন। সাহাবিদের অনেকে সমালোচনা করেন কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তার ঘোষিত নীতিতে অবিচল থাকেন। ইতিহাসে এ সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণও পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমত ছিলো যে, অধিকৃত ভূমিসমূহ মুসলমানদের সম্মিলিত মালিকানা হিসেবে বায়তুলমাল ও ক্ষমতাসীন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

হযরত ওমর (রা.) এবং ভূমি প্রশাসন

৮

অষ্টম অধ্যায়

হযরত ওমর (রা.) ও ভূমি প্রশাসন

অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনার জন্যে আমি এ বিষয়ের অবতারণা করিনি। সব সরকার অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর প্রথমেই গুরুত্বারোপ করে। এটি আসলেও একটি গুরুত্ব পাওয়ার মতো বিষয়। কিন্তু আমি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত ওমর (রা.) এজতেহাদ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করতে চাই। তার রাজনীতি, অর্থ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা, সামাজিক সংস্কার, আইন প্রতিটি বিষয়ই প্রশংসনীয়।

গনিমতের মাল এবং ফাঈ

গনিমতের মাল বন্টনের প্রচলিত রীতি সবাই জানেন। কিন্তু ফাঈ-এর জমি প্রথমবার ইরাক জয়ের পর মুসলমানদের হাতে আসে। হযরত ওমর (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, গনিমতের মাল হিসেবে জমি বন্টন করা হবে না বরং জমিকে সামরিক-বেসামরিক লোক সবার জন্যে জীবিকা উপার্জনের একটি উপায় হিসাবে রাখা হবে। এ ব্যাপারে লোকদের মতামত ছিলো বিভিন্ন রকম।

প্রথমদিকে মোজাহেদরা যুদ্ধের সকল সাজ-সরঞ্জাম নিজেরাই তৈরী করতেন। গনিমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট ধনসম্পদ মোজাহেদদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো। সূরা আনফালের প্রথম আয়াত এবং একচল্লিশ নং আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশ নাযিল হয়েছে। সেই নির্দেশে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে গনিমতের মালের মালিকানা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর করুণায় এক পঞ্চমাংশ রেখে অবশিষ্ট জিনিস মোজাহিদদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছেন।' সেই সময়ে যেসব এলাকায় যুদ্ধ হতো যেসব এলাকায় গনিমতের মাল হিসেবে সাধারণত ভেড়া, বকরি, উট, বর্শা, তলোয়ার কখনো কিছু নগদ অর্থও পাওয়া যেতো। কিন্তু মোজাহেদরা ইরাকে পৌছে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। সেখানে জনপদ, জমি, বাগান সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া ছিলো ক্ষতিকর। কারণ এতে একদিকে জমির উৎপাদন প্রভাবিত হতো অন্যদিকে উম্মতের ব্যাপক আমদানি কিছু সংখ্যক লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যেতো। হযরত ওমর (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, জেহাদের পাওনায় সমগ্র উম্মতের অধিকার রয়েছে। এ কারণে উম্মতের নামে সম্মিলিত উপার্জনের ব্যবস্থা থাকা ছিলো জরুরী।

ইরাক বিজয় ও খাসজমি, ইরাকের বিজয়ের পরপরই সিরিয়া, মিসরের উর্বর ভূমি এলাকায় ইসলামী বাহিনীর বিজয় অভিযান চলতে থাকে। কৃষি উৎপাদনের জন্যে এসব এলাকা ছিলো বিখ্যাত। হযরত ওমর (রা.) তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনেকটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরাকে কিছু সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে সরকারী খাস জমি বন্টন করা হয়েছিলো। এরপর হযরত ওমর (রা.) নতুন ভূমিনীতি ঘোষণা করেন। সাহাবাদের অনেকে সমালোচনা করেন কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তার ঘোষিত নীতিতে অবিচল থাকেন। ইতিহাসে এ

সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণও পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমত ছিলো যে, অধিকৃত ভূমিসমূহ মুসলমানদের সম্মিলিত মালিকানা হিসেবে বায়তুলমাল এবং ক্ষমতাসীন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। স্থানীয় লোকদের সে জমি কৃষিকাজের জন্যে রাজস্ব নীতির ভিত্তিতে দেয়া হবে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর ব্যয় সরকারকেই বহন করতে হবে। তাছাড়া ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পৃথক আয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অধিকৃত জমি মোজাহেদদের মধ্যে বন্টনের দাবী শুনে তিনি বললেন, ভবিষ্যত বংশধর এবং আগামীর প্রয়োজনের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন না হলে অধিকৃত এলাকার জমি রসূল (স.)-এর সময়ের নিয়ম মতো বন্টন করা যেতো। রসূল (স.) খয়বর বিজয়ের পর মোজাহেদদের মধ্যে খয়বরের জমি বন্টন করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ও তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

এটি ছিলো একটি জটিল এবং নাজুক বিষয়। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তার স্বভাবজাত দূরদর্শিতা, মেধা এবং সাহসিকতার মাধ্যমে এ সিঁদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সবার কাছেই খলীফার এ সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর মনে হয়েছিলো। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে সঙ্গত যুক্তি পেশ করেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিলো যে, হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত মুসলিম জাতির জন্যে ছিলো কল্যাণকর। হযরত ওমর (রা.) ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফতকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত যদিও নতুন ছিলো কিন্তু তিনি সেসব সিদ্ধান্ত কোরআন সুন্নাহর আলোকে নিয়েছিলেন। রসূল (স.) তার এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) জামায়াতে তারাবীহর নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সকল সাহাবা তার এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। এটি ছিলো নতুন কাজ, কিন্তু উত্তম এবং প্রশংসনীয়। কোরআন হাদীসে এর বৈধতা বিদ্যমান ছিলো। সাহাবাদের এজমায় এ ব্যবস্থাকে সুন্নত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিলো। একইভাবে খাস জমি সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন আলোচনা সমালোচনার পর সাহাবারা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন।

প্রথমদিকে মোজাহেদরা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয়ে জেহাদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিত্তবান সচ্ছল মুসলমানরা সাধ্যমতো অর্থ সাহায্যও দিতেন। সফরের পাথেয় এবং যুদ্ধাস্ত্রের অভাবে বহু মোজাহেদ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও জেহাদে অংশ নিতে সক্ষম হতেন না। এ জন্যে দুঃখে মর্মবেদনায় তারা অশ্রুপাত করতেন। অপারগতা এবং সামর্থ্যহীনতার কারণে যদিও তারা জেহাদে অংশ নিতে পারতেন না, তবু জেহাদের ময়দানে যেতে না পারাকে তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করতেন। (দ্রষ্টব্য সূরা তওবা, আয়াত ৯১, ৯৩)

প্রথমদিকে মোজাহেদরা যুদ্ধের ব্যয় নিজেরাই বহন করতেন। এ কারণে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা ছাড়াও তারা গনিমতের মালের অংশ পেতেন। নতুন যুগে নতুন ব্যবস্থায় পুরনো নিয়ম বদলে গেলো। এ সময় মুসলিম মোজাহেদদেরকে কাফেরদের সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষিত সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে হচ্ছিলো। এ জন্যে মুসলিম সেনাবাহিনীকেও সুসংগঠিত করা হয়েছিলো। সৈন্যদের সরকারের পক্ষ থেকে বেতনভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেয়া হতো। রোম এবং ইরানী সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এবং রসূল (স.)-এর দাবী ছিলো জানমাল দিয়ে জেহাদ করতে হবে। মাল অর্থাৎ আর্থিক সহায়তাকে প্রাণের আগে উল্লেখ করা হয়েছিলো। সেটাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো।

কোনো কোনো ফেকাহবিদের মতে জেহাদে আর্থিক সহায়তা শারীরিক উপস্থিতির চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এতে বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। তারা যুক্তি দেখান যে, অর্থসম্পদ জেহাদের জন্যে দান করা হলে সেটা আল্লাহর পথে ব্যয় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জান বা শারীরিকভাবে জেহাদে অংশগ্রহণের পর সেই মোজাহেদ শহীদ না হয়ে সহি সালামতে ফিরেও আসতে পারেন। রসূল (স.) চেয়েছিলেন মোজাহেদদের যুদ্ধের ব্যয় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ফান্ড থেকে পরিশোধ করা হোক। কিন্তু সেই সময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ের মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। হযরত ওমর (রা.) -এর সময়ে জেহাদের ব্যয় পরিশোধের মতো সঙ্গতি রাষ্ট্রে তৈরি হয়েছিলো। কাজেই হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত দৃশ্যত নতুন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সুন্নতে রসূল (স.)-এর অনুসরণই ছিলো। পরিস্থিতি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। তিনি জানতেন যে, বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে মানসিক আভ্যন্তরীণ বিষয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিচার্য।

সাহাবাদের মতপার্থক্য

যেসব সাহাবা হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), বেলাল (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সালমান ফারসী (রা.)। পক্ষান্তরে যারা হযরত ওমর (রা.)-কে সমর্থন করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ। হযরত মায়া'য ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত এ সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে আমি যা উল্লেখ করেছি, ঐতিহাসিকরা তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে সেসব বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আগ্রহী পাঠকরা ইতিহাস থেকে তাদের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে পারেন। আমি শুধু বলতে চাই বর্তমানকালের অর্থনীতিবিদরা বর্তমান উন্নতি-অগ্রগতি ও প্রগতির যুগে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন হযরত ওমর (রা.)। চৌদ্দশত বছর আগেই সে সম্পর্কে পথনির্দেশ দিয়ে উম্মতের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখনো হযরত ওমর (রা.)-এর সকল সিদ্ধান্তকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল মনে হয়।

কেউ কেউ মনে করেন হযরত ওমর (রা.)-এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তে মুসলিম মিল্লাতের যুদ্ধবিদ্যা প্রভাবিত হয়েছিলো। আমি মনে করি, একথা ঠিক নয়। যদি তা হয়েও থাকে তবে হযরত ওমর (রা.)-এর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র অস্বীকার করা যাবে না। প্রথমদিকে হযরত ওমর (রা.) সৈনিকদের মধ্যে কিছু জমি ভাগ বাঁটোয়ারা করেছিলেন কিন্তু পরে সেই জমি ফেরত নিয়েছিলেন। কেতাবুল খারাজ-এ ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালির গোত্র কাদেসিয়ার যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সামরিক তৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলো। ফলে বিজিত এলাকার এক চতুর্থাংশ তাদের দিয়ে দেয়া হয়। পরে হযরত ওমর (রা.) গোত্রীয় নেতা হযরত জরীর (রা.)-কে প্রদত্ত জমি ফেরত দিতে বলেছিলেন। হযরত জরীর (রা.) সেই গৃহীত জমি বায়তুলমালে ফেরত দেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত জরীরকে (রা.) আশি দীনার পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমি মনে করি বিশাল এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসার পরই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। প্রথম কয়েক বছর এ কারণে পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথমদিকে গনীমতের মাল বিষয়ক যে ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো পর্যায়ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটানো হয়। এর মধ্যে যুক্তি ছিলো। ইসলামের সকল বিধানই যুক্তিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা মদ নিষিদ্ধ করার আগে মদের অপকারিতা উল্লেখ করে কোরআনের আয়াত নাযিল করেন। অসুখ হলে রোগীকে পরিমিত

পরিমাণে ওষুধ খাওয়ানো হয়, তাই বলে অধিক ওষুধ একত্রে খাইয়ে দেয়া কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এতে হিতে বিপরীত হয়।

যেসব সাহাবারা হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের কাছে যুক্তি ছিলো। হযরত ওমর (রা.) এবং তাকে সমর্থনকারীদেরও যুক্তি ছিলো। হযরত ওমর (রা.) তার মজলিসে শূরার সদস্যদেরকে তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেসব সৈনিককে জমি দেয়া হয়েছিলো তাদের কাছ থেকে জমি ফেরত নেয়া হয়েছিলো। তবে যুক্তি দিয়ে তাদের তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোনো কোনো সৈনিক বিনামূল্যে জমি ফেরত দিয়েছিলেন। কেউ কেউ মূল্য বিনিময়ে ফেরত দেন। এ ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) কোনো প্রকার কড়াকড়ি আরোপ করেননি, কঠোর ব্যবস্থাও নেননি। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, হযরত বেলাল (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং এ বিরোধিতায় ছিলেন অটল অবিচল। হযরত ওমর (রা.) তখন আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে বেলাল থেকে মুক্তি দাও।

হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কোরআনী দলীল

হযরত ওমর (রা.) মজলিসে শূরার সদস্যদের সাথে তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেছিলেন, আমি কোরআনের একটি দলীল পেয়েছি, এতে আমার মন শান্ত হয়েছে। কোরআনের আয়াতের নির্দেশনায় বোঝা যায়, এসব জমি বন্টন করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের কাছেই থাকা সমীচীন। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) সূরা হাশর-এর ছয় থেকে দশ আয়াতের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের কাছে থেকে তাঁর রসূলকে যে ফাঈ দিয়েছেন তার জন্যে তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ তায়ালা তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তায়ালা তো এ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর রসূল (স.)-এর, রসূল (স.)-এর স্বজনদের এবং এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা নিতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দানে কঠোর। এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাযিরদের জন্যে যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর সাহায্য করে। ওরাতো সত্যাশ্রয়ী। মোহাজেরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মোহাজেরদের ভালোবাসে এবং মোহাজেরদের যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করে না। আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে মাফ কর এবং মোমেমনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমিতো দয়াদ্র, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, আয়াত ৬-১০)

হযরত ওমর (রা.) কোরআনের তাফসীর এবং তাঁবির ভালোভাবেই জানতেন। এ কারণে তিনি ভবিষ্যতের জন্যে কোরআনের হেদায়াতকে বুঝেছিলেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সঠিক বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়াও মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের নূর দিয়ে

আলোকিত করেছিলেন। তার সিদ্ধান্ত ফেকাহবিদ এবং মোহাদ্দেসীনদের জন্যে মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়ে থাকে।

খাস জমি এবং ফেকাহবিদদের অভিমত

হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফত আমলে ইসলামী খেলাফতকে মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত হিজরী সাল হযরত ওমর (রা.) চালু করেছিলেন। অফিসিয়াল ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তাকর্মচারীর ব্যক্তিগত রেকর্ড সংরক্ষণও তার সময়েই চালু করা হয়েছিলো। সামরিক বাহিনীর জওয়ান এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাকর্মচারীদের সংখ্যা এবং চাকুরির প্রকৃতিও হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে প্রথম রেকর্ড করা হয়। তহশীলদারী ব্যবস্থাও সেই আমলে আবিষ্কৃত হয়। কাজেই সরকারী খাস জমির উপরোক্ত বিষয় কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। ফেকাহবিদরা খাস জমি সম্পর্কে তাদের মতামত তাদের গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইনা। শুধু বলতে চাই যে, ইমাম মালেক (র.) অভিমত দিয়েছেন, ক্ষমতাসীন শাসক মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে খাস জমি ওয়াকফ করে দিতে পারেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, ক্ষমতাসীন সরকার মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাস জমির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। জমি যাদের দেয়া হয়েছিলো তারা যদি স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দিতে রাযি হয় তবে শাসক সেই জমি ওয়াকফ করতে পারে। যদি কেউ নিজের অংশ দাবী করতে থাকে এবং কোনোক্রমেই দাবী ত্যাগ করতে রাযি না হয় তবে তার জমির অংশ বা মূল্য তাকে দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, ক্ষমতাসীন শাসক ইচ্ছে করলে সেই জমি বন্টন করে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে ওয়াকফ করে দিতে পারেন। তবে তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা অবশ্যই জনগণের কল্যাণে হতে হবে।'

হযরত ওমর (রা.)-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন সেই সিদ্ধান্ত ছিলো সঠিক ও কল্যাণকর।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত ওমর (রা.)-এর সমগ্র জীবনই ছিলো মর্যাদাসম্মান এবং কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। তবে তার ওপর জীবন বিনাশী হামলা এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়কাল ছিলো সমগ্র মানব জাতির জন্যে সর্বাধিক শিক্ষণীয় বিষয়।

হযরত ওমর (রা.) তাকওয়া, ন্যায়বিচার, সততা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুণাবলীতে শোভিত ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তার সময়কালের সর্বাধিক পূন্যবান মানুষদের অন্যতম ছিলেন। সে সময়ে তার চেয়ে অধিক পুণ্যবান মানুষ অন্য কেউ ছিলেন না। এই মহা মানুষকে একজন নিকৃষ্ট মানুষ আঘাত করে সে ইতিহাসে কালো তালিকাভুক্ত মানুষের মধ্যে শামিল হয়েছে। হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মপদ্ধতির কারণে আল্লাহর যমীনে মানুষ সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করেছিলো। তার প্রতি যে ব্যক্তি অত্যাচার করেছিলো তার সাথেও তিনি ভালো ব্যবহার করেছিলেন।

মৃত্যুর সময় কখনোই পরিবর্তিত হয় না

হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর যখন আততায়ী হামলা করেছিলো সে সময় তিনি শুধু ওযুসহই ছিলেন না বরং সেই মুহূর্তে নবীজীর মেহরাবে নামাযে ইমামতি করছিলেন। ওযু মোমেনের হাতিয়ার, নামায হচ্ছে মোমেনের মে'রাজ। এই হাতিয়ার থাকা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) অত্যাচারী দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়েছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তিনি এমন সময়

শহীদ হয়েছিলেন যখন তিনি ছিলেন মুসলমানদের সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে কল্যাণকামী এবং মুসলিমঅমুসলিম নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রত্যার্পণকারী

তার চিন্তায় ও কাজে অপরিচ্ছন্নতার এবং অস্পষ্টতার কণামাত্র ছিলো না। তার মন ছিলো কোমল, তিনি ছিলেন কারো প্রতি যুলুম অত্যাচার থেকে মুক্ত। হযরত ওমর (রা.) শাহাদাতের আগে চিন্তা করেছিলেন যে, তার আততায়ীর মনিবকে বলবেন সে যেন দাসটির সাথে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু সে কথা বলার সময় তিনি পাননি। এর আগেই সেই দাস হযরত ওমর (রা.)-কে আঘাত করলো। সেই আঘাতে তিনি শহীদ হলেন।

নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু এবং ভাগ্য কখনো পরিবর্তন করা যায় না। হযরত ওমর (রা.) তার ব্যক্তিত্বের এমন প্রখরতা বজায় রাখতেন যে, তার সামনে বসে অনেকেই মুখ খুলতে সাহস পেতো না। কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তার প্রতি হামলা ঠেকানো যায়নি এবং তার মৃত্যুও ঠেকানো যায়নি। দারুল খোলাফার মধ্যে এবং সঙ্গীসাথীদের উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর হামলা করা হয়। মসজিদে নববীর ভেতরে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগানে হযরত ওমর (রা.) তখন অবস্থান করছিলেন। সেই পবিত্র জায়গাও মৃত্যুর আগমন ঠেকাতে কেউ সক্ষম হয়নি।

বন্ধুদের সান্নিধ্যে মৃত্যু

হযরত ওমর (রা.) বরকতময় সময়ে আততায়ীর হামলার শিকার হয়েছিলেন। নামাযের সময়ে মানুষকে আল্লাহর রহমত ঘিরে রাখে। খুশ-খুযুর, আশা-নিরাশা, দোয়া কবুলিয়াতের সেই সময়ে বান্দা আল্লাহর খুব কাছে পৌঁছে যায়। নামাযের সময়ে একমাত্র মোনাফেকরাই মসজিদ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও নির্ধারিত মৃত্যুকাল ঠেকানো যায়নি। হযরত ওমর (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

ফজরের নামাযের ইমামতি, মসজিদে নববীর মেহরাব, সাহাবাদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন অন্তর, যেকের, দোয়ায় সিক্ত জিহ্বা, এতো সব নেয়ামত সত্ত্বেও আততায়ীর হামলা রোধ করা যায়নি। সেই হামলা ছিলো ভাগ্যলিখন। হযরত ওমর (রা.) শাহাদাতের সময়ে সেইসব সাথীদের মধ্যেই পরিবেষ্টিত ছিলেন, যারা তাকে ভালোবাসতেন এবং তার জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সেই সব নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি, তাদের উচ্চতর সংকল্প, বাহুবল, প্রেরণা এতোসব কিছুও এ অপরাধ ঠেকাতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহর সিদ্ধান্ত কেউ কি ঠেকাতে পারে?

হযরত ওমর (রা.) যখন শহীদ হয়েছিলেন তখন তার পাশে অসংখ্য লোক ছিলো, অথচ আততায়ী ছিলো একা। ইসলামী খেলাফত ইতিমধ্যেই মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যায়ভাবে হত্যা এবং রক্তপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।। অন্যায়ভাবে হত্যা এবং রক্তাপাতকে ভয়াবহ অত্যাচার এবং ঘৃণ্য কাজ মনে করা হতো। মুসলিম উম্মাহর শক্তি অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কিছুই এই অপরাধটি বন্ধের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

আল্লাহর সিদ্ধান্তের রহস্য

স্থান কাল, সমাজ, পরিবেশ, বন্ধু, সাহায্যকারী, অনুভব অনুভূতি, ব্যক্তি, ব্যক্তির শক্তি, দুর্বলতা ইত্যাদি আমরা আমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনায় নির্ণয় করে থাকি। আল্লাহর প্রাজ্ঞ বিবেচনায় আমাদের অপূর্ণ বিবেচনার গুরুত্ব কতটুকু? আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর কাছে ওমর (রা.)-এর মর্যাদা অনেক। আল্লাহ তায়ালা তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তা সত্ত্বেও একজন দুর্বৃত্ত কাফেরের হাতে তাকে শহীদ হতে হলো। এটাকে আল্লাহর কুদরতের এক বিস্ময়কর কারিশমা বলা যায়। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু যা হয়েছে সেটাই ছিলো তাঁর ইচ্ছা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধুদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখেন। অবশ্য তাদের সাহায্য

করেন না এমন কথা চিন্তা করা আদৌ ঠিক হবে না। আল্লাহর শত্রুদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধুদের ওপর বিজয়ী হবার সুযোগ দেন এমন মনে করাও ঠিক হবে না। হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সেটা আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে। আল্লাহর সিদ্ধান্তের রহস্য আল্লাহ তায়ালা নিজেই জানেন, সেটা কোনো বান্দার পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

মানুষের জীবনে যখন বালামসিবত এবং পরীক্ষানিরীক্ষা আসে তখন শয়তান তার মনে সন্দেহ সংশয় জাগিয়ে দিতে শুরু করে। এ সময় দুর্বল ঈমানের লোক এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদেরকে শয়তান নানা রকম ফেতনা ফাসাদে লিপ্ত করে। সবকিছু সহজ স্বাভাবিক থাকার সময়ে মানুষ যথেষ্ট সাহস দেখায়। কিন্তু কোনো সমস্যা দেখা দিলে, বা বিপদের সম্মুখীন হলেই মানুষের সাহস হারিয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর মোখলেছ বান্দারা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বিপদ-আপদ, সুখ-শান্তি সর্বাবস্থায় তাদের উচ্চারণ হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পথ

হযরত ওমর (রা.) যেভাবে শাহাদাত বরণ করলেন সেটা তার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পথ বলা যায়। আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসেবে উপস্থিত হওয়ার আগে তিনি মসজিদে নববীতে নামাযের ইমামতি করছিলেন। এই নামায হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়। শহীদে মেহরাবের শাহাদাতের কথা কি বলবো? রসূল (স.) নিজেই তো তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারই সাথে শাহাদাতের সৌভাগ্যের বাণীও শুনিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত ওমর (রা.) তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে এক বিন্দুও দূরে সরে যাননি। তিনি ছিলেন যথাক্রমে মুসলিম, এখলাছের অধিকারী, অর্থাৎ প্রকৃত নিষ্ঠাবান, মোমেন, মোহছেন, মোত্তাকী, আমলকারী, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাবের অধিকারী, আল্লাহর আদেশের যথাযথ পালনকারী, জ্ঞানী, ফকীহ, বাহাদুর, উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন ও চূড়ান্ত আত্মসংযমী। একই সাথে ন্যায় ও সুবিচারের ফয়সালাকারী। সকল নেকী সকল পুণ্যের ওপর আমলকারী, সকল প্রকার পাপ ও অন্যায়ের কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র পরিচ্ছন্ন।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাত তার জন্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পথ তৈরি করেছে, আর আমাদের জন্যে রেখে এক গেছে উচ্চতর শিক্ষা ও আদর্শ। এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রা.) শাহাদাতের যে ইচ্ছা পোষণ করতেন সেই শাহাদাত তার নসীব হয়েছে।

হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় এ শিক্ষা আরো বেশী প্রমাণিত হয়। তারা দু'জনও শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই তিনজন যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হননি বরং যুদ্ধ ছাড়াই তারা ইসলামের শত্রুদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন।

ঈমান ও পরীক্ষা

হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষার মধ্যে পড়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় তার জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিলো। আমাদের ওপর যদি কোনো পরীক্ষা আসে তবে এতে আমরা যেন অবাক না হই। মনে রাখা আবশ্যক, কোনো ক্ষেত্রেই আমরা কেউ হযরত ওমর (রা.)-এর ধারে কাছে পৌঁছার যোগ্যতাও অর্জন করিনি। এমন দাবী কেউ করতেও পারবে না। বিপদ, মসিবত এবং পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে। এ বিষয়ে রসূল (স.)-এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে।

রসূল (স.) বলেছেন, মানুষ আনুগত্য এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে যতোই এগিয়ে যাক না কেন তারা তাদের সমমর্যাদায় পৌঁছুতে পারবে না, যারা আনুগত্যের সাথে আল্লাহর পথে তার দেয়া পরীক্ষার

সম্মুখীন হয় এবং শহীদ হয়। এটা আল্লাহর কৌশল। এই হেকমত এই কৌশলের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে তিনি ছাড়া কারোই কোনো ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের অনুসারী বলে পরিচিত এবং দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে পরিচয়দানকারী অনেক মানুষকে দেখা গেছে তারা পরীক্ষার সামান্য ঝটকায় এবং সামান্য কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেই নিজেদেরকে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত করেন। শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে এবং সেই মন থেকে আওয়ায উঠে যে, আমরা কি দ্বীনের হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করি না? আমরা কি মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্যে চেষ্টা করছি না? আমরা কি মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করছি না? মানুষের কি হয়েছে, কেন তারা তোমাদের জানের দুশমন হয়ে গেছে? ওদের এবং তোমাদের মধ্যে কি পুরাতন শত্রুতা আছে? কিছু লোক তোমাদের জানের দুশমন, আর বহু লোক তোমার সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিছু লোক তোমার কথার সাথে একমত, তোমার দাওয়াতকে ভালো মনে করে, কিন্তু তারা তোমাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। তারা তোমার জন্যে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে, তোমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দেয়, তোমার হাতে চুম্বন করে এবং তোমার বিপদমসিবতে আফসোস করাই যথেষ্ট মনে করে। এরচেয়ে বেশী কিছু তারা করে না। কিছু লোক আছে যারা তোমার সমালোচনা করে যে, তুমি এসব বিপদ মসিবতকে নিজে থেকেই ডেকে এনেছ? এ রকম উটকো ঝামেলায় জড়ানোর কি দরকার ছিলো? কেউ যখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না, তোমার আত্মত্যাগের প্রশংসা করছে না, তখন এসব কাজে কি লাভ? শয়তান এসব কুমন্ত্রণা মানুষের মনে ছড়িয়ে দেয়। মনে হয়, দ্বীনের পথে যারা চলে তারা যেন মানুষের কাছেই পুরস্কার পেতে চায়।

শয়তান তার কাজ করে চলেছে। প্রবৃত্তি বা নফসে আম্মারা আল্লাহর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় দুর্বল, কম সাহসী লোকেরা আল্লাহর পথে চেষ্টা থেকে বিরত থাকছে। নীরবে নির্জনে বসে প্রশ্ন তোলে যে, এই আদর্শ কিভাবে বিজয়ী হবে, কিভাবে সফল হবে যখন ইসলামের শত্রুরা তথা সত্যের বিপরীত বলয়ের লোকেরা শক্তি, প্রভাবপ্রতিপত্তি, অর্থসম্পদ ও আয় উপকরণের অধিকারী? সংকীর্ণ মনের এসব মানুষ মনে করে যে, দুনিয়ার অস্থায়ী তুচ্ছ নেয়ামত নিয়ে যারা খেলা করে তারা ভাগ্যবান।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান থাকলে, তাঁর কুদরত ও হেকমতের ওপর বিশ্বাসী হলে, মানুষ এ ধরনের কুমন্ত্রণা এবং শয়তানী হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। ওদের অবস্থা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে এজন্যে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। যখম হওয়ার পরও যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯-১৭২)

অন্যত্র উভয় শ্রেণীর মানুষের আলোচনা একত্রে করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর এবাদাত করে দ্বিধার সাথে, তার মঙ্গল হলে এতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপদ ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখেরাতে। এটাতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো অপকার করতে

পারে না, উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি। সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কতো নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কতো নিকৃষ্ট এই সহচর। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রবেশ করাবেন (এমন) জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই করেন। যে কেউ মনে করে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রশি ঝুলিয়ে নিক, পরে (রশি বেয়ে উঠে ওহী আগমনের ধারাকে) বিচ্ছিন্ন করুক। তারপর দেখুক, যে (ওহীর) জিনিসের প্রতি তার এত আক্রোশ এই কৌশল তা দূর (বন্ধ) করতে পারে কিনা।' (সূরা হজ্জ, আয়াত ১১-১৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'মানুষের মধ্যে কতক বলে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের কাছ হতে কোনো সাহায্য এলে ওরা বলতে থাকে, আমরাতো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। বিশ্বাসীর অন্তঃকরণে যা আছে আল্লাহ তায়ালা কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মোনাফেক।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত ১০-১১)

আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি। আমাদের ঈমানের গভীরতা এবং দৃঢ়তা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন। বর্তমানে আমাদের অবস্থা হচ্ছে এ রকম যে, যদি আমাদের কোনো ক্ষতি হয়, অথবা ভয়,ক্ষুধা, সম্পদহানি ইত্যাদি দিয়ে যদি আমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় তবে আমরা বলি, এ মসিবত এলো কোত্থেকে? আমাদের কেন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হলো? যেসব লোকের ঈমান মযবুত তারা এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করে, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পাঠ করে আল্লাহর রহমত এবং তার হেদায়াতের যোগ্যতা অর্জন করে।

ভাগ্যে যা আছে তা হবেই

ভাগ্য পরিবর্তন করার মতো কোনো শক্তি আমাদের নেই। আমরা চাই অথবা না চাই ভাগ্য তার কাজ করেই যায়। মোমেনের ঈমান তা প্রতিরোধ করতে পারে না। কাফেরের ওপর ভাগ্য লেখা তার কুফুরীর কারণে এসে পড়ে। যারা আল্লাহর যতো প্রিয় তাদের পরীক্ষাও ততো কঠিন। রসূল (স.) বলেছেন, সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষা আসে নবীদের ওপর। এরপর নবীদের নেককার উম্মতদের ওপর। পর্যায়ক্রমে ঈমানের শক্তি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন।

রসূল (স.) বলেছেন, চারটি বিষয়ের ওপর ঈমান ছাড়া কোনো ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন হতে পারে না। (১) আল্লাহর তাওহীদ ও আমার রেসালত। (২) মৃত্যুর ওপর ঈমান। (৩) মৃত্যুর পরের জীবনের ওপর ঈমান। (৪) ভালোমন্দ আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে এর ওপর ঈমান।

ভাগ্যের ওপর ঈমান শুধু মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় না। বরং অংগপ্রত্যংগ, কথা, কাজ এবং মনের বিশ্বাস, সবকিছু মিলিয়েই ঈমান অর্জন করা যায়। বিপদ মসিবত এলে মানুষকে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বুঝতে হবে এ পরীক্ষা আল্লাহর নির্ধারণ করা ভাগ্যের কারণেই ঘটেছে। সে অবস্থায়ও আল্লাহর প্রশংসা অব্যাহত রাখতে হবে। বিপদ মসিবত সময়ে সময়ে আসতেই থাকবে। মোমেন বান্দা আনন্দের সময়ে যেমন আল্লাহকে স্মরণ করে, ঠিক তেমনি বিপদ-মসিবত ও দুঃখ-কষ্টের সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করবে। কখনোই তাকে ভুলে থাকবে না। বান্দার আমল হলো তার শোকরের নিদর্শন। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ'মালু আলা দাউদা শোকরা। অর্থাৎ তোমরা দাউদের পরিবার পরিজনের মতো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

রসূল (স.) বদর ইবনে আবদুল্লাহকে বলেছিলেন, হে বদর প্রত্যেক সকালে এই দোয়া করবে, আল্লাহর নামে আমার জানমালের ওপর যা কিছু আসুক, আল্লাহর নামে আমার ধনসম্পদ এবং পরিবার পরিজনের ওপর যা কিছু আসুক, হে আল্লাহ তায়ালা! যেহেতু তুমি আমার জন্যে ফয়সালা করেছো কাজেই তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো। তোমার ওপর সন্তুষ্ট থাকার শক্তি দাও। আমার জন্যে তুমি যা কিছু অবশিষ্ট রেখেছো তার মধ্যে আমাকে ক্ষমা মঞ্জুর করো। আমার স্বভাব এমন করে দাও যাতে আমি তোমার বিলম্বিত বিষয়ে তাড়াহুড়া না করি এবং তোমার তরফ থেকে তাড়াতাড়ি আসা বিষয়ে দেরী করার ইচ্ছা প্রকাশ না করি।

সকল মানুষ আনন্দ বেদনা উভয় অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে। মোমেনের জন্যে জরুরী হচ্ছে যে, সে বিপদে মসিবতে ধৈর্য ধারণ করবে।

আনন্দে, সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে শোকরিয়া আদায় করবে। আফসোস করে ক্ষতির প্রতিকার হয় না। শুধুমাত্র আনন্দ করা মোমেনের গুণ নয়। ক্ষতির সম্মুখীন হলে হতাশ হওয়া যাবে না এবং আনন্দ খুশীর সময় সীমালংঘন করা যাবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জানমাল কোরবানীর মাধ্যমেই ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহর বিধানের সামনে নিজের প্রবৃত্তিকে কোরবানী দিতে হবে। রসূল (স.) একটি হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর দেয়া নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ে বান্দার প্রতি সবয়েছে বেশী খুশী হয়ে থাকেন। অন্য কোনো আমল এই শোকরিয়ার মতো আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। কেননা এ ধরনের মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার মহান সত্তা, ফেরেশতা, কেতাব রসূল এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের ওপর ঈমান আনার তওফিক দিয়েছেন।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তুমি নিজের প্রিয় জিনিস অর্জনে তখনই সক্ষম হবে যখন নিজের প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করবে। তোমরা আকাংখা তখনই পূর্ণ হবে যখন তুমি অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্য ধারণের সাহস অর্জন করবে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের পরীক্ষা

মোমেনদের সকল প্রকার পরীক্ষা তার পাপের শাস্তি নয় বরং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরাম কোনো পাপ করেন না, প্রবৃত্তির দাসত্ব করেন না, তবু তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। আম্বিয়ায়ে কেরামের এসব পরীক্ষা মোমেন বান্দার জন্যে 'উসওয়ায়ে হাসানা' বা উত্তম আদর্শ। এসব ঘটনার দ্বারা মোমেন বান্দা মনে সাহস লাভ করে এবং আল্লাহর হেকমত সম্বন্ধে জানতে পারে। রসূল (স.) যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং অসম্ভব রকমের কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর দাত শহীদ হয়েছিলো। দেহ হয়েছিলো রক্তাক্ত। বর্মের কিছু অংশ কপালে ঢুকে গিয়েছিলো এবং তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। সমগ্র মাখলুকের মধ্যে তিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তিনি আল্লাহর মাহবুব। তবুও তাঁর ওপর বারবার পরীক্ষার কঠিন সময় নেমে এসেছে।

ওহুদের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর রসূল (স.) বলেছেন, যে সম্প্রদায় নিজেদের নবীর সাথে এ রকম ব্যবহার করে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে? একথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারাতো যালেম।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ১২৮)

অত্যাচারীর রশি কেন লম্বা করা হয়? যালেম, অত্যাচারী, বিদ্রোহীদের পার্থিব জীবনে প্রায়ই অবকাশ দেয়া হয়। তারা মনে করে যে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু তাদের বর্তমান

অবকাশ হচ্ছে এ জন্যে যে, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের রশি লম্বা করে দেন, যাতে তারা নিজেদের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। তারপর আল্লাহ তায়ালা ছেড়ে দেয়া রশি ধরে টান দেন। এ ঘটনা তখন অন্যদের জন্যে শিক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফেররা যেন মনে না করে যে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আমি তাদের অবকাশ দিই। আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ১৭৮)

ইরানীদের মোকাবেলায় মুসলমানরা কয়েকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। অবশেষে ইরানীরা হস্তিবাহিনী নিয়ে মোকাবেলার জন্যে আসে। মুসলমানদের উট ও ঘোড়া হাতীদের ভয়ে পালাতে থাকে। হযরত কা'কাআ ইবনে আমর মাটি দিয়ে একটি হাতী তৈরি করেন এবং নিজের ঘোড়ার সামনে রেখে ঘোড়ার ভয় ভাঙ্গালেন। যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পর তার ঘোড়া ইরানীদের হাতী দেখে মোটেই ভয় পায়নি। তিনি ইরানীদের হাতীর ওপর হামলা করার জন্যে সামনে অগ্রসর হতে চাইলেন। তাকে বাধা দেয়া হলো। তিনি বললেন, আমি ভয় করি না। আমি যদি মারা যাই আর তার বিনিময়ে মুসলমানরা যদি বিজয় অর্জন করে, তবে সেটা অধিক লাভজনক হবে। তিনি ইরানীদের হাতীকে হত্যা করলেন।

সত্য প্রচারক বা দ্বীনের দায়ী'দের গুণাবলী

হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর হামলার ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রিয় বান্দাদের জন্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তার শত্রুদের যা খুশী তাই করার সযোগ দিয়ে থাকেন। দ্বীনের দায়ী'দের পরীক্ষার কঠিন সময়ে ধৈর্যসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে, নিজের দৃষ্টি আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত পুণ্য ও পুরস্কারের দিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। দ্বীনের দায়ী'র দাওয়াত তো এটাই হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সংগ্রাম সাধনায়, তার পথে চলতে গিয়ে আসা বিপদ মসিবতে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। যদি দাওয়াতের পথে আহ্বানের সময়ে দ্বীনের দায়ী নিজে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টিতে সক্ষম না হয় তবে তাকে রসূল (স.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস স্মরণ রাখতে হবে। রসূল (স.) বলেছেন, কেউ যদি অন্যদের আমল করার আহ্বান জানায় কিন্তু নিজে আমল না করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর নারায থাকেন। এই নারাযি ততক্ষণ পর্যন্ত চলত থাকে যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেও সেই নেকী করতে শুরু করে।

রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে যদি মোমেন বান্দার জন্যে কোনো উচ্চ মর্যাদার ফয়সালা হয়ে যায় এবং সেই মোমেন বান্দা নিজের আমল দ্বারা সেই মর্যাদায় পৌঁছতে না পারে তখন আল্লাহ তায়ালা তার দেহ, অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। সেই বান্দা তখন ধৈর্যের মাধ্যমে তার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যায়, সেই মর্যাদা তার জন্যে তো পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিলো।

এই গ্রন্থ লিখে আমি হযরত ওমর (রা.)-এর পরিচয় তুলে ধরতে চাই না। কারণ তিনি এমনিতেই এতো বেশী পরিচিত যে, আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী নন। তার উচ্চ মর্যাদা তার সম্পর্কে আমার লেখা বা না লেখায় প্রভাবিত হওয়ার মতো নয়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠকদের সাথে আমাদের সোনালী ইতিহাসের পরিচয় করিয়ে দেয়া। আমাদের সেই ইতিহাস বিশ্বের সব ইতিহাসের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং মানবতার উচ্চতর এবং অনুসরণযোগ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চরিত্র ও কাজ হচ্ছে ঈমানের নিদর্শন

ঈমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। সমাজের প্রচলিত নিয়মনীতির অনুসরণ এবং বক্তব্য ও ঘোষণার নাম ঈমান নয়। বরং ইমান হচ্ছে অন্তরের সেই বিশ্বাসের নাম যার সাথে আমল ও কর্মের সত্যিকার প্রকাশ ঘটে। কথা ও বক্তব্যসর্বস্ব ঈমানের কোনো মূল্য নেই। ঈমানের সাথে আমল ও কাজের প্রমাণ পেশ করতে হয়। সূরা আস-সাফ-এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদাররা তোমরা এমন কথা কেন বলো যার ওপর তোমরা আমল করো না। তোমাদের কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।'

সাহাবাদের ঈমান সকল ত্রুটি, সকল অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। তাদের সকল আমল সৌন্দর্যে শোভিত। তারা বিশ্বাসের সত্যতা, আমলের এখলাছের বাস্তব নমুনা। তাদের কোনো ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে ঈমানের নূর তাদের সতর্ক করে দেয়। আখেরাতের জবাবদিহি এবং জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে তারা কেঁপে উঠতেন। দুনিয়াতেই পাপের কাফফারা বা শাস্তি ভোগ করে পাকসাফ হয়ে যেতেন। সাহাবাদের জীবনে এ ধরনের বহু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবার আমর ইবনে ছামুরা (রা.) রসূল (স.)-এর কাছে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি চুরি করেছি। আমি বনু মাজেন গোত্রের উট চুরি করেছি। আমাকে শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দিন। রসূল (স.) বনু মাজেন গোত্রের লোকদের খবর পাঠালেন। তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, সত্য সত্যই তাদের উট চুরি হয়েছে। প্রমাণ পাওয়ার পর রসূল (স.) আদেশ দিলেন যে, আমর ইবনে ছামুরার (রা.) হাত কেটে ফেলা হোক। তারপর আমরের হাত কেটে ফেলা হলো। হযরত ছা'লাবা (রা.) বর্ণনা করেন যে, সেই দৃশ্যের কথা আমার এখনো মনে পড়ে। আমরের কর্তিত হাত দেখে তিনি বললেন, মহান আল্লাহর শোকরিয়া, তিনি আমাকে পবিত্রপরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। হে হাত, তুই আমাকে দোযখে নিয়ে যাচ্ছিলি। এ ধরনের অনুভূতি এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা আমর ইবনে ছামুরাকে কেয়ামতের অবমাননা থেকে রক্ষা করেছে। আখেরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে গেলে, এ জগতে বড়ো রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হলেও কোনো অসুবিধা নেই।

বর্তমানে আমরা হচ্ছি নামমাত্র মুসলমান। আদম শুমারিতে আমাদের নাম মুসলমান হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে আমরা ইসলাম থেক দূরে বহুদূরে অবস্থান করছি। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল। দ্বীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ঈমান আকীদার দুর্বলতা এবং নেক আমল থেকে দূরে সরে যাওয়া আমাদের সকল রোগের মূল কারণ।

সাহাবাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ

সাহাবায়ে কেরামরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে আলোর মিনার তৈরি করেছেন। সেসব ঘটনার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। মুতার যুদ্ধে জাফর ইবনে আবু তালেবের (রা.) উভয় হাত কেটে যাওয়ার পরও তিনি ইসলামের পতাকা মাটিতে পড়ে যেতে দেননি।

আম্মার ইবনে ইয়াসের-এর উভয় কান ইয়ামামার যুদ্ধে কেটে গিয়েছিলো। তবু তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মুসলমানদেরকে শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্যে ক্রমাগত তাকিদ দিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে যাওয়ার আগে হযরত খায়ছামা (রা.) তার পুত্র সা'দকে বলেছিলেন, আমাদের দুজনের যে কোনো একজনকে পরিবার পরিজনের দেখাশোনার জন্যে বাড়ীতে থাকতে হবে। তুমি বাড়ীতে থাকো, আমি যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছি। তার পুত্র হযরত সা'দ (রা.) বললেন, হে আব্বাজান, অন্য কোনো বিষয় হলে আপনাকে আমি নিজের ওপর প্রাধান্য দিতাম। কিন্তু জেহাদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে না। তারপর কে যুদ্ধে যাবে এ নিয়ে লটারী করা

হলো। লটারিতে পুত্র সা'দ-এর নাম উঠলো। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করলেন এবং বীরত্বের পরিচয় দিলেন।

ইরানীদের সাথে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়েছিলো। অবশেষে ইরানীরা হস্তী বাহিনী নিয়ে মোকাবেলার জন্যে এসেছিলো। মুসলমানদের উট এবং ঘোড়া ইরানীদের হাতীর ভয়ে পালাচ্ছিলো। হযরত কা'কাআ ইবনে আমর মাটির একটি হাতী তৈরি করলেন। নিজের ঘোড়াকে সেই হাতীর সামনে রেখে ঘোড়াটির ভয় দূর করলেন। ফলে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে ঘোড়াটি হাতীর সামনে কোনো ভয় পেলোনা। যুদ্ধের ময়দানে হাতীর মোকাবেলায় হযরত কা'কাআ অগ্রসর হতে চাইলে মুসলমানরা বাধা দিয়ে বললেন, হাতী তোমাকে মেরে ফেলবে। তিনি বললেন, যদি আমি মরে যাই তবে কোনো অসুবিধা নেই। মুসলিম বাহিনী সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। তারা ইরানী বাহিনীর হাতী হত্যা করে ফেলেন।

ইয়ামামার যুদ্ধে বনু হানিফা দুর্গবন্দী হয়ে থাকা মুসলমানদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এতে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। হযরত বারা ইবনে মালেক (রা.) বললেন, আমাকে দেয়ালের ওপর তুলে দাও। আমি ওদের সাথে লড়াই করতে করতে দুর্গের দরোজার কাছে পৌঁছে যাবো এবং দরোজা খুলে দেব। তাই করা হলো। হযরত বারা ইবনে মালেক (রা.) দরোজার কাছে গিয়ে দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ফলে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত হলো।

কিশোর মায়া'য-এর হাতে আবু জেহেল নিহত

বদরের যুদ্ধের সময় কিশোর সাহাবী মায়া'য ইবনে আফরা (রা.) অন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, আবু জেহেল কার নাম? তাকে চিনিয়ে দেয়ার পর মায়া'য অগ্রসর হলেন। মায়া'য বলেন, আমি আবু জেহেলের ওপর হামলা করে তার পায়ের গোড়ালি কেটে ফেললাম। ঠিক তখনি আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা এসে আমার বাহুতে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। বাহু ঝুলে পড়লো। আমি পায়ের নীচে ঝুলন্ত বাহু রেখে বাহুটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। হযরত মায়া'য-এর কর্তিত বাহুর জখম পরবর্তীকালে সেরে গিয়েছিলো। তিনি হযরত ওসমানের (রা.) খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুসলমানরা আল্লাহর পথে সবকিছু কোরবানী করে দিতেন। তাদের বুক ঈমানের আলোয় ঝলমল করতো। আল্লাহর ওপর তাদের পূর্ণ ভরসা ছিলো। ঈমানের ফল আমল হিসেবে মানুষের সামনে প্রকাশ পেতো। ইতিহাসের পাতায় আমরা সেসব দেখতে পাই। এসব ঘটনা আমি এ কারণেই বর্ণনা করছি যাতে ঈমানের দাবীদাররা আত্মসমালোচনা এবং আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম হয় এবং ঈমানের শক্তি মযবুত হতে পারে। পরে তা ঈমানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারে।

আল্লাহর ফয়সালা হেকমতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর ফয়সালার সমালোচনা করা আমাদের কাজ হওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করা। তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা। অনুভূতি এবং সাক্ষ্য দ্বারা মানুষ যে কোনো বিষয় বুঝতে পারে। আমি বলতে চাই, যখন কোনো আবিষ্কারক কোনো কিছু আবিষ্কার করে তখন আবিষ্কারকের প্রতিভা এবং দক্ষতার ওপর আমরা আস্থা স্থাপন করি। দিন-রাতের পরিশ্রমের পরই একটি মেশিন তৈরি করা হয়। সেই মেশিন সম্পর্কে মেশিনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্পর্কে কিছু না জেনে কেউ যদি সমালোচনা করতে শুরু করে তবে মানুষ তাকে পাগল ভাবতে শুরু করবে। মেশিনের যন্ত্রপাতি কল-কবজা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলার জন্যে কেউই তাকে অনুমতি দেবে না। সেই ব্যক্তির পান্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় বাগাড়ম্বরের কোনো গুরুত্ব নেই। সেই ব্যক্তির বক্তব্যকে বাহুল্য বলে সবাই প্রত্যাখ্যান করবে।

একইভাবে ধরা যাক, একজন নির্মাণ প্রকৌশলী একটি অট্টালিকা বা একটি মসজিদ তৈরি করছেন। তার সামনে রয়েছে ইট পাথরের বিরাট স্তূপ। তিনি ইচ্ছেমতো যে কোনো পাথরকে ভিত্তি প্রস্তরের জায়গায়, যে কোনো পাথরকে মিনারের জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন। মসজিদের মেহরাবে যে ইট তিনি লাগাতে চান, কেউ তাকে সে ইট পায়খানায় ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারে না। ইটের স্তূপ থেকে সব জায়গায় তিনি ইচ্ছে মতো ব্যবহার করবেন। তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপত্তি করা, তাকে ভিন্ন পরামর্শ দেয়া কি বোকামি নয়? মানুষের ভাগ্যলিখন সর্বশক্তিমান আল্লাহর এক রহস্যময় সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা এর ওপর ঈমান আনতে বলেছেন, কিন্তু এর পর্দা কারো সামনে উন্মোচন করেননি। কোনো নবী রসূলও দাবী করতে পারেননি যে, ভাগ্যলিখনের জ্ঞান তার রয়েছে, সম্মানিত ফেরেশতারাও এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ভাগ্য লেখার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নেকী না করার জন্যে বাধ্য করেছেন অথবা পাপ না করার জন্যে বাধ্য করেছেন। মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তিনি ভালো করেই জানেন, অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হলেও কে সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করে হেদায়াত পাবে, আর কে স্বাধীনতার অপব্যবহার করার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়ে দ্বারে দ্বারে হোঁচট খেয়ে ঘুরে বেড়াবে। আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর স্রষ্টা। এ কারণে পবিত্র কোরআনে ভালোমন্দ সৃষ্টির স্রষ্টা হিসেবে তার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সবাইকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, ভালোমন্দ, নেকীবদী বা পাপ-পুণ্য করার জন্যে তাওফিক বা শক্তি আল্লাহর তরফ থেকেই পাওয়া যায়। তবে সেটা মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক

মানুষ দুর্বল। মানুষ অসহায়। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ এবং তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ। আল্লাহর কাজের সমালোচনা করার কোনো অধিকার বান্দার নেই। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু করতে পারেন এবং তিনি সবকিছু জানেন। বিশ্বজাহানে যাকে ইচ্ছা করেন তিনি ক্ষমতা দান করেন। তাঁর সকল কাজে হেকমত রয়েছে। আমরা তাঁর সে হেকমত বুঝতে অক্ষম। পরিচ্ছন্ন মন-মানস আল্লাহর কাজের বিষয়ে সমালোচনা বা আপত্তি উত্থাপন থেকে মস্তিষ্ককে বিরত রাখে, আল্লাহকে পাওয়ার যোগ্যতা যে মনের রয়েছে সেই মন সন্দেহ সংশয়ের পর্দা ছিন্ন করে দেয়। যে অন্তরে ঈমানের নূর রয়েছে সেই অন্তরে হতাশা এবং তিক্ততার অন্ধকার তৈরি হতে পারে না।

মানুষ বুদ্ধি বিবেচনা, যুক্তিসর্বস্ব জীব হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অধিকাংশ বিষয় তারা বিশেষ মাপকাঠীতে বিচার করে। যেমন যদি আপনি কারো সাথে ভালো ব্যবহার করেন অথচ সে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তবে সেটা আপনার ভালো লাগবে না। কারো প্রতি যদি আপনি ইনসাফ করেন অথচ সে যদি আপনার ওপর যুলুম করে তবে সেটা আপনার ভালো লাগবে না। আপনি কাউকে সম্মান করলেন অথচ সে আপনাকে অপমান করলো। আপনি পরিশ্রম করেছেন অথচ পারিশ্রমিক থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এটা মেনে নেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। এসব কিছু হচ্ছে সেসব মানুষের অবস্থা যারা জীবন-মৃত্যু, পরকাল সম্পর্কে কোনোই শক্তি রাখে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সবকিছুর একক স্রষ্টা। তিনি শাহানশাহ। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি চির জাগ্রত, চিরস্থায়ী। সবকিছু একক এবং অবিসংবাদিত মালিকানা তাঁর। তিনি কোনো আদেশ করার সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বজগত সেই আদেশ পালন করে। তিনি ভাগ্য লেখার নিয়ম করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সেই নিয়ম চালু রয়েছে। তিনি রেযেক নির্ধারণ করেন এবং এ ক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। তিনি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত দেন, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু 'কুন' বলেই সৃষ্টি করেন।

মোমেন বান্দাকে আল্লাহর আদেশের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কোরআন হাদীসে বলা হয়েছে, বেহেশতের পথ বিপদশংকুল, কঠিন এবং সাধনা সাপেক্ষ। এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এই পথে প্রশংসার শ্লোগান পাওয়া সম্ভব হয় না। চরম কষ্টকর অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে বেহেশতের পথে চলতে হয়। এ কারণেই রসূল (স.) বলেছেন, বেহেশত অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, আর দোযখ ইচ্ছা আকাংখা ও খাহেশাতে ঘিরে রাখা হয়েছে।

আমাদের সামনে পথ খোলা আছে দু'টি। ঈমান এবং নেক আমলের পথ অনুসরণ, অথবা হঠকারিতা, অবাধ্যতার পথ অনুসরণ। তৃতীয় কোনো পথ নেই। ইতিপূর্বে ওহুদের যুদ্ধের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পয়গাম্বরকে বলেছেন, ফয়সালা করার ক্ষেত্রে তাকেও আল্লাহর সাথে শরিক করা যাবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর যার পূর্ণ বিশ্বাস এসে যায় সে সকল মাখলুক সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে কারো কাছে লাভের আশা করে না, ক্ষতির চিন্তা করে না। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহকে সত্যিকার মালিক, উপকার বা ক্ষতির একমাত্র নেয়ামক হিসেবে মেনে নেয়া আমাদের কর্তব্য। যে কোনো ঘটনাই ঘটুক অথবা যে রকমের বিপদই আসুক কোরআনের ভাষায় আমাদেরকে এই ঘোষণা দিতে হবে যে, হে মোহাম্মদ, ওদের জিজ্ঞেস করো আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ওদেরকে ডাকবো যারা আমাদের কোনো উপকারও করতে পারবে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদেরকে সোজা পথ দেখিয়েছেন এপরও কি আমরা উল্টো পথে চলবো? আমরা কি আমাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো করবো যে ব্যক্তিকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে এবং সে দিশেহারা অবাক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ তার সাথী তাকে বলছে, এসো এদিকে এসো, সরল পথ এদিকে রয়েছে। বলো, সত্যিকার পথ প্রদর্শনতো আল্লাহই করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্যে অবনত হই।

অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস

অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান বিল গায়েবের মাধ্যমে আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি এবং গর্বে মাথা উঁচু করতে পারি।

অদৃশ্যের প্রতি যারা বিশ্বাস পোষণ করে না তাদের অন্তর সীলমোহর করে দেয়া হয়েছে। এরা কি ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস করে না, অবশ্যই করে। এই ভবিষ্যত কি? কেউ কি দেখেছে? না দেখেনি। ভবিষ্যতের জন্যে তারা চিন্তা করে প্রস্তুতি নেয়। এরাও আসলে গায়েব বা অদৃশ্যকে মানে। তবে না বুঝে মানে। ওদের যখন বলা হয়, আল্লাহর কেতাবের প্রতি ঈমান আনো, অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা চোখ খোলার পরিবর্তে আমাদের উপহাস করে। তারা বলে, আমাদের বুদ্ধি কাঁচা।

ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হলে তারা বলে, এমন জিনিসের ওপর কি করে বিশ্বাস করতে পারি যা অনুভব করা যায় না, দেখা যায় না, যার কোনো অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন। ওদের বুদ্ধি দেখুন, ওরা এনার্জির ওপর বিশ্বাস করেছে। কিন্তু ওরা কি এনার্জি দেখেছে? তার ঘ্রাণ শুঁকেছে? কিছুতেই না। তবু এ কারণেই বিশ্বাস করে যেহেতু এনার্জির ফলাফল জলে, স্থলে, যমীনে ও আসমানে প্রত্যক্ষ করে। আমি বলি, আল্লাহকে আমরা চোখে দেখি না, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবয়ব সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারি না, হাতে ছুঁতে পারি না, কানে শুনতে পারি না। কিন্তু তার কুদরত দ্বারাতো তাকে চিনতে পারি। সমুদ্রের তরঙ্গ, বাতাসের প্রবাহমানতা, বিজলীর প্রবাহ, ফুলের সুবাস, বৃষ্টিবিন্দু, ধূলিকণা, মোটকথা সবকিছু সর্বত্র আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষী দিচ্ছে। এসব

কিছুর বাস্তবতা অন্তরের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না। বরং বুকের ভেতর স্থাপিত মন অন্ধ হয়ে যায়।' (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪৭)

আমাদের স্পষ্টভাবে জানা উচিত যে, বস্তুর নিজের কোনো শক্তি নেই। বস্তু কোনো ফলাফল তৈরি করতে পারে না। বস্তু এবং তার বৈশিষ্ট্য আল্লাহর কুদরতে তৈরি। স্থান কাল তার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে। আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মতো।' (সূরা কামার, আয়াত ৪৯-৫০)

শাহাদাতের ঘটনা বিশ্লেষণ

হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে এসব কথা আমি একারণেই উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের পরিণতি তার ভাগ্যের শেকলে বাঁধা। আল্লাহর ইচ্ছাতেই সেসব কিছু ঘটে। মোমেন কাফের কেউ এই ভাগ্যলেখার বাইরে যেতে পারে না। কাফের বাধ্য হয়ে মেনে নেয়, আর মোমেন খুশী মনে মেনে নেয়। হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা পুনরায় উল্লেখ করা যাচ্ছে। এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্যে অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ। তার শাহদাতের ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাত এক মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

রসূল (স.) আগেই হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, এক বার রসূল (স.) ওহুদ পাহাড়ে উঠে পাহাড়ের চূড়ায় বসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)। ওহুদ পাহাড় কাঁপতে লাগলো। রসূল (স.) পাহাড়ে পদাঘাত করে বললেন, হে ওহুদ, থেমে যা। তোর ওপরে একজন নবী একজন সিদ্দিক এবং দু'জন শহীদ রয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর শেষ হজ্জ

হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব বলেন হযরত ওমর (রা.) জীবনের শেষ হজ্জ পালনের পর মক্কা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় তিনি উট বসিয়ে বিশ্রামের চিন্তা করলেন। বেশকিছু বালু একত্রিত করে চাদর বিছিয়ে স্তূপীকৃত বালুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। চিৎ হয়ে শোবার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার শক্তি কমে গেছে, দায়িত্ব বেড়ে গেছে। শাসনাধীন এলাকা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আমার কোনো ভুলত্রুটি হওয়ার আগেই আমাকে তুমি তোমার কাছে ডেকে নাও। আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দার এ দোয়া কবুল করেছিলেন। যিলহজ্জ মাস শেষ হওয়ার আগেই তার ওপর হামলা হয়েছিলো এবং তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

হযরত যোবায়ের ইবনে মোতয়াম (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর শেষ হজ্জের সময়ে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। আরাফা পাহাড় অর্থাৎ জাবালে আরাফায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় বনু আজুর লাহাব খান্দানের এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বললো, আল্লাহর শপথ, এই বছরের পর ওমর কখনো এই পাহাড়ে দাঁড়াবেন না। একথা শুনে আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে সেই লাহাবী লোককে ধমকালাম। পরদিন শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের জায়গায় সেই একই ব্যক্তি পুনরায় একই কথা বললো।

হযরত ওমর (রা.)-এর একটি স্বপ্ন

সাঈদ ইবনে আবু তালহা ইয়ামারি বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি তার একটি স্বপ্নের বিবরণ দেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একটি মোরগ ঠোঁট দিয়ে তাকে এক অথবা দুটি ঠোকর দেয়। এই স্বপ্নের তাবির দিয়ে তিনি জানান যে, তার চিরবিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ওমর ইবনে মায়মুন (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত ওমর (রা.)কে তার ওপর হামলার আগে কাতারের মধ্যে দেখেছিলাম। তার এবং আমার মাঝখানে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। হযরত ওমর (রা.) লোকদের কাতার সোজা করার তাকিদ দিচ্ছিলেন।

আবু নফরাহ বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) কাতারের মাঝখান দিয়ে হেঁটে কাতার সোজা করতেন। একামতের পর বলতেন, কাতার সোজা করো। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সোজা কাতারের মত তোমাদের কাতার দেখতে চান। এরপর কোরআনে উল্লেখিত ফেরেশতাদের বক্তব্য 'ওয়া-ইন্না লা নাহনুছ ছাফুন' পাঠ করে তাকবীরে তাহরিমা উচ্চারণ করে নামায শুরু করতেন। ফেরেশতাদের উক্ত কথার অর্থ হচ্ছে আমরা কাতারবন্দী রয়েছি।

ওমর ইবনে মায়মুন (রা.) আরো বলেন, কাতার সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পর এবং কোথাও কাতার একটুও বেঁকে যায়নি এরূপ নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধার তাকবীর বলতেন। ফজরের নামাযে তিনি সাধারণত সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল অথবা সেই সূরার আয়াতের সমপরিমাণ আয়াত সম্বলিত কোনো সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকাতের মধ্যেই সকল নামাযী নামাযে শরিক হয়ে যেতেন। সেদিন যখনই তিনি তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করলেন এবং সবাই তার ইমামতিতে নামায শুরু করলো তখনই তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, কুকুর আমাকে মেরে ফেললো। অথবা বলেছিলেন, কুকুর আমাকে দংশন করেছে। অগ্নিপূজক, মাজুসী লোকটি হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর কয়েকটি আঘাত করেছিলো। তার কাছে ছিলো দুধারী খঞ্জর। হযরত ওমর (রা.)-কে আঘাত করার পর আততায়ী কাতারের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে লাগলো এবং ডানে বাঁয়ে নামাযীদের ওপর হামলা করলো। আমীরুল মোমেনীন ছাড়া আরো তেরোজন তার হামলায় আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সাতজন মৃত্যুমুখে পতিত হন। একজন নামাযী পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে নিজের কম্বল ছুঁড়ে পেচিয়ে অগ্নিপূজক দুর্বৃত্তকে ধরে ফেললেন। ধরা পড়ে যাওয়া লক্ষ্য করে নিজের অস্ত্র দিয়ে সে নিজেই আত্মহত্যা করলো।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর ইমামতি

গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর হাত ধরলেন এবং তাকে ইমামমতির জন্যে সামনে এগিয়ে দিলেন। মেহরাবের পাশে দাঁড়ানো মুসল্লিরা সবই দেখলেন কিন্তু দূরের মুসল্লিরা কিছু বুঝতে পারেননি। ইমামের কোরআন তেলাওয়াতের আওয়ায না শুনে তারা 'সুবহানাল্লাহ' বলে ওঠেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) সূরা কাওসার এবং নছর পাঠ করে নামায শেষ করেন। নামাযের সালাম ফেরানোর পর হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা.) বলেন, দেখোতো ইবনে আব্বাস, আমার ওপর কে হামলা করেছে? ইবনে আব্বাস (রা.) ফিরে এসে বললেন, মুগিরা ইবনে শোবার ক্রীতদাস হামলা করেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ভালোই হয়েছে। সে নিজেই কাজ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ধ্বংস করুন। আমি তার ব্যাপারে কল্যাণকর আদেশ দিয়েছিলাম অথচ আমাকে সে এই প্রতিদান দিয়েছে। আল্লাহর শোকরিয়া, আমার আততায়ী এমন কেউ নয় যে কি না ইসলামের দাবীদার। ইবনে আব্বাস, তুমি এবং তোমার পিতা আব্বাসই ওইসব কাফের গোলামদের সম্পর্কে যুক্তি পেশ করেছো। তোমাদের যুক্তির কারণেই মদীনায় তাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। (মদীনায় হযরত আব্বাসের (রা.) ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে বেশী)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি ইচ্ছে কারলে আমাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিন। অথবা কাফের ক্রীতদাসদের গ্রেফতার করিয়ে দিন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, না তা হতে পারে না।

মসজিদ থেকে নিজ ঘরে

ওমর ইবনে মায়মুন (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-কে মসজিদে নববী থেকে তার ঘরে নেয়া হলো। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। মানুষের অবস্থা ছিলো অবর্ণনীয়। মনে হচ্ছিলো, এ রকম বিপদ অতীতে কখনো তাদের ওপর আসেনি। সবাই ছিলো অস্থির, দিশেহারা, শোকাচ্ছন্ন। কেউ কেউ সান্ত্বনার সুরে বললেন, আমীরুল মোমেনীন প্রাণে বেঁচে গেছেন। অন্যরা বললেন, বাঁচার সম্ভাবনা নেই। জখম মারাত্মক। তাকে ওষুধ খাওয়ানো হলো। সেই ওষুধ জখমের জায়গা দিয়ে বের হয়ে গেলো। দুধ খাওয়ানো হলো। দুধও জখমের জায়গা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে সবাই বলাবলি করলো, বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে ছিলো মানুষের ভিড়। সবাই তার প্রশংসা করছিলো। একজন যুবক বললো, আমীরুল মোমেনীন, আপনি ভাগ্যবান, আপনাকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আপনি রসূল (স.)-এর খেদমত করেছেন, যা সবাই জানে। খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর আপনি তাঁর হক আদায় করেছেন। ন্যায়বিচার ও ইনসাফ ছিলো আপনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আপনার ভাগ্যে শাহাদাত লেখা রয়েছে। এই শাহাদাত আপনার জন্যে মোবারক হোক। আপনি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি যদি সম্মানে সম্মানে রক্ষা পাই সেটাই যথেষ্ট। যদি সওয়াবের যোগ্য বিবেচিত না হই, শাস্তির যোগ্য বিবেচিত না হই, সেটাই যথেষ্ট। এ রকম হলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। যুবক ফিরে যাচ্ছিলো। হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন, যুবকের তহবন্দ মাটিতে লেপটাচ্ছে। তিনি বললেন, যুবককে একটু ডাকো। যুবক আসার পর তিনি বললেন, ভাতিজা, তহবন্দ একটু উঁচু করে পরিধান করো। এতে তোমার কাপড় পরিষ্কার থাকবে, তোমার দ্বীনও মাহফুয থাকবে।

হযরত ওমর (রা.)-এর ঋণ

হযরত ওমর (রা.) তার পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন দেখোতো, আমার নামে কতো ঋণ আছে। আবদুল্লাহ হিসাব করে বললেন, ৮৬ হাজার দেরহাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার পরিবার থেকে সম্ভব হলে এই ঋণ পরিশোধ করে দিয়ো। যদি পুরো শোধ দেয়া না যায় তবে বনু আদী থেকে কিছু চেয়ে নিয়ো। তাও যদি বাকি থাকে তবে কোরায়শ গোত্র থেকে চেয়ে নিয়ো। কোরায়শ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইবে না। হযরত ওমর (রা.)-এর পরিবার থেকেই পুরো ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিলো।

কবরের জায়গার অনুমতি

হযরত ওমর (রা.) তার পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন, হে আবদুল্লাহ উম্মুল মোমেনীন আয়শা সিদ্দিকার (রা.) কাছে যাও, তাকে বলো ওমর আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আমার নামের সাথে আমীরুল মোমেনীন ব্যবহার করো না, কারণ আজ থেকে আমি আমীরুল মোমেনীনের দায়িত্ব পালন করতে পারবো না। কাজেই এখন আমি আর আমীরুল মোমেনীন নই। সালাম জানানোর পর বলবে, ওমর তার দুই বন্ধুর পাশে কবরের একটু জায়গা চায়। আব্দুল্লাহ উম্মুল মোমেনীনের কাছে গিয়ে দেখেন তিনি কাঁদছেন। আদুল্লাহ হযরত ওমর (রা.)-এর সালাম জানানোর পর তার ইচ্ছার কথা জানালে আয়শা (রা.) বললেন, ওই জায়গাতো আমি নিজের কবরের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ ওমরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি। তাকে ওই জায়গায় দাফনের অনুমতি দিলাম। আবদুল্লাহ ফিরে আসার কথা জানানো হলে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। তাকে একজনের বুকের সাথে হেলান দিয়ে বসানো হলো। বসার পর আবদুল্লাহকে বললেন, বলো, উম্মুল মোমেনীন কী বলেছেন? আবদুল্লাহ বললেন, আপনার আশা পূরণ করেছেন। শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এরচেয়ে বেশী কিছু আশা আমার ছিলো না।

আল্লাহর শোকর, আমার আশা পূরণ হয়েছে। আমার দেহ থেকে প্রাণ চলে যাওয়ার পর পুনরায় আয়শা সিদ্দিকার (রা.) কাছে অনুমতি চাইবে। তিনি যদি খুশীমনে অনুমতি দেন তবে আমাকে রসূল (স.)-এর কবরের পাশে দাফন করবে। যদি না দেন তবে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে আমাকে দাফন করবে।

উম্মুল মোমেনীন হাফসা (রা.) বহু সংখ্যক মহিলা সাথে করে পিতৃগৃহে এলেন। তাকে জায়গা করে দেয়া হলো। পুরুষরা সব বেরিয়ে এলেন। পিতার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হযরত হাফসা (রা.) ব্যাকুলভাবে কাঁদলেন। তারপর ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। বাইরের পুরুষরা ভেতরে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চাচ্ছিলেন। ওমর ইবনে মায়মুন বলেন, পুরুষরা ভেতরে যাওয়ার পর আমিও তাদের সাথে গেলাম। ভেতর থেকে হযরত হাফসার (রা.) কান্নার আওয়ায তখনো শোনা যাচ্ছিল।

ছয়জন সাহাবার কমিটি

হযরত ওমর (রা.)কে বলা হলো, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার স্থলাভিষিক্ত কারো নাম অসিয়ত করে লিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, আমি ছয়জনের একটি কমিটি করে দিচ্ছি। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে এরা সবাই উপযুক্ত। এদের প্রতি রসুল (স.) সবসময় সন্তুষ্ট ছিলেন। ওফাতের সময়েও রসূল (স.) এদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই ছয়জন হচ্ছেন আলী ইবনে আবু তালেব (রা.), ওসমান ইবনে আফফান (রা.), যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), তালহা ইবনে ওবায়েদুল্লাহ (রা.), সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তোমাদের সাথে পরামর্শে শামিল থাকবে। কিন্তু সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়। আমি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে গবর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলাম। সেটা তার দুর্নীতি অথবা দুর্বলতার কারণে করিনি। সেটা ছিলো একটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। সা'দকে যদি খলীফা মনোনীত করা হয় তবে তিনিও অন্য সকলের মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। তোমাদের মধ্যে যিনিই খলীফা হবেন তিনি কিছুতেই সা'দকে যেন উপেক্ষা না করেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর বিনয় ও নম্রতা

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে (রা.) হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার মাথার বালিশ সরিয়ে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দাও। আমার ধূলিধূসরিত মাথা দেখে হয়তো আল্লাহ তায়ালা আমাকে রহমত করবেন। যদি আমি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই তবে ধ্বংস আমার জন্যে, ধ্বংস আমার মায়ের জন্যে। হায়, আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করতেন! আমার মৃত্যুর পর আমার চোখ বন্ধ করে দেবে, সাদামাটা কাফন দেবে। কারণ আল্লাহর কাছে যদি আমি মকবুল হতে পারি তবে আমাকে এ কাফনের চেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক দেয়া হবে। যদি বিপরীত অবস্থা হয় তবে সাথে সাথে উলঙ্গ করে দেয়া হবে।

এসব হচ্ছে হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা। সীরাত রচয়িতারা এসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনার বিবরণ তুলে ধরার জন্যে এসব আমি লিখছি না। আমরা শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হবো এ রকম আশা নিয়েই এসব ঘটনার বিবরণ আমি দিচ্ছি। এসব ঘটনার মধ্যে যে শিক্ষা রয়েছে আমরা সেসব অনুসরণ করে যেন সংশোধিত হতে পারি সে আশাতেই এসব লেখা হচ্ছে। মৃত্যুর কষ্টকর সময় হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনেও এসেছিলো। কিন্তু সেই কঠিন সময়ে, সেই সংকট সন্ধিক্ষণেও হযরত ওমর (রা.) নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। মুহূর্তের জন্যেও তার মধ্যে ভীতি বা হতাশা দেখা যায়নি। হযরত ওমর (রা.)-এর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন ছিলো শিক্ষা ও আদর্শের উন্নত নমুনা। কিন্তু নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সেই তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে তো মানুষ অনেক বেশী বিচলিত থাকে, তার মধ্যে মৃত্যু এক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই কঠিন সময়েও ছিলেন শান্ত এবং অবিচলিত।

রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুকে ভয় করতেন না। তিনি কাউকে নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেননি। তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন। তিনি জানতেন, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে নিজস্ব রূপে তার কাছে হাযির হবে। যেভাবে মৃত্যু নির্ধারিত আছে সেভাবেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। বলা হয় যে, মৃত্যু হচ্ছে উত্তম প্রহরী। মৃত্যু হচ্ছে মযবুত ঢাল। অর্থাৎ সময় না হওয়া পর্যন্ত কেউ মানুষকে মারতে পারে না।

নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে উপস্থিতি

হযরত ওমর (রা.) খুশুখুযুর মাধ্যমে নামায আদায় করতেন। কাতার সোজা করা নামাযের অংশ, মনের একাগ্রতা নামাযের তাকিদ। তিনি এসব কিছুই পরোপুরি আদায় করতেন। আমরা নামায আদায়ের জন্যে বের হয়ে গড়িমসি করি, নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকার সময়ে মনে আল্লাহর ভয় থাকে না, মুখে তসবীহ্ থাকে না। হয়তো কথাবার্তায় মশগুল থাকি অথবা মনে মনে দুনিয়ার নানা রকম পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকি। আমাদের মনের কোণে এ রকম কোনো ধারণাই আসে না যে, আমরা মালিকুল মুলক বাদশার বাদশা রাজাধিরাজের সামনে উপস্থিত হয়েছি। মনে আল্লাহভীতি থাকে না। চোখ থাকে শুকনো, অশ্রু বিন্দুর আভাসও পাওয়া যায় না। মনে হয় আমরা ভুলেই গেছি যে, নামায হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি।

আল্লাহর দরবারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার সামান্য অনুভূতি থাকলেও আমরা মসজিদে গিয়ে ভয়ে সংকোচে চুপচাপ থাকতাম। কোনো শব্দ করতামনা। কিন্তু আমাদের অমনোযোগিতা আমাদের ডুবিয়ে দিচ্ছে। আমরা কিসের নামায আদায় করি? কিছু রুকু সেজদা, কিছু ওঠাবসা। আমরা এর নাম দিয়েছি নামায। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় ছিলেন? সাথে সাথে জবাব দিই নামায আদায় করছিলাম, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমাদের নামায ছিলো একেবারেই প্রাণহীন। একবার ভেবে দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) যেসময় কাবাঘর তৈরি করছিলেন, ইট বালু গাঁথছিলেন, সেই সময়েও তারা আল্লাহর ভয়ে কাঁপছিলেন। বারবার দোয়া করছিলেন, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না। হে আল্লাহ তায়ালা! আমাদের এই কাজ কবুল করুন।

নামায আদায় করে আমরা যেন আল্লাহর ওপর দয়া করছি। নামাযের অবস্থা হচ্ছে ওপরে যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে সে রকম। আল্লাহর বেহিসাব অন্তহীন নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের ইচ্ছে থাকলেও শোকরিয়া আদায় করতে পারি না। আল্লাহর নেয়ামত হিসাব করে শেষ করা যাবে না। এরপরও আমাদের মধ্যে বিনয়ভাব নেই। হযরত ওমর (রা.) যথাযথভাবে নামায আদায় করতেন। তিনি এমনভাবে নামাযে দাঁড়াতেন যেন অন্তরের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। তার ভেতর ও বাহির নামাযের সময় এক হয়ে যেতো। আমরাও যদি তার মতো বিনয় ভাব নিয়ে, নম্র হয়ে নামায আদায়ে সক্ষম হতাম তবে আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি এ রকম স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর বর্তমানে যে অবস্থা এতে স্বপ্ন পূরণের আশা বহু দূরে।

হযরত ওমর (রা.)-এর দায়িত্ববোধ এবং সাহসিকতা

হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর হামলা ছিলো প্রাণঘাতী। সেই নাজুক সময়েও তিনি নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। জখমের যন্ত্রণা ভুলে নামাযের এন্তেযাম করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) হাত ধরেন। তাকে সাহায্য করার জন্যে নয় বরং আবদুর রহমানকে ইমামতির জায়নামাযে এনে দেন। অন্য কেউ এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হলে হৈ চৈ চিৎকারে সবাইকে তটস্থ করে তুলতো। চিকিৎসার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করতো এবং সকল দায়িত্ব কর্তব্য নিমেষেই ভুলে যেতো।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। প্রাণঘাতী হামলার পরও তিনি নামাযের জামায়া'ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফকে (রা.) নিযুক্ত করেন। এ ধরনের উচ্চতর মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে না থাকার কারণেই আমরা আজ অধঃপতিত। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মুসলমানদের দুরবস্থার কথা সবাই বলে, প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা বলে অথচ প্রতিকার যে তাদের নিজের কাছে সেকথা চিন্তা করে না। সকল মুসলমানের সম্মিলিত নাম হচ্ছে উম্মত। প্রত্যেক ব্যক্তিই রোগাক্রান্ত। এ কারণে উম্মতও রোগের শিকার। উম্মতকে রোগমুক্ত করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে প্রত্যেকে অন্যের দোষের কথা বলে, আর নিজের অবস্থার কথা ভুলে যায়। অন্যের ওপর রাগ প্রকাশ করে নিজেকে মনে করে রোগ থেকে মুক্ত। কখনো শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কখনো যুগের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু ভেবে দেখে না যে, এসব সমালোচনা এসব অভিযোগ নিরর্থক। অবমাননা অধঃপতন আমাদের নিজেদের কর্মফল। অন্যজন কি করছে সেটা চিন্তা না করে আমি নিজে কি করছি সেটা চিন্তা করা আবশ্যক। আত্মসমালোচনাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এভাবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হলেই আমরা মনযিলে মকসুদে পৌঁছাতে পারবো।

মুসলিম অমুসলিম সব মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়। দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্যে, জীবন ধারণের জন্যে মুসলিম অমুসলিম সবাই ছুটোছুটি করে, চেষ্টা-সাধনা করে। দ্বীনের কাজেও চেষ্টা-সাধনা করতে হয়, কষ্ট করতে হয়। দুনিয়ায় স্বাভাবিক একটা নিয়ম আছে যে, যতোটা কষ্ট করা হবে ততোটা ফল পাওয়া যাবে। মানুষের কাজের ফল দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি পাওয়া যায় না। পরকালের জীবনে পূর্ণ প্রতিফল সামনে এসে হাযির হবে। কিছু মুসলমান এমন রয়েছে যাদের সামনে কোনো পরীক্ষা এলে তারা সবকিছু ভুলে যায়। আনুগত্যের অংগীকার স্মরণ থাকে না, দ্বীনের যে নুসরত যে সাহায্য অত্যাবশ্যক বা ওয়াজেব বলে জেনেছিলো সেটা ভুলে যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে তারা বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়। আল্লাহর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে তোলা হলে, ধৈর্য সহিষ্ণুতাকে অভ্যাসে পরিণত করা হলে উম্মতে মোহাম্মদীর সাফল্য হবে অবধারিত।

আমাদের বিপদ অনেক, আমাদের জখম গভীর। কিন্তু দুনিয়ায় কার কাছে অভিযোগ করবো? কে আছে যে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে? একটি মাত্র দরবার আছে যেখানে মাথা নত করা হলে ব্যর্থ হতে হবে না। সেটা হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবার। সেই দরবার থেকে রহমতের তাজাল্লি বর্ষিত হতে থাকে। সেই তাজাল্লিতে আলোকিত মানুষ কেন বিপদাশংকায় বিচলিত হয় না ইমান একিনের সাথে আল্লাহর সকল ফয়সালা সহজে মেনে নেয় না, আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে না?

হযরত ওমর (রা.) ইসলামের অমর ব্যক্তিত্ব

হযরত ওমর (রা.)-এর প্রাণনাশের হামলায় তিনি শোরগোল, চিৎকার বা চেঁচামেচি করে তুলকালাম কান্ড সৃষ্টি করেননি। সেই নাজুক সময়ে তিনি জানতে চাইলেন আততায়ীর পরিচয়। তিনি আশংকা করছিলেন কোনো মুসলমানের হাত তার রক্তে রঞ্জিত হলো কি না। কিন্তু আততায়ী অমুসলিম কাফের জেনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন যে, কোনো মুসলমানের হাত তার রক্তে রঞ্জিত হয়নি। তিনি এর দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, আপনি যদি হেদায়াতের পথে থাকেন তবে পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রষ্টতা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শর্ত হচ্ছে যে, আপনি নেকীর প্রচার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। জীবনের অন্তিম সময়েও মুসলমানদের প্রতি এমন ভালোবাসা, তাদের কল্যাণ চিন্তা করবেন যা এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন মুসলমানদের জন্যে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতস্বরূপ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা.) হযরত ওমর (রা.) ভালোবাসতেন, তাকে শ্রদ্ধাও করতেন। কিন্তু এ রকম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ সত্ত্বেও নাজুক সময়ে হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহর প্রতি তাকিয়ে বললেন, মদীনায় অমুসলিম ক্রীতদাসদের উপস্থিতির জন্যে দায়ী তুমি এবং তোমার পিতা। হযরত আব্বাস (রা.) এবং তার পুত্র আবদুল্লাহর অধীনে বহু সংখ্যক অমুসলিম ক্রীতদাস ছিলো। ইবনে আব্বাস হযরত ওমর (রা.)-এর কথা শুনে বললেন, সব অমুসলিম ক্রীতদাসকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা দরকার। হযরত ওমর (রা.) রাযী হলেন না। তিনি বললেন, একজনের অপরাধে অন্যান্য নির্দোষ লোকদের শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। হযরত ওমর (রা.) আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মদীনায় অমুসলিম ক্রীতদাসদের সংখ্যাধিক্য মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। দূরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যত বংশধরদের আশংকাও অনুভব করেছিলেন। এ আশংকার কথা তিনি প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের শাসকরা এ বিষয়ের ওপর মোটেই গুরুত্ব দেননি। পরবর্তীকালে বাগদাদে আব্বাসী খলীফাদের যে পরিণাম রোমের পারস্যের দায়লামী এবং তুর্কমান ক্রীতদাসদের হাতে হয়েছিলো ইতিহাসের পাতায় তার বিবরণ লেখা রয়েছে। হযরত ওমর (রা.)-এর পরবর্তী সময়ের শাসকদের অদূরদর্শিতার কারণেই এসব ঘটনা ঘটেছিলো।

হযরত ওমর (রা.) জীবনের অন্তিম সময়েও ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদেরও সে শিক্ষা অনুসরণের তাকিদ দিয়েছিলেন। একজন যুবকের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সে যুবক তাকে বেহেশতের সুসংবাদ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু তিনি যুবকের পরিহিত পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে ঠিকভাবে পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেন। আল্লাহর ভয়ের এ উদাহরণ কতো চমকপ্রদ। সুন্নতের অনুসরণের কথা হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুর কঠিন সময়েও ভুলেননি। এসব কারণে হযরত ওমর (রা.)-কে আমি মনের গভীর থেকে ভালোবাসি।

অত্যাচারের সহায়তাও অত্যাচারের শামিল

বর্তমানে মুসলমানরা শুধু শরীয়ত বিরোধী কাজেই লিপ্ত থাকে না বরং বড় রকমের পাপও করে বেড়ায়। আল্লাহর দুশমনদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধে, মিল মহব্বত রাখে। নশ্বর পৃথিবীর লাভলোকসান নিয়েই তারা মেতে থাকে সারাক্ষণ তারা হয়তো জানেও না যে, লাভ লোকসান আল্লাহরই হাতে।

আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের দুশমন এবং অত্যাচারীদের সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন। যালিমের যুলুমের সময় নীরব থাকাও এক ধরনের যুলুম। আর যুলুম অত্যাচারের পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা সীমা লংঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। ঝুঁকে পড়লে আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।' (সূরা হূদ, আয়াত ১১৩)

যালিমদের সহযোগিতা করা যে সত্যের অনুসারীদের জন্যে শোভনীয় নয় এ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমি একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করতে চাই।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একবার সালেম ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। সালেম সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুসলমান? লোকটি বললো, হাঁ আমি মুসলমান, কিন্তু তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি সেই আদেশ

পালন করো। সালেম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আজ ফজরের নামায আদায় করেছো? সে বললো, হাঁ। এ কথা শুনে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ফিরে গেলেন এবং হাজ্জাজকে তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, সে মুসলমান এবং আজ সকালে ফজরের নামায আদায় করেছে। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করেছে সে আল্লাহর হেফাযত ও নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে। হাজ্জাজ বললেন, আমি তো তাকে ফজরের নামাযের কারণে হত্যা করার আদেশ দেইনি বরং সে হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকান্ডে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। সালেম বললেন, তাই নাকি? তুমি এই বাহানায় একজন দরিদ্র মুসলমানকে হত্যা করতে চাও? হযরত ওসমান (রা.)-এর সাথে আমার চেয়ে ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক কার রয়েছে? এমনি করে একজন সত্যনিষ্ঠ মুসলমান একজন অত্যাচারী শাসকের সামনে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দরিদ্র একজন ঈমানদারের জীবন রক্ষা করেন। তিনি যালেমের ইচ্ছা পূরণের ক্রীড়নকে পরিণত হননি।

মুসলিম মিল্লাতের অভিভাবক হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের ঘটনাবলী জ্ঞানী মূর্খ সবাই কমবেশী জানে। মুশকিল হচ্ছে, আমরা আজ খাহেশাতে নাফসানীর দাসে পরিণত হয়েছি। হযরত ওমর (রা.) প্রকৃতই জান্নাতের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ঋণগ্রস্ত থাকলে শাহাদাতবরণ করেও জান্নাতে যাওয়া যায় না। একারণে তিনি তার পুত্রকে তার ঋণের হিসাব করে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

ইসলাম তার অনুসারীদের আদব কায়দা শিক্ষা দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর কবরের পাশে কবর পেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু একজন আমীরুল মোমেনীন হয়েও তিনি কোনো আদেশ জারি করেননি এবং হযরত আয়শা (রা.)-এর কাছে কবরের জায়গার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনও এমনভাবে করতে বলেছিলেন যে, আমার নামের আগে আমীরুল মোমেনীন বলবে না। অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে পদ-পদবীটা আমরা জীবদ্দশায়তো আঁকড়ে থাকিই মৃত্যুর পরও সেই পদবী ব্যবহারের ব্যবস্থা করে যাই। ইসলামের আদব-কায়দা রীতি-নীতি ভুলে যাওয়ার কারণেই আজ আমরা অবমাননা এবং অধঃপতনের সম্মুখীন হচ্ছি। কতো ভালো হতো আমরা যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারতাম। রসূল (স.) বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমার এই আদব হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

অব্যাহত সাধনা

কোনো কাজ শুরু করেই তার ফলাফল পাওয়ার জন্যে আমরা অস্থিরতা প্রকাশ করি। জাপানে বসবাসকারী কোনো নাগরিক যদি হজ্জ পালনের ইচ্ছা করে তবে তাকে অবশ্যই মক্কা সফরের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম পর্যায়েই সে সফলতা পাবে না, কিন্তু প্রথম পর্যায়ের প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টায় একদিন সে ব্যক্তি অবশ্যই লক্ষ্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হবে। আমাদেরকেও লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্যে পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে অগ্রসর হতে হবে। সময়মতো ঠিকই ফলাফল পাওয়া যাবে। পৌরুষের বড় প্রমাণ হচ্ছে আশাবাদ। এই আশাবাদ ছাড়া পৌরুষের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হযরত ওমর (রা.) কোনো ব্যাপারেই হতাশ হতেন না। জীবনের শেষ সময়েও তিনি পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন। আশাবাদী মানুষ হিসেবে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। মৃত্যু সম্পর্কেও তার মনোভাব ছিলো পরিষ্কার। তিনি জানতেন, মৃত্যু হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওয়ায়েয।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে রসূল (স.)-এর অভিমত

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ওমরের যবানে সত্য জারি করেছেন এবং তার অন্তরকে সত্যের আবাসস্থলে পরিণত করেছেন। এ রকম উচ্চমানের প্রশংসা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) আল্লাহকে ভয় করতেন। কাবাঘর তওয়াফের সময় হযরত ওমর (রা.)

এই দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! হে পরম করুণাময়, তুমি যদি আমাকে ভাগ্যবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকো তবে সেই অবস্থা বহাল রাখো। যদি হতভাগ্য মানুষদের মধ্যে শামিল করে থাকো তবে তোমার সে সিদ্ধান্ত বাতিল করো এবং আমাকে ভাগ্যবান ও ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল করো। নিঃসন্দেহে তুমি যা ইচ্ছা করো তা লিখতে পারো, যা ইচ্ছা করো মুছে দিতে পারো। তোমার কাছে উম্মুল কেতাব রয়েছে।

রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে এক আশ্চর্য সুন্দর কথা বলেছেন। হযরত ওমর (রা.)-এর স্মরণে রচিত এই গ্রন্থে রসূলে করিমের (স.) সেই চমৎকার বাণী আমি হাদীয়া হিসেবে পেশ করতে চাই। রসূল (স.) বলেছেন, 'ইয়াওমে আরাফা'র সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর ফেরেশতাদের সামনে সাধারণভাবে গর্ব করেন এবং ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) ওপর বিশেষভাবে করুণার দৃষ্টি দেন।

জানাযা ও দাফন

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হযরত ওমর (রা.)কে গোসল দেন। জানাযা তুলে মসজিদে নববীতে নেয়া হয়। জানাযার নামাযে ইমামতি করেন হযরত সোহায়ব রুমী (রা.)। জানাযার পর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), ওসমান ইবনে আফফান (রা.), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) কবরে নামেন। সেদিন থেকে দু'জন অন্তরঙ্গ সাথীর সাথে হযরত ওমর (রা.) আরাম করছেন।

তেইশ হিজরীর ছাব্বিশে যিলহজ্জ তারিখে হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর আততায়ী হামলা করেছিলো। চার দিন পর চব্বিশ হিজরীর পয়লা মহররম তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন ছিলো রবিবার। হযরত ওমর (রা.) দশ বছর পাঁচ মাস একুশ দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর ঐতিহাসিকের মতো আমি কলম ধরিনি। আমিতো ঐতিহাসিকদের সন্নিবেশিত তথ্য থেকে ফায়দা নিয়েছি। হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর নির্যাস আমি সংগ্রহ করেছি। মহান আল্লাহর কাছে বিনীত মোনাজাত, তিনি আমার প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি ওয়াদা করেছেন যে ব্যক্তি তার পথে এখলাছের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাবে তিনি তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই সফলতা দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার এবাদাত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাতো সত্যত্যাগী।' (সূরা নূর, আয়াত ৫৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর সাক্ষ্য প্রদান

আল্লাহভীতি ও বিনয় ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে পুত্র আবদুল্লাহকে (রা.) তিনি বলেছিলেন, আমার মাথা বালিশ থেকে নামিয়ে দাও। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের এটা হচ্ছে চূড়ান্ত নযীর। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমীরুল মোমেনীনের নেকীসমূহের বিবরণ দিয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইবনে আব্বাস তুমি কি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো জবাব দেয়ার আগেই হযরত ওমর (রা.) তার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হাঁ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।

হযরত ওমর (রা.)-এর মতো ন্যায়পরায়ণতা এবং ইনসাফের পরিচয় পরবর্তীকালে কোনো শাসক দিতে সক্ষম হননি। আল্লাহর রহমতে এবং তওফিকে হযরত ওমর (রা.)-এর আমলনামা ছিলো নেকীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিনয়ের সাথে বলতেন, কেয়ামতের কঠিন দিনে পাপ পুণ্য সমান হয়ে যদি নাজাত পেয়ে যাই সেটাই হবে সৌভাগ্য। হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনচরিত আমাদের জন্যে অন্তহীন শিক্ষা ও আদর্শের উৎস।

হতাশা কুফুরীর শামিল

অনেক সময় অন্ধকার রাতে মানুষ ভয় পেয়ে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, এই অন্ধকার কি শেষ হবে? এমনিভাবে বিপদ মসিবত দেখেও মানুষ হতাশ হয়ে যায়। সাহস হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। তারা জানে না যে, হতাশা মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ। সূরা ইউসূফের ৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হতাশাকে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। একটি হাদীসে রসূল (স.) হতাশাকে কবিরা গুনাহর শামিল বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একদিন দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে রসূলুল্লাহ (স.) কবিরা গুনাহ কি? রসূল (স.) বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়া এবং হতাশা।

লোকেরা জিজ্ঞেস করে যে, তাহলে কি করতে হবে? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহর রহমতের আশা করে নিজের শক্তি কাজে লাগাতে হবে। মনমগয থেকে হতাশা ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং শত্রুদের চালচলন চোখ কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মন্দ এবং দুষ্কৃতিকারীরা নিজেদের সাফল্যের জন্যে তৎপরতা চালিয়ে যায়। তাদের পৃষ্ঠপোষকরা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে প্রচারপ্রোপাগান্ডা অব্যাহত রাখে। আমরা অবিসংবাদিত সত্যের ওপর থেকেও কেন হতাশ হবো? আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে দোয়া চাইতে হবে। দোয়ার জন্যে হাত তোলার সময়ে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এ দোয়া কবুল হবেই। রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার সময় এ বিশ্বাসের সাথে দোয়া চাও যে, তোমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। মনে রেখো আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না, যে ব্যক্তির মন গাফেলতির মধ্যে ডুবে থাকে এবং খেল-তামাশায় অভ্যস্ত।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ পৃথিবীতে কোনো জাতির উত্থানের পর তার উন্নতি স্থায়ী হয়নি। বহু শক্তিশালী জাতি, বহু দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসের নিদর্শন মানব জাতির শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে। সময়ের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বর্তমানে আমরা পশ্চাৎপদ হয়ে আছি, কিন্তু এটাতো আমাদের ভাগ্যের স্থায়ী লিখন হতে পারে না। এই অধঃপতন আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

শত্রু দু'প্রকারের। আভ্যন্তরীণ শত্রু এবং বাইরের শত্রু। হতাশা এমন এক শত্রু যা ভেতর থেকে হামলা করে। ভেতরের সবকিছু ফাঁপা করে দিয়ে এই শত্রু বাইয়ের শত্রুর সামনে চিৎপাত করে ফেলে। বাইরের শত্রুর মোকাবেলার জন্যে প্রথমে ভেতরের এই শত্রুকে পরাজিত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়ায় সবদিক থেকে আমাদের জন্যে জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। সৌন্দর্যের জাল চারদিকে পাতা রয়েছে। পাখিদের সুমধুর গান, সমুদ্রের তরঙ্গ ছন্দ, নদীর স্রোতধারা, ফুলের হাসি, সমীরণের স্নিগ্ধ শীতলতা, বৃষ্টির ধারা ইত্যাদি সবকিছুই সুন্দর, সবকিছুই মনোমুগ্ধকর। মানুষ নিজের কর্মদোষে এতসব সৌন্দর্যের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়ে হতাশার গভীরে নিমজ্জিত হয়। ইসলাম জীবনের পয়গাম এবং আমলের দা'ঈ। হতাশাকে ইসলাম কুফুরী বলে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের নেক আমল করতে হবে। অব্যাহতভাবে সাধনা করতে হবে। কম হোক বেশী হোক নেক আমল এবং আশাই সকলের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি।

শেষ কথা

পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সব বিষয়ে অবহিত। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে নাযিল হয় এবং যা কিছু ওতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল। (সূরা সাবা, আয়াত ১-২)

হে মাওলায়ে করিম, আমাদের জীবনের শেষ আমলকে উৎকৃষ্ট করে দিয়ো। হে আল্লাহ তায়ালা! তোমার দরবারে উপস্থিতির দিনকে উত্তম দিন হিসেবে নির্ধারণ করে রেখো। হে রব্বুল আলামীন, তুমি দোয়া শোনো এবং তুমিই দোয়া কবুল করো। তোমার জ্ঞানের সংখ্যার সমপরিমাণ দোয়া, তোমার বাণীর সমসংখ্যক দোয়া তোমার কাছে পেশ করছি।

আমি এক দুর্বল নালায়েক তুচ্ছ বান্দা। আমার ওছিলা সীমাবদ্ধ, আমার যোগ্যতা অপূর্ণ। আমি এ গ্রন্থ রচনায় ঘটনাবলী সঠিকভাবে বর্ণনার চেষ্টা করেছি, সাধ্যানুযায়ী ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু স্বীকার করছি যে, আমি একজন দুর্বল মানুষ। ভুলত্রুটি হয়ে যেতে পারে। ভুলত্রুটি কারো চোখে ধরা পড়লে তিনি যেন আমাকে অবহিত করেন। এজন্যে তিনি আল্লাহর কাছে বিনিময় পাবেন, আমিও তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাদীস এবং অন্যান্য ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আমার যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রন্থটি আমি নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। এরপরও যদি ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। যোগ্যতা অনুযায়ী আমি চেষ্টা করেছি।

আগেও বলেছি, পুনরায় বলছি, এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকাল একটি সজীব বাগানের মতো। সে বাগানে বহু সংখ্যক সুমিষ্ট ফল এবং ছায়াদানকারী গাছ রয়েছে। আমি সে বাগানে ভ্রমণ করেছি এবং যথাসাধ্য ফল চয়ন করার চেষ্টা করেছি। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন আল্লাহর ওলী। তিনি ছিলেন রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ট সাহাবী। তার মুখে সব সময় কোরআনের আয়াত জারি থাকতো। তার অন্তর ছিলো কোরআনের আয়াতের ভান্ডার। তার হাত ছিলো কোরআনের আয়াতের প্রতিনিধি। আমি জনকল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে এ গ্রন্থ রচনা করেছি। আমি এর মাধ্যমে নিজের সংশোধন এবং অন্যের সংশোধন চেয়েছি। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তাঁর তাওফিক কামনা করেই সবকিছু করেছি।

আল্লাহর তাওফিক ও তাঁর সাহায্যে এ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছে। আল্লাহর হামদ, তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল, তাঁর রসূল (স.)-এর প্রতি দরুদ সালাম জানাতে জানাতে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আজ এ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছে। ১৩৯১ হিজরীর ২৮শে শওয়াল, ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর গ্রন্থ রচনা শুরু করেছি। আজ ১৩৯৪ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল, ১৯৭৪ সালের ২ এপ্রিল রাত ৮টা ৪০ মিনিটে গ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা সবই সেই ওয়াহদাহু লা-শরীক আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিবেদিত।

□ □ □

❒ 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' লন্ডন ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কোরআনের ওপর বর্তমান বিশ্বের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৯২ সালের গোড়ার দিকে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু। ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী কতিপয় গবেষক নিয়ে এর কাঠামো গঠিত। 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' এর প্রথম অবদান কোরআনের ওপর একটি পূর্ণাংগ অভিধান রচনা করা। এই বিষয়ের ওপর এটাই ছিলো সম্ভবত প্রথম প্রয়াস। বছর কয়েক আগে গ্রন্থটি লন্ডন থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়, পরে এই বইটি বাংলা ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে। আল-হামদু লিল্লাহ, গ্রন্থটির উভয় ভাষাই দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণে সমাদৃত হয়েছে। কোরআন গবেষনায় একাডেমীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষদের জন্যে কোরআনের একটি সহজ সরল অনুবাদ প্রকাশ করা। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে ইতিমধ্যেই একাডেমী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোরআন গবেষক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ-এর বহুল প্রসংশিত 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' বইটি প্রকাশ করেছে। শতাব্দীর সেরা গ্রন্থ সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা একাডেমীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২২ খন্ডে সমাপ্ত প্রায় ৮ হাজার পৃষ্ঠার এই বিশাল তাফসীরের পূর্ণাংগ প্রকাশনা দু'বছর আগেই সম্পন্ন হয়েছে। তাফসীরের জগতে আরও দুটো গ্রন্থ হচ্ছে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম– শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর 'তাফসীরে ওসমানী' ও বরণীয় মোফাসসের মওলানা আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই-এর 'আসান তাফসীর'। দুনিয়া জোড়া খ্যাতি কুড়ানো এই তাফসীরগুলোর বাংলা অনুবাদের কাজও আল হামদু লিল্লাহ সমাপ্ত হয়েছে। সর্বকালের সর্ব মানুষের প্রসংশিত গ্রন্থ হাফেজ এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর-এর 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' সহ আরও কয়েকটি তাফসীর ও ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

❒ 'ইখওয়ানুল মোসলেমুন'-এর সাবেক মোর্শেদে আ'ম সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী আমাদের কালের একজন শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত ব্যক্তি। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে তার অগনিত সাহিত্য সারা দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। 'শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব' তারই কলম নিসৃত এক বিস্ময়কর জীবনী গ্রন্থ, বিগত দেড় হাজার বছরে দ্বিতীয় খলিফা ফারূকে আযমের জীবন কাহিনী নিয়ে দুনিয়ার এখানে সেখানে শত শত জীবনী গ্রন্থ তৈরী হয়েছে, কিন্তু যে দৃষ্টিতে ওমর তেলমেসানী ফারূকে আযমের জীবন কাহিনীকে অংকিত করেছেন সম্ভবত এর তুলনা এটাই। এ যেন কোনো ব্যক্তিকে সামনে রেখে তারই একটা প্রতিকৃতি অংকন। ওমর তেলমেসানী এই গ্রন্থে এ অসাধ্য কাজটাই সাধন করেছেন। শহীদে মেহেরাবের নামটাও এখানে অপূর্ব মানিয়েছে।

❒ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ ' আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'- এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, 'তাফসীর ফী যিলাযিল কোরআন', 'তাফসীরে ওসমানী' ও 'আসান তাফসীর'-এর অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্পের সম্পাদক। তিনি বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী একজন আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব। 'সেকেন্ড বুক অব ইসলাম' 'বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পচাঁত্তর' সহ ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর তার রচিত পুস্তকের সংখ্যা এখন অসংখ্য। মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'ইসলামিক রিলিফ এজেন্সী' (ইসরা)-এর তিনি লন্ডনের সাবেক ডাইরেক্টর। সম্প্রতি তিনি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে 'রোল অব উইমেন ইন মুসলিম ওয়ার্ল্ড' এ বিষয়ের ওপর ডক্টরেট (পি এইচ ডি) করেছেন। লন্ডন ভিত্তিক মুসলিম লেখক ও সাহিত্যিক সাংবাদিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন ' ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রাইটার্স ফোরাম'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সদস্য। বিশ্বের নারী আন্দোলন সম্পর্কিত তার থিসিসের কিছু কিছু অংশের ওপর ভিত্তি করে তিনি দশটি বইয়ের একটি সুখপাঠ্য সিরিজ লিখতে শুরু করেছেন। 'নষ্ট মেয়ের নষ্টামী', 'দজ্জালের পা', 'বিয়ে নিয়ে ইয়ে', 'তালাকনামা', প্রজন্মের প্রহসন' ও সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী, নামে এর প্রথম ৬টি বই ইতিমধ্যেই বাজারে বেরিয়েছে। বইগুলো সমাজের শিক্ষিত নারীদের মনে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।